শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

প্রথম খণ্ড

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত
সংকীর্তিত

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

SRI SRI BISHUDDHANANDA PARAMAHANSA.
By Akshay Kumar Dutta Gupta

প্রথম সংস্করণ : ১৩৫৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : গুরুপূর্ণিমা,
আষাঢ়, ১৩৫৮

প্রচ্ছদ পটের ছবিটি খ্রীঃ ১৯৩৩-এ
তোলা আলোকচিত্রের প্রতিরূপ

শ্রীশ্রীঅক্ষয় ধর্মমহাসভা পক্ষে
প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ (প্রাঃ) লিমিটেড
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

পরিবেষক
জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৯

মুদ্রাকর
এককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

১ম সংস্করণের

গীতার কল্যাণে "ধর্মক্ষেত্র" বলিতে কুরুক্ষেত্রের নামই সকলের মনে প্রথম উদিত হয়, এবং কোনও কোনও অভিধানেও "ধর্মক্ষেত্র" শব্দের প্রথম অর্থ কুরুক্ষেত্রই দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কুরুক্ষেত্রই একমাত্র ধর্মক্ষেত্র নয়, গীতার প্রথম শ্লোকের বক্তা ধৃতরাষ্ট্রের যুগেও ছিল না। এমনকি জগতের সকল দেশের দিকে তাকাইয়া এ কথা বলিলেও বোধ করি বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না যে, সমগ্র ভারতবর্ষই ঐ আখ্যায় আখ্যাত ও সম্মানিত হইবার যোগ্য। স্মরণাতীত কাল হইতে আর কোন্ দেশ এত ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মশিক্ষক—এত যোগী ঋষি, সন্ন্যাসী, উদাসী যতি তীর্থঙ্কর, এমন কি অংশাবতার, পূর্ণাবতার বলিয়া পূজিত মহামানব-সকল প্রসব করিয়া মানবজাতিকে তাহার শ্রেষ্ঠ কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন? আর কোন্ দেশে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, অরণ্যে, প্রান্তরে, নদীসঙ্গমে, সাগরতীরে ও শৈলশিখরে—এমন কি কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতাসম্পন্ন স্থলমাত্রেই এত তীর্থ, চৈত্য, মঠ, মন্দির, আশ্রম, বিহার ইত্যাদি বিচিত্র প্রকারের ধর্মপ্রতিষ্ঠান-সকল দেখা যায় এবং তথায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরিয়া ধর্মপিপাসু নরনারীগণের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকে? রাজনীতিক্ষেত্রে শত শত বর্ষব্যাপী পরাধীনতা এবং আর্থিক ক্ষেত্রে নিরতিশয় দৈন্য-সত্ত্বেও ভারত-সন্তানকে যে ধর্ম ও তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে অন্য দেশবাসীর নিকট একাল পর্যন্ত নতিস্বীকার করিতে হয় নাই, ইহা কি তাহার মাতৃভূমির একটি গৌরবময় বিশেষত্ব নয়?

এককালে গ্রীসদেশ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে ও নানা চারুকলায় অসামান্য উন্নতি ও সুদূরপ্রসারী যশঃ অর্জন করিয়াছিল। উহার ঐ গৌরব এখন অতীতকালের বস্তু—ইতিহাসের বিষয় মাত্র। রোমের রাজনৈতিক গৌরবও লুপ্ত। মিশর ও আসিরিয়ার গৌরব এককালে অসামান্য হইলেও বর্তমানে কেবল প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আলোচনার বস্তু। কিন্তু ধর্মের ও তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে ভারত এখনও হীনপ্রভ নয়। এখনও সে "সভ্য"-তর জাতি-সকলকে নূতন তত্ত্ব শিখাইতে, নূতন আলোক বিতরণ করিতে পারিতেছে। কেননা ধর্ম সোনারূপার মত লুণ্ঠনযোগ্য সম্পদ্ নয়। উহা কৌপীনধারী সন্তমহাত্মগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত থাকে বলিয়া রাজনৈতিক ও আর্থিক দস্যুগণের লোভ উদ্রেক করে না। অতি প্রাচীনকাল হইতে এ সম্পদের লোভেও বহু বিদেশী মহাপ্রাণ ব্যক্তি এ দেশে আসিয়াছেন, এবং "প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা" স্ব স্ব অধিকার অনুসারে স্বল্প বা অধিকমাত্রায় উহা সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে নিয়া তথায় প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিজের এই অমূল্য সম্পদ্ বিনা শুল্কে বিতরণ করিবার জন্য ভারতও এককালে বহু মনস্বী সন্তানকে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছে, এবং বর্তমানকালে আবার নূতন করিয়া প্রেরণ করিতেছে। কেননা এখনও এদেশে নিত্য নূতন যোগী-ঋষি জীবনব্যাপী সাধনা

দ্বারা এই সম্পদ্ অক্ষুণ্ন রাখিতেছেন ও নিঃস্বার্থ করুণাবশেই উপযুক্ত অধিকারীদিগকে বিতরণ করিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন। এইরূপে ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে, তাহার এই অমূল্য সম্পদের ক্ষয় হইতেছে না।

এই পুস্তকে অতি আধুনিক কালের একজন অতি অসাধারণ মহাপুরুষের পুণ্য লীলা-কথা সুধী ও ধর্মানুরাগী পাঠকবর্গের গোচর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে মহাপুরুষগণের মধ্যে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ঐ রীতি অনুসারে শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ছিলেন একজন যোগী। তিনি নিজে বলিতেন, "যোগী ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানীই বা কে, প্রকৃত ভক্তই বা কে?" অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার যোগীর পক্ষেই সম্ভব, এবং সাক্ষাৎকারই প্রকৃত জ্ঞান; আর জ্ঞেয়ের ধর্মেই জ্ঞান স্বতঃই ভক্তিতে, প্রেমে পরিণত হয়। যেহেতু যোগীর লভ্য উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম ভূমিসকল এই যোগিরাজাধিরাজের আয়ত্ত হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ যোগী নহে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ভক্তও বলা যাইতে পারে। বিশেষত্বের মধ্যে যোগমার্গের কঠোরতা, জ্ঞানমার্গের শুষ্কতা ও ভক্তিমার্গের অশ্রুপাতপ্রবণ বিরহাকুলতা বা বিরহভীতি তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন নিত্য-যুক্ত; তাই তাঁহার জ্ঞানে ও আস্বাদনে মুহূর্তকালের জন্যও বিচ্ছেদ বা বিপ্লব ছিল না। এই মহাপুরুষ দেহের পরিচয়ে বাঙ্গালী হইলেও বাংলাদেশেরও সর্বত্র তাঁহার নাম সুবিদিত নয়। তিনি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হইতে বিরাশি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত শত শত নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছেন এবং ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক, বিচারক, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, উকিল, এটর্নি, ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টার, পুলিস ও ডাকবিভাগের উচ্চ কর্মচারী, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি বহু সুশিক্ষিত ও পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ বাঙালি হইলেও, তাঁহার ওড়িয়া ও পশ্চিমা শিষ্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। তথাপি তিনি নিজের প্রচার ইচ্ছা করিতেন না এবং যে-সকল উপায়ে সাধারণতঃ সাধু-মহাত্মাদিগের প্রচার হয়, তাহাতে সবিশেষ আস্থাসম্পন্ন ছিলেন না বলিয়া এত এত বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিষ্য সত্ত্বেও তাঁহার খ্যাতি তেমন ভাবে সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই। অথচ এইরূপ একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব কেবল তাঁহার কয়েক শত বা কয়েক সহস্র শিষ্যের প্রয়োজনেই হইয়াছিল ইহাও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অন্ততঃ তাঁহার জীবনকথার আলোচনায় সাধারণের প্রয়োজন আছে ও তাহাতে সকলের মহৎ উপকারই হইবার সম্ভাবনা, এইরূপ বিশ্বাস হইতে আমি এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশের জন্য শ্রম ও ব্যয়বাহুল্য স্বীকার করিয়াছি। এই কার্যের জন্য আবশ্যক প্রেরণা নিশ্চয় আমি তাঁহার চরণ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সেইজন্যই বার্ধক্য, উপযুক্ত শক্তির অভাব ও অল্পবিষয়া মতি সত্ত্বেও তদনুসারে কার্য করিতে পশ্চাৎপদ হই নাই।

আমি একরূপ পরিণত বয়সেই এই আদর্শ গুরুর চরণাশ্রয় পাইয়াছিলাম। তাহার পরে তিনি কিঞ্চিন্ন্যূন সাত বৎসর কাল মাত্র স্থূলদেহে ছিলেন। এই অল্পকালমধ্যে আমি তাঁহার লীলার যে অংশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা বিশ্বাসযোগ্য (কেননা আমি স্বভাবতঃ অতি সন্দিগ্ধচিত্ত) গুরুভ্রাতাদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা প্রায় সবই আমার ডায়েরিতে প্রায়শঃ যথাকালেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সেই ডায়েরিই এই পুস্তকসঙ্কলনে আমার প্রধান অবলম্বন। যাঁহার নিকট হইতে যে ঘটনা শুনিয়াছি, এবং পুস্তক রচনাকালে যে মূল হইতে যে বিবরণ ঋণরূপে গ্রহণ করিয়াছি তাহা যথাস্থানে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্বমুখ হইতে প্রাপ্ত বিবরণ ভিন্ন অন্যের কাছে লব্ধ কোনও বিষয়ই আমি নির্বিচারে অর্থাৎ তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্টরূপে নিঃসংশয় না হইয়া গ্রন্থস্থ করি নাই। দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা ধরিয়া বলিতে গেলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য—সর্ববাদিসম্মত এই প্রমাণত্রয় মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ ও আপ্তবাক্যের উপরই নির্ভর করিয়াছি। অনুমানকে এ পুস্তকে প্রায় আমল দেই নাই। আপ্তবাক্যের আপ্ততা সম্বন্ধেও নিজে পরিতুষ্ট না হইয়া তাহা গ্রহণ ও পাঠকবর্গকে পরিবেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

আমি যে যোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের একজন অতি অযোগ্য, এমন কি একেবারে অধমাধম শ্রেণীর শিষ্য, সে বিষয়ে আমার অন্তরূপ ধারণা বিন্দুমাত্রও নাই। তথাপি এই পুস্তকের পরিকল্পনা—প্ল্যান বা স্কীম—অনুসারেই আমার নিজকে পাঠকের সম্মুখে একটু বেশী উপস্থিত রাখিতে হইয়াছে। ইহাতে যদি কুত্রাপি আমার কিছুমাত্র দম্ভ, দর্প বা অভিমান প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠক তাহা আমার লিপিকুশলতার ত্রুটি বলিয়া ধরিয়া লইলেই সমুচিত বিচার করা হইবে। আমার অযোগ্যতাসত্ত্বেও শ্রীশ্রীপরমহংসদেব যে আমার প্রতি এত অপর্যাপ্ত কৃপা ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারই মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে—আমার সৌভাগ্য ব্যতীত অন্য কোনও গুণ প্রমাণিত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার যে-কোন শিষ্য কিছুদিন তাঁহার সংসর্গ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার কৃপা ও স্নেহ যে কিরূপ অসীম ছিল, তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। যখন ঐরূপ অনুভব হইতে কাহারও মনে এমন ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি গুরুর তাদৃশ কৃপা বা স্নেহের একজন যোগ্য পাত্র, তখন তাঁহার সে ভ্রান্তি চূর্ণ হইতে বেশী সময় লাগে নাই—এই কথা অনেকেই অকপটে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন।

পুস্তকের ভাষায় লেখকের মনের ছাপ থাকিতে বাধ্য; আর সাত বৎসর ধরিয়া দিনের পর দিন লিখিত ডায়েরি হইতে যে পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে সে ছাপ আগাগোড়া ঠিক এক রকম হওয়ারও কথা নয়। তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে, সাধারণতঃ শিষ্যের লিখিত গুরুর জীবনীতে পাঠকগণ যেরূপ ভক্তি ও ভাবের প্রাচুর্য আশা করিতে পারেন ইহাতে তাহার অভাবই লক্ষিত

হইবে। কেননা, ভাব ও ভক্তি সম্পদে এ পুস্তকের লেখক নিতান্তই দরিদ্র। অবশ্য "বাজারচলন" ভক্তি ও একটু শস্তা রকমের ভাবোচ্ছ্বাস ইহাতে আমদানি করা খুব দুঃসাধ্য ছিল বলিয়া মনে করি না ; আর 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' এরূপ পাঁতিও পণ্ডিতেরা সর্বদাই দিয়া থাকেন। কিন্তু যে দেবতার চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি, লৌকিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন অতি কঠোর পরীক্ষক,—মেকি ও ভেজাল ছিল তাঁহার কাছে নিতান্তই অচল। সেই অনাবরণজ্ঞান এবং ইদানীং সর্বকঞ্চুকমুক্ত আমার পরম দেবতাকে আমি কোন্ সাহসে কৃত্রিম ভক্তি ও ভাবের উচ্ছ্বাস দিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিব ? আর সুরুচিসম্পন্ন সুপরীক্ষক পাঠকই কি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইবেন ? ঐ এক কারণেই আমি ভাষায় কোনও প্রকার অলঙ্কার সংযোগেরও বিশেষ চেষ্টা করি নাই। সব কথা সরল ও সুস্পষ্টভাবে বলিয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস এরূপ একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন যে, যদি এই পুস্তকে তাঁহাকে কোনও দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও খর্ব দেখায়, তবে বুঝিতে হইবে তজ্জন্য আমার বুদ্ধির জড়তা ও রচনার অকুশলতাই দায়ী। অক্ষম কারুর হস্তে সিংহমূর্তি মেষের মূর্তিতে দাঁড়াইয়া যায়, ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষ।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া শিষ্য ও ভক্তগণ সঙ্গে নানা লীলা করিয়াছেন। তাহার পূর্বে অলৌকিক শক্তিশালী গুরু ও শিক্ষকগণের অধীনে সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনাবস্থায় আরও কত বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা-সকল লাভ করিয়াছিলেন যাহার বিষয় সময় সময় তিনি শিষ্যগণের নিকট বর্ণনা করিতেন। এই সকল বিচিত্র বিষয়ের ও তাঁহার বিচিত্র লীলার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহাও সমগ্রভাবে প্রকাশ করিবার সুবিধা হইল না। আমার বয়সে ও স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় উহা করিতে গেলে সে উদ্যম অর্ধপথেই ছিন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। সেইজন্য পাঠকবর্গকে এতাবন্মাত্রেই সন্তুষ্ট হইতে সবিনয়ে অনুরোধ করি।

এই পুস্তকে আমার অপেক্ষা পরের উক্তি অল্প নহে এবং যাঁহার উক্তি যে স্থানে দেওয়া হইয়াছে তথায় তাঁহার নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই আমার গুরুভ্রাতা। আমি মনে করি শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলাকীর্তনে তাঁহাদের কণ্ঠ সংযুক্ত হওয়ায় ইহার যে বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হইয়াছে, তজ্জন্য দৃশ্যতঃ মূল গায়ক না হইলেও সহৃদয় গুণগ্রাহী শ্রোতৃগণের সাধুবাদ মুখ্যতঃ তাঁহাদেরই প্রাপ্য।

ইতি—

অক্ষয় তৃতীয়া
১০ই বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

১

বিশুদ্ধানন্দ-দেহায় যোগবিজ্ঞানচক্ষুষে।
নমঃ সদ্‌গুরবে সাক্ষাৎ সর্বায়োচ্ছ্রিতশক্তয়ে॥

বিশুদ্ধানন্দ (পরমহংস) যাঁহার দেহের পরিচয়, (অতি সুন্দর দুইটি চক্ষুঃ সত্ত্বেও) যোগ ও বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার প্রকৃত দর্শন-কার্য সম্পাদিত হইত, সুসমৃদ্ধ শক্তিশালী সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ সেই সদ্‌গুরুকে নমস্কার।

তথা চ

বিশুদ্ধ আনন্দ যাঁহার দেহ (স্বভাব), যোগবিজ্ঞান যাঁহার (তৃতীয়) নেত্র, যিনি পূর্ব পূর্ব গুরুগণেরও গুরু, সাক্ষাৎ (শ্রীশ্রী পার্বতীরূপা) সম্যক্ প্রকটিতা স্বকীয়া শক্তির সহিত যুক্তদেহ সেই শিবকে নমস্কার।

২

পিতা ত্বং মাতা ত্বং ত্বমসি পরমো বন্ধুরপি চ
সমানোদর্যস্ত্বং বিপদি শরণং শান্তিসদনং।
গতং মোহস্বপ্নং বিষয়বিষসঞ্চারগহনং
সদা জাগ্রদ্ দৃষ্টে গরহর ন মামন্তরয়সি॥

(হে গুরো) তুমিই পরম পিতা, তুমিই পরম মাতা, তুমিই পরম বন্ধু, তুমিই পরম সহোদর; তুমি বিপদের আশ্রয়, এবং শান্তির নিলয়। বিষয়বিষ (আমার সমস্ত সত্তায়) সঞ্চারিত হওয়ার ফলে আমি যখন সুগভীর মোহনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া থাকি, সর্বদা জাগরূক তুমি, হে গরলহারিন্, তখনও আমাকে তোমার দৃষ্টির অন্তরাল কর না।

৩

যশো বিদ্যা বিত্তং প্রণয়িজনসংসর্গ ইতি চ
ময়া কামং সর্বং স্বকৃতসদৃশং প্রাপ্তমিতি ভোঃ।
কিয়ৎ কর্মাকৃষ্ণং চিতমথ ভবেজ্জন্মসু শতেষ্
প্যাধন্যেন ব্রহ্মন্ যত ইহ ময়া ত্বং গুরুরিতঃ॥

(কর্মের মহিমার কথা তুমি মুখে সর্বদা প্রচার করিলেও আমি এই নিবেদন করিতে চাই) যদি স্বীকারই করা যায় যে, যশ, বিদ্যা, বিত্ত এবং প্রিয়জনসঙ্গ (অল্প বা বিস্তর এজন্মে) যতটুকু পাইয়াছি তাহা স্বকৃত কর্মানুরূপই পাইয়াছি, তবুও জিজ্ঞাসা করি আমার মত একজন অধন্য লোক শত জন্মেও কত শুক্ল কর্মই সঞ্চয় করিয়া থাকিবে যে তাহার ফলে হে ব্রহ্মন্, ইহ জন্মে তোমাকে সে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে?

৪

অহো স্তব্ধঃ পাপী চিরনিরয়ভাগ্ এষ কৃপণঃ
কৃপাং প্রাপ্তো যৎ তৎ কথয়তি তবামেয়করুণাম্।
পরং মে দৌরাত্ম্যাদ্ ন ভবতি যথা সাঽপি বিকলা
তথা যাচে নাথাঽক্ষয়পরিচয়াং ক্ষান্তিমটলাম্॥

অহো মূঢ়, পাতকী, চিরকাল নরকে পড়িয়া থাকিবার যোগ্য এই জঘন্য লোকটি যে তোমার কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে তোমার অপরিমেয় করুণাই প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু, আমার দুরাত্মতা বশতঃ সেই করুণাও যাহাতে বিকল হইয়া না যায়, তজ্জন্য হে নাথ, তোমার অটল, অক্ষয়পরিচয় (অফুরন্ত) ক্ষমা ভিক্ষা করি।

৫

বিপদাং বারণ স্ত্বংহি বিপদাপন্ন ইত্যহম্।
কৃপয়া পরয়া তূর্ণং তারণীয় স্ত্বয়া প্রভো॥

তুমি বিপদ্‌বারণ, আর আমি বিপদাপন্ন। অতএব হে প্রভো! পরম কৃপাপূর্বক আমাকে (ক্লেশ-কর্ম-বিপাকরূপ বিপদ হইতে) উদ্ধার করাই তোমার উচিত।

৬

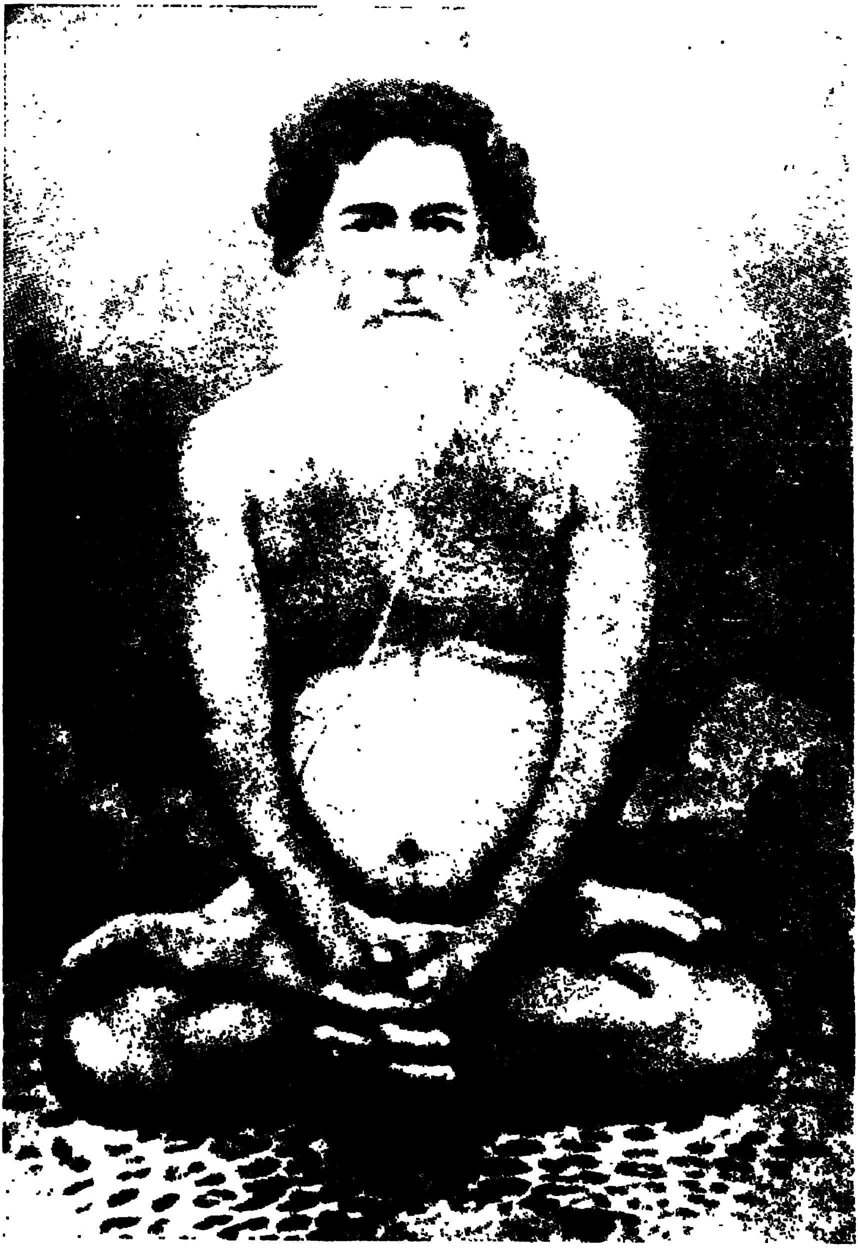
নির্ভরং দেহি মে নাথ সর্বচিন্তাভয়াপহম্।
দেহি ভক্তিং ত্বয্যেকাগ্রাং সদ্‌বৃত্তিমপিচামলাম্॥

হে নাথ, সকল চিন্তা ও ভয় যাহা নাশ করিতে পারে সেইরূপ নির্ভর দেও; তোমার প্রতি একাগ্র ভক্তি ও অমলা সদ্‌বৃত্তিও দেও।

৭

তব কথাসু সুধাসুরসাসু নাঽ
নৃতলবো বিষতিক্তরসো যথা।
নিবিশতে ভ্রমতোঽপি কুরুষ্ব তৎ
সুজনতা পিবতাৎ সুসুখঞ্চ তাঃ॥

সুধাতুল্য সুরস তোমার চরিত-কথায় ভ্রমক্রমেও যাহাতে বিষতিক্ত অসত্যলেশ প্রবেশ না করে তাহাই কর; এবং আশীর্বাদ কর সজ্জনগণ যেন সেই চরিতসুধা পরম তৃপ্তি সহকারে পান করেন।



শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস আনুমানিক ১৯১৮

'ধান ভানিতে শিবের গীত' সাহিত্যে এবং সংলাপে ন্যায্যরূপেই নিন্দিত। আমার রুচি ও আচরণ নিঃসন্দেহ আরও নিন্দনীয়। কেননা আমার যিনি শিব, আমি তাঁহার গীত গাহিতে বসিয়া প্রথমে একরাশি ধান ভানিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার শিব স্নেহ, দয়া ও ক্ষমায় অতুলনীয় ছিলেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে সুধী পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না হইলেই কৃতার্থ হইব।

সে আজ দুই যুগেরও অধিক কাল পূর্বের কথা। বাংলা সন ১৩২৫, (১৯১৮ খ্রীঃ); আমি তখন ঢাকা কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক (লেক্‌চারার)। তৎকাল পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাই নাই। পূজার অবকাশ আসন্ন; এমন সময় গবালিয়র পটারি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার আমার স্বগ্রামবাসী কনিষ্ঠ সহোদর-তুল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত দিনেশচরণ মজুমদার (মিঃ ডি. সি. মজুমদার) বাটী যাওয়ার পথে ঢাকায় আসিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় স্থির হইল পূজার ছুটিতে তাঁহার সঙ্গে গবালিয়ার, আগ্রা প্রভৃতি কয়েকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিতে যাইব। ইহাও স্থির হইল, পথে কাশীতে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দু গোস্বামীর বাসায় দুই-চারিদিন থাকিয়া কাশীও দর্শন করিয়া যাইব; এবং শৈলেন্দু গোস্বামীকে সেই মর্মে পত্র লিখিয়া দেওয়া হইল। পূজার ছুটি আসিল। আমি প্রস্তাব মতই একাকী কলিকাতায় আসিয়া তথায় আমার একটু কাজ সারিয়া দিনেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দিনেশ কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ফ্যাক্টরীর কাজেই কলিকাতায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমি তখন কি করি? তাঁহারই উপদেশে একাই কাশী চলিয়া গেলাম ও অগস্ত্যকুণ্ডায় শৈলেন্দু গোস্বামীর গৃহে অতিথি হইলাম।

শৈলেন্দু গোস্বামী মার্টিন কোম্পানীর একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কাশীতে দ্বারভাঙ্গার মহারাজের বাটীর নিম্নস্থ ঘাট ধ্বসিয়া যাওয়ায় উহার সংস্কারের জন্য মহারাজ বাহাদুর মার্টিন কোম্পানী হইতে একজন সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য চান। তদনুসারে শৈলেন্দু ঐ কর্মের ভার গ্রহণ করিয়া কাশীতে ছিলেন। বহু পূর্বেই ইহার সহিত আমার পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়; খুব কর্মঠ ও বন্ধুপ্রিয় লোক; একদিকে যেমন নানা ইয়ারের দলেও মিশিতেন এবং অদ্বৈত প্রভুর বংশধর হইলেও মাংসাদি কিছুতেই অরুচি ছিল না, মৃগ পক্ষী শিকারেও বিশেষ রুচি ও দক্ষতাই ছিল, অন্যদিকে আবার তেমনই সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, গঙ্গাস্নান, পূজাপাঠ ইত্যাদিও বাদ যাইত না। বস্তুতঃ শৈলেন্দুতে ভোগের মধ্যে বৈরাগ্যের বীজ তখনই অঙ্কুরিত হইতেছিল। ফলে বছর দশেকের মধ্যেই

ভোগী ইঞ্জিনিয়ার শৈলেন্দু গোস্বামী সংসারত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের শ্রীকেশবানন্দ স্বামীর সন্ন্যাসী শিষ্য শিবানন্দে পরিণত হন।

কাশীতে শৈলেন্দু গোস্বামীর বাসায় যে দিন পৌঁছি, তার পর দিন প্রাতঃকালে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনান্তে তাঁহার বসিবার প্রকোষ্ঠে গিয়া দেখি তিনি পূর্ব হইতে অপর একটি ভদ্রলোকের সহিত সোৎসাহে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন। ভদ্রলোকটি শৈলেন্দু হইতে কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক, গৌরবর্ণ, বিড়ালাক্ষ এবং বেশ উদার স্মিত মুখ। তাঁহার পরিধানে মটকার ধুতি ও চাদর এবং গায়ে একটা গেঞ্জি ফ্রক। ইঁহাদের আলোচনার বিষয় ছিল গায়ত্রীর কি-একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। পরিচয়ে জানিলাম ব্যাখ্যাকারী তেওতায়[১] পরলোকগত রাজা শ্যামাশঙ্কর রায়ের পুত্র কুমার বিজয়শঙ্কর রায়। বোধ করি আমার মত অনধিকারীর আকস্মিক প্রবেশেই গায়ত্রীর বৈজ্ঞানিক রহস্য আর অধিক উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিল না; তবে তজ্জন্য যে কেহ খুব দুঃখিত হইলেন এরূপও বোধ হইল না। আমি গঙ্গাস্নানে এবং ৺অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরদর্শনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কুমার বিজয়শঙ্কর স্বাভাবিক সৌজন্যবশতঃ স্বেচ্ছায় আমার গাইড্ (পরিচালক) হইতে স্বীকৃত হইলেন। ভালই হইল। তাঁহার রাণীমাতা কাশীতে বাস করিতেন বলিয়া তিনি বহুবার কাশীতে আসিয়াছেন এবং এখানকার অলিগলি সব চিনেন। আমার সহিত পরিচয়ের কয়েক বৎসর পরে অদৃষ্টচক্রের অতি অবাঞ্ছনীয় বিবর্তনে ইনি একরূপ বাধ্য হইয়াই প্রায় সন্ন্যাসীর ভাবে কাশীতে থাকিয়া সাধন-ভজনে প্রায় লিপ্ত থাকিতেন। আমার সেই সদানন্দ বিজয়দাদা এখন পরলোকে; এখনও কাশীতে গেলে মনে হয়, হয়ত রাস্তার মোড় ফিরিলেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে। সে যাহা হউক, শৈলেন্দু তাঁহাকে দাদা বলিতেন বলিয়া আমিও পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বিজয়দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলাম। রাজপুত্র হইলেও দেখিলাম বিজয়দাদা অতি অমায়িক লোক। অল্পক্ষণেই বুঝিলাম হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তাঁহার উৎসাহের অন্ত নাই। তা'ছাড়া তাঁহার আর একটি দুর্বলতা দেখিলাম কথায় কথায় তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ টানিয়া আনা। বিজয়দাদার গুরুদেবের নাম শুনিলাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। গঙ্গা ও অন্নপূর্ণা-মন্দিরের পথে বিজয়দাদা আমাকে উক্ত স্বামীজী ও তৎকর্তৃক গবেষিত 'সূর্যবিজ্ঞান' সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। এত বড় একজন যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোন কথাই পূর্বে শুনি নাই, এমন কি তাঁহার নামটি পর্যন্ত আমার ও আমার বন্ধুবর্গের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল বলিয়া মনে যুগপৎ বিস্ময় ও অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আমি শৈলেন্দু গোস্বামীকে প্রশ্ন করিলে তিনিও বলিলেন—বিজয়দাদা তাঁহার গুরুর শক্তিসম্বন্ধে যেসকল কথা বলেন তাহার অনেকটাই

১. অবিভক্ত বাংলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রাম।

বুজরুকি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। অবশ্য শৈলেন্দু গোস্বামীও সে পর্যন্ত উক্ত স্বামীজিকে দেখেন নাই। গঙ্গার পথে বিজয়দাদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আমি আমার এককালের ছাত্রস্থানীয়, ক্রমে পরমপ্রীতিভাজন সুহৃৎ, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজের নাম উল্লেখ করায় বিজয়দাদা বলিলেন, "তিনি ত আমার গুরুভাই"। গোপীনাথ কাশীর কুইন্স কলেজ হইতে এম্. এ. পাশ করিয়া এই সময়ে ঐ কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট 'সরস্বতী-ভবন'-নামক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাধ্যক্ষের (লাইব্রেরিয়ানের) পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং ঐ বৃহৎ গ্রন্থাগারের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থরাশির সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন। পরে কালক্রমে তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন।

গোপীনাথকে আমি বাল্যাবধি জানিতাম। জ্ঞানার্জনে চিরদিন অসাধারণ উৎসাহশীল এবং বিজ্ঞ ও সাধুজনের সঙ্গকামী হইলেও গোপীনাথ যে একজন বুজরুককে গুরুপদে বরণ করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমার মনে হয় নাই। তবে এরূপও ভাবিয়াছিলাম, কি জানি ধর্মের রাজ্য মানুষের মনের দুর্বলতার উপরই প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সকল রকম দুর্ঘটনাই সম্ভব।

যতদূর মনে পড়ে ঐ দিনই বা উহার পরদিন কোনও সময়ে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাই যে, সত্যসত্যই তিনি কয়েক মাস পূর্বে বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত স্বামীজি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম তিনি একজন অত্যুন্নত যোগী এবং বাঙালি। সূর্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধেও গোপীনাথ কিছু বলিয়াছিলেন মনে পড়ে। গোপীনাথ ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং কালজ্ঞ ও পাত্রজ্ঞও বটেন। সেইজন্যই বোধ করি তিনি সেদিন স্বীয় গুরুর অসাধারণ যোগৈশ্বর্য সম্বন্ধে আমার কাছে অধিক কিছু ব্যক্ত করেন নাই। বিশেষতঃ ঐ বিষয় জানিবার জন্য আমার আগ্রহও প্রবল ছিল না। তবে আমি স্বামীজিকে একবার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গোপীনাথ বলেন, 'বেশ ত একদিন বিকাল বেলায় ৩টা-৪টার সময় যাওয়া যাবে।' বিজয়দা ও শৈলেন্দু ঐ কথা শুনিয়া উভয়েই বলিলেন তাঁহারাও আমাদের সঙ্গী হইবেন।

স্বামীজিকে দেখিবার জন্য আমার বিশেষ ব্যগ্রতা ছিল না। তৎপূর্বে বিজয়দাদাকে পরিচালক করিয়া প্রতিদিনই নানা দেবমন্দিরাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম; এবং বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজীর সম্বন্ধেও কিছু-না-কিছু অলৌকিক কথা বিজয়দাদার অদম্য উৎসাহে প্রত্যহই আমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

এই স্থানে বোধ করি বলা আবশ্যক যে, বাংলাদেশের বহু 'শিক্ষিত' লোকের মত এই সময়ে আমার মনে যোগবিভূতিসম্বন্ধে একটা উপেক্ষা ও অবিশ্বাসের ভাব

বদ্ধমূল ছিল। আমি স্বভাবতঃ অবিশ্বাসী লোক; তদুপরি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যোগসিদ্ধি যদি সত্য হয়, তবে উহা প্রদর্শন করা সাধুগণের পতনেরই কারণ; আর মিথ্যা হইলে উহা ম্যাজিক বা বুজরুকিমাত্র। অবশ্য এ বিষয়ে আমি কখনই মাথা বিশেষ ঘামাই নাই। ছাত্রাবস্থায় (এম্.এ. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে) বেদান্ত ও সাংখ্যাদর্শন কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়াছিলাম, যোগদর্শনে বিশেষ প্রবেশ ছিল না—অবশ্য সাধারণ ভাবে কিছু কিছু আলোচনা করিতে হইয়াছিল। তারপর বার বৎসর সম্যক্ আলোচনার অভাবে তৎসমুদয়ই তখন বিস্মৃতপ্রায়। বহুদিন পরে কিছু কিছু পড়িয়া এবং শুনিয়া বুঝিয়াছি সাধনাবস্থায়, বিশেষতঃ যোগপথে, সাধকের মধ্যে যেসকল বিভূতি স্বাভাবিক নিয়মেই বিকসিত হয়, তাহাতে পরিতুষ্ট থাকিলে বা আত্ম-প্রচারার্থ বা অন্যবিধ লাভের জন্য তাহার খেলা দেখাইলে সাধক পরমপদের দিকে আর অগ্রসর হইতে পারেন না; এমন কি বিক্ষেপ প্রবল হওয়ার ফলে সে বিভূতিগুলিও প্রায় থাকে না। কিন্তু সাধনের শেষ সীমা হইতেছে ঈশ্বরলাভ—এমন কি তাহা হইতেও পরতর তত্ত্বে স্থিতি। এই পথে যোগী ঈশ্বরের সহিত যতখানি সাযুজ্যলাভ করিবেন, ঐশ্বরিক ধর্ম বা ঐশ্বর্য অর্থাৎ অপ্রতিহত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সেই পরিমাণে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রয়োজনবশতঃ সেই ঐশ্বর্য তিনি যতই প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহার আর পতনের আশঙ্কা থাকিতেই পারে না। এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়ের এক পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে পাঠকবর্গকে সবিনয়ে উপহার দেওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "The idea that Yogins do not or ought not to use such powers, I regard as an ascetic superstition. I believe all Yogins who have these powers do use them whenever they find that they are called on from within to do so. They refrain, if they think their use in a particular case is contrary to the Divine will or see that preventing one evil may be opening the door to a worse, or from any other valid reason, but not from any general prohibitory rule. ......As for those who can live in the true Divine consciousness, certain powers are not powers at all in that sense, not, that is to say, supernatural or abnormal, but rather their normal way of seeing and acting, part of the consciousness; and how can they be forbidden or refuse to act according to their consciousness and its nature?" ইহার মর্ম এইরূপ: যোগীরা এইসকল শক্তি প্রয়োগ করেন না বা তাঁহাদের তাহা করা উচিত নয়—এই যে ধারণা ইহা আমি সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রচলিত একটা

কুসংস্কার বলিয়া মনে করি। আমি বিশ্বাস করি যাঁহাদের এই সকল শক্তি আছে, এরূপ যোগীরা ভিতর হইতে প্রেরণা পাইলেই সেসকল ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা মনে করেন কোনও ক্ষেত্রে এইসকল শক্তির প্রয়োগ ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধ, কিংবা যদি দেখেন একটি অনিষ্ট রোধ করার অর্থ হয়ত তদপেক্ষা গুরুতর অনিষ্টের আপতনের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়ামাত্র, তাহা হইলে কিংবা অন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণে তাঁহারা শক্তিপ্রয়োগে বিরত থাকিতে পারেন। কিন্তু শক্তিপ্রয়োগ করা যাইবে না এরূপ কোনও সাধারণ নিয়ম হইতে তাঁহারা বিরত থাকেন না।...আর যাঁহারা সত্য ঐশ্বরিক চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের পক্ষে কতকগুলি শক্তি সে অর্থে শক্তিই নয় অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু তাঁহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ক্রিয়ার ধারামাত্র—তাঁহাদের চৈতন্যেরই অংশ। তাঁহাদের চৈতন্য বা তৎপ্রকৃতি অনুসারে কাজ করিতে কিরূপে তাঁহাদিগকে নিষেধ করা যাইবে, তাঁহারাই বা কিরূপে তাহা করিতে অস্বীকার করিবেন?

সে যাহা হউক, বিজয়দাদাকে পাণ্ডা করিয়া প্রধান প্রধান দেবস্থানগুলি দেখা হইয়া গেলে মনে হইল, শাস্ত্রে আছে—ভাগবত পুরুষগণই প্রকৃত তীর্থ, তাঁহারাই নিজ নিজ অন্তরস্থ ভগবানের সত্তা দ্বারা তীর্থসমূহকে তীর্থপদবাচ্য করেন। কাজেই কাশীতে আসিয়া কয়েকজন সাধুদর্শন না করিলে কাশীদর্শনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিজয়দাদার এবং গোপীনাথের গুরুদেবকে একদিন দর্শন করিতে হইবে এ সঙ্কল্প পূর্বেই করা হইয়াছিল। তজ্জন্য গোপীনাথের সঙ্গে দিন স্থির করা আবশ্যক ছিল। ভাবিলাম তৎপূর্বে আর কয়েকজন সাধুদর্শন করিয়া লই। আমার অভিপ্রায় বিজয়দাদার কাছে প্রকাশ করামাত্র তিনি স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যসহকারে এ ব্যাপারেও আমার পরিচালক হইতে স্বীকৃত হইলেন। বস্তুতঃ দেখিয়াছিলাম, কাশীতে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই।

বিজয়দাদার সঙ্গে যে কয়জন সাধুদর্শন করিয়াছিলাম তন্মধ্যে তিন জনের কথাই এখন বিশেষভাবে মনে পড়ে।

প্রথম শ্রীচামেলী বাবা—চামেলী পুরী। দেখিলাম বেশ সৌম্য সুন্দর মূর্তি; একটি প্রাচীন নিম্ববৃক্ষের শাখা হইতে দোদুল্যমান এবং মৃত্তিকা হইতে সাড়ে চারি বা পাঁচ ফুট উচ্চ একটি আসনে বসিয়া আছেন। নিকটে আরও কয়েকজন লোক ছিল। এদিকে আমার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের শিক্ষক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পরমভক্ত অধুনা পরলোকগত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. ই.। ইঁহার প্রার্থনায় পুরীবাবা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশও দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তুলাবিদ্যা ও মূলাবিদ্যার কথা ছিল, যাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম সম্ভবতঃ ইনি বৈদান্তিক। কিন্তু সেদিন তিনি প্রধান ভাবে শ্রবণ-মননাদি বা নেতি নেতি বিচারের কথা না বলিয়া সর্বদা ভগবানের নাম করার উপদেশই দিয়াছিলেন এবং ঐ পথে অবশ্যই ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যাইবে বলিয়া

আমাদিগকে আশ্বাসও দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত প্রফুল্লবাবু জানিতেন না এবং আমিও একথা বহুকাল পরে শুনিয়াছি—শ্রীচামেলী পুরী রামকৃষ্ণদেবের বেদান্তোপদেষ্টা শ্রীতোতা পুরীর গুরুভাই ছিলেন। সে যাহা হউক তাঁহার মূর্তি ও সদানন্দ ভাব আমার মনে অনন্যভূতপূর্ব একটা শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল।

আমাদের দৃষ্ট দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সাধুর নাম শ্রীমগনীরাম। ইনিও একজন বিশিষ্ট বৈদান্তিক ছিলেন। মগনীরাম ব্রহ্মচারী ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম। পরে বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও ইনি নামান্তর দ্বারা পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন নাই। ইঁহাকে দেখিতে কৃশ এবং একটু কাঠখোট্টা ধরনের লোক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইনি কয়েক মিনিটের জন্য আমাদিগকে দর্শন দিয়াই কার্যান্তরে স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে চলিয়া যান। ধর্মপ্রাণ প্রফুল্লবাবু কিছু উপদেশ না পাইয়া যেন একটু আশাহত হইয়াছিলেন। আমার মনে হইয়াছিল হয়ত আমাদিগকে তামাসাগীর মনে করিয়া তিনি অধিক অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হন নাই। পরে শুনিয়াছি ইনি শাস্ত্রোপদেশ দিতে সর্বদাই অধিকার বিচারাদি করিতেন।

তৃতীয় সাধু ইদানীং সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিহর বাবা। ইনি গঙ্গাতটে একটি প্রস্তরের উপরে অতি স্থিরভাবে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা পার্শ্বদেশ হইতে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে তিনি গঙ্গা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মুহূর্তের জন্য আমাদের দিকে তাকাইয়াছিলেন। ইঁহার দেহে, এমন কি কটিতেও কোনও বস্ত্রখণ্ড ছিল না। চামেলীবাবার গায়ে একটি অঙ্গরক্ষা দেখিয়াছিলাম; মগনীবাবা কৌপীনমাত্র পরিহিত ছিলেন; আর ইনি সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলেন। ইঁহার বিষয়ে পরে আরও কিছু উল্লিখিত হইবে। ইনি তখন কাণা ছিলেন, পরে সম্পূর্ণ অন্ধ হন। তখন মৌনী ছিলেন বলিয়া ইঁহার সহিত কোনও আলাপ বা ইঁহা হইতে কোনও উপদেশলাভ হয় নাই। ইদানীং ইনি কথা বলেন এবং সকলকে সর্বদা রাম-নাম করিতে উপদেশ দেন। বর্তমানে বোধ করি ইনিই কাশীর শ্রেষ্ঠ সাধু।

অবশেষে একদিন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ, বিজয়দাদা ও শৈলেন্দু গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজীকে দর্শন করিতে গেলাম। কৌতূহলমাত্র ভিন্ন কোনও প্রেরণা আমার মনের মধ্যে ছিল না, অন্ততঃ অনুভবযোগ্য ভাবে ছিল না। তবে সর্বনিয়ন্তার হাত যে অপরোক্ষভাবে ক্রিয়া করিতেছিল তাহা অবশ্যই মনে করিতে হইবে। গুরুর সঙ্গে যোগ কি বাহ্য দীক্ষা হইতেই আরম্ভ হয়? শুনিয়াছি প্রকৃত দীক্ষা হয় মাতৃগর্ভে প্রবেশের সময়, এবং গুরুশক্তি তখন হইতেই শিষ্যকে পরিচালিত করেন ও শেষে সময় হইলে সমুচিত দেহাবলম্বনে স্থূলভাবে কৃপা করেন। আবার জগতে তত্ত্ব যখন একই, তখন গুরুও তো দ্বিতীয় কেহ নন, নিজেরই শুদ্ধতম সত্তা। আত্মসত্তা হইতে কে কখন্ বিযুক্ত থাকে? গুরুবিগ্রহ

লীলাবিগ্রহ-মাত্র। তবে শাস্ত্র সর্বদাই সাধককে সতর্ক করেন, এমন কি অদ্বৈতবাদি-কুলশিরোমণি স্বয়ং শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বলিয়াছিলেন—'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।' তিন লোকে অদ্বৈতবুদ্ধি করিবে; কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈতবু‘দ্ধি করিবে না।

সে যাহা হউক, এখন মনে করি গুরুশক্তিই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে কাশীতে টানিয়া নিয়া বিজয়দাদার সঙ্গে তেমন সৌহৃদ্যপূর্ণ পরিচয় ঘটাইয়াছিলেন এবং সেদিন আমাকে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের সঙ্গ ধরাইয়া শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী-দর্শনে লইয়া গিয়াছিলেন। তৎপূর্বে যে কয়েকটি অবান্তর সাধুদর্শন ঘটিয়াছিল, তাহাও বোধ করি সেই শক্তিরই কার্য; উহা মূল দেবতার পূজার পূর্বে দ্বারদেবতা বা আবরণদেবতাদিগের পূজার মত অথবা শুদ্ধিক্রিয়া-বিশেষ। একথা বলা আবশ্যক যে, ইহার পূর্বে আমি কখনও কোনও সাধু-মহাজনের সংস্পর্শে আসি নাই।

বিকাল বেলা। হনুমান ঘাটের নিকটে একটি ছোট বাড়ী। উপরে দ্বিতলে একটি লম্বা রকমের প্রকোষ্ঠ। উহার এক সীমায় অনুচ্চ একটি তক্তপোষের উপর যোগিয়া রঙের ক্ষৌম-বস্ত্র পরিহিত একটি মহাপুরুষ বসিয়াছিলেন। তাঁহার গায়েও একটি ঐ কাপড়ের জামা। বর্ণ ফরসা নয়, সুকৃষ্ণও নয়; কিন্তু বেশ শান্ত প্রসন্ন ছবি। আয়ত উজ্জ্বল চক্ষুঃ; প্রতিভামণ্ডিত মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি ও গোঁফ। বয়স হিসাব মত এই সময়ে ৬২-৬৩ হওয়া উচিত, কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল ৫২-৫৩ হইবে। তাঁহার ঠিক এই সময়কার কোনও ফটো আমি পাই নাই, পাইলে এই পুস্তকে ছাপাইয়া দিতাম। উহার পূর্বের ও পরের নানা ছবিই দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য ইনিই স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। স্বামীজির সম্মুখে তক্তপোষের নীচে কম্বল বা সতরঞ্চিতে দশ-বারটি লোক মধ্যস্থানে একটি সরু পথ রাখিয়া দুইভাগে বসিয়া নানা কথা বলিতেছিলেন বা শুনিতেছিলেন। একজনের হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা, সুপরিষ্কৃত বেশ এবং সকল আলাপে অগ্রবর্তিতা বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম ইহার নাম মিষ্টার এ. কে. রায়; ইনি একজন ষ্ট্যাটিউটারী সিভিলিয়ান ছিলেন, তখন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কি করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। সে যাহা হউক, গোপীনাথ ও আমি পূর্বোক্ত সরু পথ ধরিয়া স্বামীজীর খুব কাছে গিয়া প্রণাম করিলাম এবং তক্তপোষ ঘেঁষিয়াই বসিলাম; শৈলেন্দু ও বিজয়দাদা প্রকোষ্ঠের অপর সীমায় বসিলেন। গোপীনাথ গুরুর নিকট আমার পরিচয় দিলেন। স্বামীজি, আমি কবে কাশী আসিয়াছি, কতদিন থাকিব ইত্যাদি-রূপ দুই একটি-প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐরূপ প্রথম সম্ভাষণের অন্তে আমি যুক্তকরে সাহসপূর্বক বলিলাম, "গোপীনাথের

মুখে সূর্যবিজ্ঞানের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছি; যদি দয়া করিয়া একটু দেখান তবে কৃতার্থ হই।" স্বামীজি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কি হবে ওসব দেখে?"

আমি। তা'ত জানি না তবে দেখিতে খুব কৌতূহল হইয়াছে। তাই যদি দয়া করিয়া দেখাইতেন।

স্বামীজি তখন আর কিছু বলিলেন না। আমিও প্রায় নিরাশভাবে বসিয়া রহিলাম। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যে এবং কখনও কখনও স্বামীজির সহিত আলাপ চলিল। আলাপে পূর্বোক্ত দণ্ডানাধারী এবং অন্যান্য বিষয়েও কিঞ্চিৎ অসাধারণ ভদ্রলোকটিই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজির মুখে পূর্বশ্রুত কথা বা স্বামীজি-কর্তৃক পূর্বে প্রদর্শিত বিভূতি ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া আসরটি বেশ জমাইয়া তুলিতেছিলেন। স্বামীজি কথা অল্পই বলিতেছিলেন, কিন্তু সুস্মিত মুখে সবই শুনিতেছিলেন। আমার মনে হইয়াছিল দণ্ডানাধারী স্বামীজির একজন শিষ্যই হইবেন। পরে শুনিয়াছিলাম তিনি শিষ্য নন, কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ খুব যাতায়াত করিতেছেন।

হঠাৎ স্বামীজি উঠিয়া পার্শ্বের প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া কোথাও গেলেন এবং ফিরিবার সময় কিঞ্চিৎ তূলা হাতে করিয়া আসিলেন। তিনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া সূর্যবিজ্ঞানের খেলা দেখাইতে যাইতেছেন, ইহা প্রথমে আমি বুঝি নাই। তিনি তূলাটুকু আমাকে দেখাইয়া বাম হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে তাহা টিপিয়া ধরিলেন, এবং ঘরে আলোকের অল্পতা লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের একটি জানালা খুলিয়া দিয়া জানালা ও বাম হস্তের অন্তরালে একখানি ছোট লেন্‌স্ (lens) দক্ষিণ হস্তে এরূপভাবে ধরিলেন যেন জানালা দিয়া আলোক আসিয়া লেন্সের মধ্য দিয়া বামহস্তে ধৃত তূলার উপর পড়িতে পারে। মিনিটখানেক বা অর্ধ মিনিট পরে তূলাটুকু যেভাবে ধরা ছিল ঠিক সেই ভাবেই আমার নাকের অতি নিকটে আনিয়া বলিলেন, "কোনও গন্ধ পাচ্ছ?" আমি 'না' বলিলাম। তিনি গোপীনাথ ও সমীপস্থ আরও দুই এক ব্যক্তির নাকের কাছে উহা ধরিলে তাঁহারাও বলিলেন, "কই, কোনও গন্ধ ত পাচ্ছি না।"

স্বামীজি হাসিলেন। আবার মিনিটখানেক বা অর্ধ মিনিট ধরিয়া পূর্বোক্তরূপে লেন্স দ্বারা তূলার উপর আলো ফেলিলেন, এবং আবার তাহা আমার এবং গোপীনাথ ইত্যাদির নাকের কাছে ধরিলেন। আমি এবারেও কোন গন্ধ পাই নাই। গোপীনাথ বলিলেন, "একটু মৃদু গন্ধ যেন পাচ্ছি, কিন্তু কিসের গন্ধ তা বুঝা যাচ্ছে না।" এবারও স্বামীজি হাসিলেন এবং তৃতীয়বার লেন্সের পূর্বোক্তরূপে ক্রিয়া করিলেন, এবং আমার নাকের কাছে ধরিলেন। আমার নাক বোধ করি সর্দিতে বন্ধ ছিল, তৃতীয়বারেও আমি গন্ধ পাই নাই। স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, "এখনও গন্ধ পাচ্ছ না!" গোপীনাথ শুঁকিয়া বলিলেন, "কর্পূরের

ত গন্ধ একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে।' অন্যেরাও কেহ 'হাঁ', কেহ 'না' বলিলেন। তুর্থবার লেন্সের ক্রিয়ার পর শুধু কর্পূরের গন্ধই প্রবল হইল না, স্বামীজি তুলার ভিতর হইতে ভাঙিয়া ভাঙিয়া সকলের হাতে কর্পূর দিলেন;—অতি শুভ্র ও অতি অভূতপূর্ব গন্ধযুক্ত কর্পূর। স্বামীজি বলিলেন, 'খাও'; আমি খাইলাম এবং অপর সকলেও খাইলেন। মনে হইল কর্পূরের গন্ধের সঙ্গে অন্য কোনও অপূর্ব গন্ধদ্রব্যের গন্ধ মিশ্রিত আছে।

তখন বেলা অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। স্বামীজি ঘড়ি দেখিয়া প্রাত্যহিক নিয়মমত নৌকাযোগে গঙ্গায় বেড়াইতে যাইবার জন্য উঠিলেন। ভাবিলাম াধুরাও ঘড়ি দেখেন! পরক্ষণেই মনে হইল, ইনি তো কৌপীনধারী সাধু নন, ুবেশ বিজ্ঞানবিৎ সাধু! পরে দেখিয়াছি তাঁহার আহার, বিশ্রাম, আহ্নিক ক্রিয়া, ভ্রমণ—সবই ঘড়ি দেখিয়া যথানির্দিষ্ট সময়েই সম্পাদিত হয়, তাহাতে সময়ের একচুল ব্যতিক্রম হওয়ার জো নাই। এমন কি ঘড়িটিরও সময় যতদূর ম্ভব ঠিক রাখা হয়। সে যাহা হউক, স্বামীজির সঙ্গে আমরাও উঠিলাম। কহ কেহ চলিয়া গেলেন; গোপীনাথের সঙ্গে আমিও নৌকাভ্রমণে স্বামীজির নুবর্তী হইলাম। দস্তানাধারী এবং আর কয়েকটি লোকও সঙ্গে গেলেন। নৌকা ওপার দিয়া রামনগরের দিকে চলিল। কথাপ্রসঙ্গে দস্তানাধারী র্যবিজ্ঞানের দ্বারা হীরকনির্মাণের কথা তুলিলেন এবং মনে হয় তিনিই, বা হইতে ারে অপর কেহ, বলিলেন, "বাবা ত বিজ্ঞান দ্বারা একটি বেশ বড় আকারের ীরক তৈরী করিয়া শেষে তাহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" স্বামীজি লিলেন, "হীরক তোমাদের কাছে বহুমূল্য হইলেও সাধুর কাছে তাহার মূল্য কি?" এক্ষেত্রে অবশ্য ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যিনি ইচ্ছামত যখন-তখন ীরক প্রস্তুত করিতে পারেন, তাঁহার তাহা গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে মমতার কারণ াই। আর স্বামীজির কথাও ঠিক। আমার মনে পড়িল পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, নাতন গোস্বামীও পরের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া একটি স্পর্শমণি াইয়া সেটি যমুনাতীরে বালিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে মাধুকরী রিয়া খাইতেন, এবং অতি দীনভাবেই গাছের নীচে দিবারাত্রি যাপন করিতেন। স্তুর মর্যাদা অনেকটা প্রয়োজনের ও দৃষ্টিভঙ্গীরও অধীন।

রামনগরের দিক হইতে ফিরিবার সময় গঙ্গার যে কূলে কাশী সেই কূলের নিকট ়িয়া অনুকূল স্রোতে নৌকা চলিতে লাগিল! কতকদূর আসিবার পর তীরে পবিষ্ট শ্রীহরিহর বাবাকে দেখাইয়া স্বামীজি বলিলেন, 'ইনি সমস্ত দিন এই ভাবেই ঙ্গার দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন। কেহ কিছু দিলে খান, নচেৎ খান না। নে একবার গঙ্গা সাঁতরাইয়া ওপারে গিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসেন।" কজন বলিলেন, "এখন না হয় গঙ্গায় স্রোত নাই, নদীরও বিস্তার বেশি নয়। াকালে কি করেন?" স্বামীজি বলিলেন, "বর্ষায়ও তাহাই করেন। ইনি কাশীর

মাটীতে মলমূত্র ত্যাগ করেন না।" হরিহর বাবাকে খুব কাছে দাঁড়াইয়াই পূর্বদি আমি দেখিয়াছিলাম। সেই কৃশ শরীরে এত শক্তি ও সাহস যে, বর্ষার প্রব স্রোতেও দৈনিক দুইবার গঙ্গা সাঁতরাইয়া পার হন, ইহা ভাবিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এ বল কি দেহের না তাহার অন্তরালস্থ আর কিছুর?

শ্রীযুক্ত গোপীনাথের মুখে পরে শুনিয়াছি, এই সময়ে স্বামীজি হরিহর বা সম্বন্ধে বলিতেন, ইহার সত্ত্ব খুব শুদ্ধ হইয়া আসিতেছে—দেহের উজ্জ্বলতা ক্র বাড়িতেছে। কয়েক বৎসর পরে না কি বলিয়াছিলেন, শরীর খুব উজ্জ্বল হই উঠিয়াছে। অবশ্য এই ঔজ্জ্বল্য সাধারণের দৃষ্টিগোচর ছিল না। সাধুর মহি সাধুরাই বোঝেন। আমরা শুনি এবং রুচি বা সংস্কার অনুসারে বিশ্বাস করি ব করি না।

নৌকা ঘাটে ফিরিল। সন্ধ্যা হইতে অল্প বাকী। স্বামীজি অবতরণ করি আশ্রমের দিকে চলিলেন। তাঁহার ঠিক পশ্চাতেই গোপীনাথ, তার পশ্চাতে আমি গোপীনাথ আমার কাণে কাণে বলিলেন, কেমন সুন্দর পদ্মগন্ধ পাওয়া যাইতেছে আমি পাই নাই—গোপীনাথের কথার মর্মও বুঝি নাই। পরে গোপীনাথসহ বাস ফিরিবার পথে তিনি বলিলেন, বাবাজীর শরীর সর্বদাই পদ্মগন্ধে সুরভিত; কা বসিলে সময় সময় বেশ তীব্র অথচ মনোরম গন্ধ পাওয়া যায়, সেইজন্য এখা ইহাকে সকলে 'গন্ধবাবা' বলে। বিজয়দাদা একথাও আমাকে পূর্বে বলি থাকিবেন, কিন্তু তখন তাহা আমার মনে দাগ ফেলে নাই। সেদিন বোধ কা আমার নাক বন্ধ ছিল বলিয়া কাছে বসিয়া ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াও কোন গ পাই নাই।

বাসায় ফিরিয়া আসিলে শৈলেন্দু গোঁসাই বলিলেন, (অবশ্য বিজয়দাদা তং উপস্থিত ছিলেন না) "বুজরুক, বুজরুক! কর্পূর তৈরী করলেন না হাতী! আঙ্গুলে ফাঁকে তুলার মধ্যে কর্পূর লুকান ছিল; আমি দেখেছি।" পরদিন প্রাতে শৈলে কতকটুকু তুলার মধ্যে কর্পূর লুকাইয়া বলিলেন "এস এস আমি সূর্যবিজ্ঞান দি কর্পূর তৈরী করিতেছি।" বলা বাহুল্য, শৈলেন্দু এসব পরিহাসের ভাবে বলিয়াছিলেন। তিনি ঠিক কি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না। আমি স্বভাবত অবিশ্বাসী হইলেও ঐ ব্যাপারে কোনও হাতের কৌশল ছিল এরূপ মনে করি নাই পূর্ব হইতে হাতে কর্পূর থাকিলে পূর্ব হইতে হাতে গন্ধও অবশ্য থাকিত। আ কর্পূর তৈরী করিবার সময় সন্দেহজনকভাবে বাবাজীকে হস্ত সঞ্চালন করিতে দেখি নাই।

আরও একটা কথা। স্বামীজি নৌকাভ্রমণের জন্য বাহির হইবার পূর্বে বসিবা ঘর হইতে উঠিয়া একবার ভিতরে গিয়াছিলেন; ঐ সময়ে বিজয়দাদা আমাকে স নিয়া অপর এক প্রকোষ্ঠে সুরূপ, গৌরবর্ণ, গেরুয়া রঙের বস্ত্রধারী এক বৃদ্ধ

দেখাইয়া বলেন, "এঁর চোখের দিকে তাকান ত!" তিনি অপরিচিত ব্যক্তির কাছে উহা একটা অনুচিত রসিকতা মনে করিয়া যেন একটু বিরক্তই হইলেন। বিজয়দাদা পরে বলেন, ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজ; নাম হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ইনি গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমে বাস করেন। ছেলেরা বাড়ীতে আছে। দেশে জমিদারী আছে।

আমি। চোখের কথা কি বলিতেছিলেন?

বিজয়দাদা। ওঁর চক্ষু দুইটি অসাধারণ রকম উজ্জ্বল। 'ক্রিয়া' হইতে ইহা হয়

সে যাহা হউক, যিনি ধর্মাধিকরণে বসিয়া অশেষপ্রকারে সাজান গোছান অসত্য হইতে সত্যকে পৃথক্ করিতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ যাপন করিয়াছেন, এরূপ একজন বিশিষ্ট এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি যে বুজরুকিতে বা ম্যাজিকে মুগ্ধ হইয়া পরিণত বয়সে (নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধা স্বীকার করিয়া) আশ্রমে পড়িয়া আছেন ইহাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই।

তাই বলিয়া স্বামীজির ঐ বিভূতি দেখিয়া আমি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়াছিলাম বা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিব এইরূপ ইচ্ছার লেশও আমার মনে উদিত হইয়াছিল, একথা বলিলে ঘোরতর মিথ্যা কথা বলা হইবে। অবশ্য অবচেতন মনের ক্রিয়াসম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। সেথায় কি হইতেছিল তাহা জগদ্‌গুরু জানেন।

স্বামীজিকে দর্শন করার দুই চারি দিন পরেই আমি কাশী হইতে চলিয়া আসি। দুই বৎসর পরে (এই সময়ে আমি ঢাকা কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতায় বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম) খ্রী. ১৯২০ সনের পূজার ছুটীতে দ্বিতীয়বার কয়েক দিনের জন্য কাশী যাই। এই সময়ে বন্ধুবর শৈলেন্দু গোস্বামী কাশীতে ছিলেন না, কলিকাতায় মার্টিন কোম্পানীর কাজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আমি শ্রীযুক্ত গোপীনাথের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবার তাঁহার গুরুদেবকে কাশীতে দর্শন করার সৌভাগ্য হয় নাই—তিনি ঐ সময়ে বিন্ধ্যাচলে ছিলেন। গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহার প্রসঙ্গ অবশ্যই বহুবার হইয়াছিল—তন্মধ্যে সূর্যবিজ্ঞানের কথাই বেশী ছিল। গোপীনাথ বলিয়াছিলেন, "সূর্যের সাতটা রশ্মির কথাই সকলে জানে। কিন্তু সূর্যবিজ্ঞান মতে সূর্যালোক ভাগ করিয়া তিনশত ষাটটি রশ্মি পাওয়া যায়; তাহাতে জগতের সকল বস্তুর উপাদানই আছে। উহা বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক ঠিক রশ্মিগুলি বাছিয়া যেমন যেমন দরকার সেইভাবে সেগুলিকে মিশাইতে পারিলে যে-কোনও দ্রব্যই প্রস্তুত করা যায়। গুরুদেব তাহাই করেন। এটা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি, ইহাতে অলৌকিক কিছু নাই। একটি স্থূল উপাদানের সহিত আর একটি দুইটি বা দশটি স্থূল উপাদান মিশাইয়া, লোকে যেমন নানা দ্রব্য উৎপাদন করে, উহাও ঠিক সেইরূপ, কেবল এই ক্ষেত্রে উপাদানগুলি সর্বসাধারণের

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা স্বেচ্ছামত ব্যবহারযোগ্য নয়। যাহাকে যোগবিভূতি বলে তাহা স্বতন্ত্র ব্যাপার। সেটা যোগীর ইচ্ছাশক্তির খেলা। ইচ্ছাশক্তিতে কোনও উপাদানসংগ্রহের প্রয়োজন নাই—যোগীর ইচ্ছাতেই সব হয়। যোগ আর বিজ্ঞান এক নয়; যদিও গুরুদেব বলেন, যোগ ছাড়া বিজ্ঞান নাই, বিজ্ঞান ছাড়াও যোগ নাই।"

গোপীনাথের কথাগুলি নূতন হইলেও শুনিতে ভাল লাগিল। তাহাতে অপ্রত্যয়ের কিছু ছিল না। সূর্য হইতেই এ জগতের (সৌর জগতের) উৎপত্তি; সূর্য এখনও ইহার শ্রেষ্ঠ শক্তি-(energy) দাতা একথা সকলেই জানেন। সূর্যের সাতটি রশ্মির উপরে আর দুইটি রশ্মি—ultra violet এবং infra red—আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান মানুষের নানা রোগের প্রতিকারে প্রয়োগ করিতেছে, ইহা তখনই জানা ছিল। তারপর গত বিশ্বযুদ্ধ হইতে মারণ যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা-প্রসঙ্গে সূর্যরশ্মির শক্তি সম্বন্ধে আরও কত কথা শুনা যাইতেছে। এই বিষয়ে ব্রিটেন, আমেরিকা ও রুশিয়ায়—বিশেষতঃ রুশিয়ায় যেসকল গোপনীয় পরীক্ষা হইতেছে তৎসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"the basis of the experiments is the use of cosmic ray particles which emanate from the sun and have energy millions of times greater than any power that can be produced in a laboratory." ভারতের সর্বজ্ঞ যোগিগণ এই শক্তি সুকৌশলে আয়ত্ত করিয়া নানাবিধ বস্তুর সৃষ্টিকার্যে নিয়োগ করিবেন ইহাতে অবিশ্বাস্য কি আছে? যে সময়ের কথা হইতেছিল তখন অবশ্য উক্ত cosmic ray particles-এর কথা শুনি নাই। তথাপি সূর্য ও পৃথিবীর পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা জানা ছিল, তাহা হইতেই সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা অনেক কিছু করা সম্ভব, ইহা বিশ্বাস করিতে বিশেষ অপ্রবৃত্তি হয় নাই।

আরও দুই তিন বৎসর পরে হঠাৎ 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার একটি সংখ্যা একদিন আমার হাতে পড়ে। আমি ঐ পত্রিকার গ্রাহক বা নিয়মিত পাঠক ছিলাম না। সেদিনের ঐ পত্রিকাখানি আমার হাতে পড়া বাহিরের দৃষ্টিতে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিক জগতে কি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া কিছু আছে? সব কার্যই একটা সুনিয়ত ক্রমে হইতেছে না কি? সে যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম—ঐ পত্রিকায় এইরূপ একটি সংবাদ ছিল যে, বারাণসীর একজন বাঙ্গালী সাধু (নাম ছিল না) কতিপয় দিন পূর্বে একজন মার্কিনদেশীয় ভ্রমণকারীর (tourist) অনুরোধে তাহারই সমক্ষে কয়েক মিনিটের মধ্যে একখানি লেন্স (lens) সাহায্যে একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের কিয়দংশ প্রস্তরে পরিণত করেন। এই উপলক্ষে ইহাও প্রকাশ পায় যে, উহা যে বিজ্ঞানের কার্য; তদ্দ্বারা অতি দুরারোগ্য ব্যাধি সকলও অত্যল্পকাল মধ্যে আরোগ্য করা সম্ভব। সাধুর

শক্তিতে বিস্মিত হইয়া মার্কিনদেশীয় উক্ত ভদ্রলোকটি বলেন, সাধু যদি তাঁহার ঐ অলৌকিক শক্তি জগতের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহাতে যত অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা আমেরিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তদুত্তরে সাধু বলেন, শিষ্য ভিন্ন কাহারও নিকট এক কপর্দক গ্রহণ করিবারও তাঁহার গুরুর অনুমতি নাই। তবে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা তাঁহার আছে এবং তজ্জন্য চেষ্টাও হইতেছে।

এই সংবাদটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল সাধুটি বোধ করি শ্রীযুক্ত গোপীনাথের গুরুদেবই হইবেন। ইতঃপূর্বেই আমার কর্ণরোগের সূচনা হইয়াছিল এবং সাধারণ চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছিল না। আমি গোপীনাথকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিলাম, বসুমতীতে উল্লিখিত সাধু পুরুষটি তাঁহার গুরুদেব নহেন কি? হইলে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা হইতেছে কি? গোপীনাথ উত্তর দিলেন, সাধু তাঁহার গুরুই বটেন। সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা রোগের উপশম তো তুচ্ছ কথা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় পর্যন্ত মানুষের আয়ত্ত হয়। আপাততঃ কাশীতে একটি বাগান-বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহাতে গুরুদেবের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মিত হইতেছে; ইহার পর চিকিৎসালয়াদি সবই হইবে।

পূর্বে কথাবার্তায় গোপীনাথ গুরুসম্বন্ধে এরূপ উৎসাহ ও দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ উক্তি অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিবার যোগ্যতার উল্লেখ আমার নিকট কখনও করেন নাই। তাঁহার পত্র পড়িয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, বিজয়দাদার ব্যাধি গোপীনাথেও কতকটা সংক্রমিত হইল কি?

দুই

অধ্যয়ন সমাপন করিয়া আমার চাকরিতে প্রবেশের অল্পদিন পরেই আমার পিতার কুলগুরুপুত্র মিতরায়[১] অর্ধকালী-বংশীয় সারদাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় কয়েকবার আমাকে দীক্ষাগ্রহণ জন্য উপদেশ দেন। আমরা দরিদ্র হইলেও অনতি-দূরবর্তী এক গ্রামের কোনও সম্পন্ন শিষ্যের আলয়ে গতায়াতের পথে তিনি প্রতি-বৎসর একাধিকবার আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিতেন, এবং আমার বাল্যাবধি আমাকে খুব স্নেহ ও সর্বান্তঃকরণে আমার উন্নতিকামনা করিতেন। খ্রীঃ ১৯১২ সনে শেষবার ঢাকায় তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয়; তখন তিনি আমাকে বলেন, "বাবাজী, দীক্ষা নিতে আর দেরী ক'রো না। আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। আমার অভাবে কুলগুরু পাইবে না। আমার ভাই গোপালচন্দ্র সাহেব লোক;

১. মাণিকগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রাম।

সে যে কাহাকেও দীক্ষ-টীক্ষা দিবে এ সম্ভাবনা দেখি না।" ৺সারদা ভট্টাচার্য নিঃসন্তান ও বিপত্নীক ছিলেন ; ভ্রাতা গোপালচন্দ্র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমার অদৃষ্টক্রমে সারদা ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা সত্য হইতে চলিল ; অল্প দিন পরেই তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইলেন ; এবং তাঁহাদেরই এক শিষ্যের মুখে শুনিলাম, গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় পূর্বে সাহেবিয়ানাই করিতেন ; ভ্রাতার মৃত্যুর পরে চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ধর্মে মন দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কোনও কৌলিক শিষ্য-সন্তান দীক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন, "আমাকে কে উদ্ধার করে তারই ঠিকানা নাই, আমি আবার কার উদ্ধারের ভার নিব ?"

সে যাহা হউক, সারদা ভট্টাচার্য মহাশয়ের তিরোভাবের পরও বহুদিন পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণের জন্ম আমার মনে কোনও আকাঙ্ক্ষা—অন্ততঃ তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই। দীক্ষা নিতে হইলে অবশ্য কুলগুরু হইতেই নিতে হইবে এইরূপ আমার সংস্কার ছিল, এবং সারদা ভট্টাচার্য মহাশয় জীবিত থাকিলে হয়ত তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতের অল্প পরেই তাঁহারই কৃপায় বা গরজে আমার দীক্ষা হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা তো ভাবা ছিল না। পরে যাহা হইয়াছে তাহার আলোকে ইহার কারণ বুঝা কঠিন নয়। আমি যে অজগুরুর—সদ্‌গুরুর—মার্কা-মারা ছিলাম।

খ্রীঃ ১৯২৩-২৪ সন হইতে আমি প্রতি সপ্তাহে শনিবার বৌবাজারে 'উৎসব' পত্রিকার আফিসে পূজনীয় ৺রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের ও আর দু' একজন মাননীয় শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার মুখে প্রথমে গীতা ও পরে অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ উপলক্ষে শাস্ত্রীয় নানা তত্ত্বকথা শুনিতে আরম্ভ করি। পূজনীয় মজুমদার মহাশয় প্রায়ই সকলকে (পূর্বে দীক্ষা না হইয়া থাকিলে) অবিলম্বে গুরুবরণপূর্বক প্রত্যহ দুইবার যথাসময়ে জপ ইত্যাদি করিবার উপদেশ দিতেন। গুরুসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ এইরূপ ছিল যে, কুলগুরুই একমাত্র গুরু ; তিনি যেমন লোকই হউন, তাঁহা হইতে যথারীতি দীক্ষা নিতে হইবে ; পরে আবশ্যক বোধ হইলে উপযুক্ততর ব্যক্তি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত ব্যক্তি শিক্ষাদাতাই হইতে পারেন, দীক্ষাদানের অধিকারী নহেন। কেহ যদি বলিতেন, কুলগুরু যদি স্বয়ং সাধক, এমন কি চরিত্রবান্ ব্যক্তিও না হন, তবুও কি তাঁহা হইতেই দীক্ষা নিতে হইবে ? তাহা হইলে মজুমদার মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "তুমি বাপু কতখানি উন্নত পুরুষ যে, ব্যাস-বশিষ্ঠ তোমাকে দীক্ষা দিতে আসিবেন ?" তাঁহার এই মত আমার মনঃপূত ছিল না। 'উৎসব' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পূজনীয় কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে কিন্তু এ বিষয়ে তত গোঁড়া দেখি নাই। উৎসব-সৎসঙ্গের বাহিরে আমার প্রশ্নোত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "কুলগুরুই অবশ্য দীক্ষাদাতা বটেন, তবে তিনি চরিত্রবান্ ও সদাচারপরায়ণ না হইলে তাঁহা হইতে দীক্ষা নেওয়া সঙ্গত নহে। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় আমার

মাত্মীয় (সম্পর্কে ভাই)। শ্রীমান্ (ইদানীং পরলোকপ্রাপ্ত) কৌশিকীমোহন
নের গুরু, বিজ্ঞ, সদ্বক্তা, সচ্চরিত্র এবং ক্রিয়াবান্। ভাবিয়াছিলাম এবং
শিকীরও সেইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় যদি দীক্ষা না দেন,
হা হইলে ইঁহারই শরণাপন্ন হইব। বলা অবশ্য কর্তব্য যে, পণ্ডিত কেদারনাথ
র্থলোভী নহেন বলিয়া ধনী বা দরিদ্র কাহাকেও শিষ্য করিতে একেবারেই
গ্রহশীল নহেন। তবে আমাকে তিনি চিরদিন যেরূপ সুচক্ষে দেখেন, তাহাতে
শা করা যাইত এবং কৌশিকীও আশা করিত যে, তিনি আমাকে কৃপা
রিতে সম্মত হইতে পারেন।

গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঠিকানা পাইতে বিলম্ব হইয়া গেল। পাইয়া
ন পত্র লিখিলাম, তখন তিনি কাশীতে শেষশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং
হার অল্পদিন পরেই পরলোকগমন করেন। তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক কোনও পুত্র
ছে কি না তাহা জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াও উত্তর পাই নাই। এটি খ্রীষ্টীয়
২৯ সনের কথা। ঐ বৎসর পূজার ছুটির সঙ্গে কিছু ছুটি নিয়া আবার পশ্চিমে
ড়াইতে গিয়েছিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি খ্রীঃ ১৯২০ সনে কাশী হইতে হরিদ্বার
ই, সেখানে কয়েকদিন থাকিলেও কোনও সাধুদর্শনের এমন কি সুপ্রসিদ্ধ
ভোলানন্দ গিরি মহারাজকে দর্শনেরও ইচ্ছা হয় নাই। ইঁহাকে একবার আমি
কায় দেখিয়াছিলাম; বিশেষ আকৃষ্ট হই নাই। খ্রীঃ ১৯২১ সনেও পশ্চিমে
ই। কিন্তু কাশীতে নহে, বৃন্দাবন ও অন্যান্য স্থানে। বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ মল্লিক
মক একজন বাঙালী সাধনশীল ভদ্রলোকের সঙ্গে শ্রীসন্তদাস বাবাজীকে
পূর্বাশ্রমের শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরীকে) দর্শন করিতে গিয়াছিলাম,
ন্তু তিনি তখন ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাগত ছিলেন বলিয়া চাক্ষুষ দর্শন মাত্রই
য়াছিল, কথা হয় নাই। অপর এক শ্রেষ্ঠ সাধু শ্রীরামকৃষ্ণ বাবাজী পূর্বোক্ত
দ্রলোক হইতে আমার পরিচয় পাইয়া এবং তৎকাল পর্যন্ত আমি সাধনভজন
ছু করিতেছি না শুনিয়া বিস্মিত এবং বোধ করি কিঞ্চিৎ ব্যথিতই হইয়াছিলেন।
নি সদয় নির্বন্ধসহকারে আমাকে প্রত্যহ সমগ্র গীতা, অসমর্থ পক্ষে যতটা
ব (অন্ততঃ এক অধ্যায়) পাঠ করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। এই
ষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন, "গীতা পাঠের সময় অর্থের দিকে
দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই, কেবল আবৃত্তি করিয়া যাইবে।"

খ্রীঃ ১৯২৯ সনে প্রথমে চুনার যাই; সঙ্কল্প ছিল তথা হইতে গবালিয়র হইয়া
ন্য স্থানে যাইব। আমার এক বাল্যবন্ধু (সাব্‌জজ) দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
প্রতিভাশালী পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ (ইনি এখন মুন্সেফ হইয়াছেন) আমার
ী হইয়াছিলেন। কিন্তু চুনারে গিয়া উভয়েরই সঙ্কল্পের পরিবর্তন হয়, ফলে
য়েই চুনার হইতে (পঞ্জিকায় লিখিত কোনও কোনও গ্রহের মত) 'বক্রগতি'তে
শীতে যাই। আমাদের কুলগুরুবংশীয় গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় কাশীতেই

শেষ বয়সে থাকিতেন এবং সেইখানেই পরলোকপ্রাপ্ত হন। ইচ্ছা ছিল তাঁহা ঠিকানায় গিয়া অনুসন্ধান করিব, তাঁহার কোন দীক্ষাদানক্ষম পুত্র আছেন কি না কাশীতে পৌঁছিয়াই আমার বহুকালের পরিচিত এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষা হয়; ইনি গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের আত্মীয়। ইনি বলিলেন,—৺গোপা ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোনও পুত্র নাই, একটি কন্যামাত্র আছেন। সার ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা সত্য হইল; তাঁহার অভাবে কুলগুরু মিলিল না কিন্তু ক্ষতি হইল কি ?

আমার জীবনে বহু ব্যাপারেই এরূপ দেখা গিয়াছে যে, আমি যাহা পাইবা জন্য বিশেষ চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, তাহা পাই নাই; কিন্তু কিছু বিল হইলেও তাহার স্থলে যাহা পাইয়াছি তাহা তত্তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট। ই ভগবানের কৃপা ভিন্ন কি বলিব ? তিনি আকাঙ্ক্ষিত নিকৃষ্টতর বস্তুতে বঞ্চি করিয়া প্রায় অযাচিতভাবে উৎকৃষ্টতর বস্তু একরূপ আমার হাতের মুঠিতে গুঁজি দিয়াছেন। কবির ভাষায় আমি ঠিকই বলিতে পারি—

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করি বাঁচালে মোরে;
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে ॥

তেমনই কবির এ উক্তিও সত্য কি ?—

দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য ক'রে।

নিজের অনুভব নাই, কাজেই সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক এবারেও শ্রীযুক্ত গোপীনাথেরই অতিথি হইয়াছিলাম। আমরা (আমি ও শ্রীমান্ শৈলেন) দিবা দ্বিপ্রহরে যখন তাঁহার বাসায় পৌঁছি, তখন তি বাড়ীতে ছিলেন না। আমরা স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া দশাশ্বমেধঘাট প্রভৃ স্থানে বেড়াইয়া যখন তাঁহার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে দেখিলাম গোপীনাথ কয়েকজন শ্রোতার নিকট পাতঞ্জল দর্শন ব্যাখ্যা করিতেছেন শুনিলাম প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে ঐ কয়টি শ্রোতার আগ্রহে ঐভাবে যোগশাস্ত্রে ধারাবাহিক ব্যাখ্যা হয়। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন এগার বৎসর পূর্বের পরিচি আমার সেই সদানন্দ বিজয়দাদা। আর ছিলেন গোপীনাথের এক গুরুভ্রাত কাশীবাস্তব্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে, একটি সন্ন্যাসী—নাম স্বামী শঙ্করানন্দ, একটি দুইটি ছাত্র, এবং আরও দুই একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গোপীনাথের শাস্ত্রব্যাখ্যায় কতখানি উপকৃত হইতেছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু পরে গোপীনাথের মুখে শুনিয়াছি ঐ ব্যাখ্যাকালে একটা অলৌকিক ব্যাপারে মধ্যে মধ্যেই সকলে বিশি

ও পুলকিত হইতেন। সেটি এই—(দ্বিতলে) তাঁহাদের বসিবার প্রকোষ্ঠটি অকস্মাৎ কোনও দৃষ্টকারণ-ব্যতিরেকে অপূর্ব পদ্মগন্ধে ভরিয়া যাইত। গোপীনাথ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ অসংশয়ে মানিতেন যে, উহা তাঁহাদের গুরু 'গন্ধবাবা'রই উপস্থিতির নিদর্শন। গন্ধবাবার শিষ্য না হইলেও শ্রোতৃগণের অন্যতম নেপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক একটি অতিশয় সৎস্বভাব যুবক নাকি একদিন মুহূর্তের জন্য গন্ধবাবাকে জানালার কাছে গোপীনাথের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও দেখিয়াছিলেন। এটা অলৌকিক দর্শন; যে জানালার বাহিরে মূর্তি দেখা গিয়াছিল, তথায় স্থূল দেহে কাহারও দাঁড়াইবার স্থান নাই।

বিজয়দাদাকে দেখিবার ফলে তৎক্ষণাৎ মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইল—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী এবার কাশীতে আছেন কি না। শুনিলাম আছেন। তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইব এরূপ স্পষ্ট কোনও সঙ্কল্প তখনও মনোমধ্যে ছিল না। তথাপি যে অজ্ঞাত শক্তি আমাকে কাশীতে টানিয়া আনিয়াছিল, বোধ করি তাহারই প্রেরণায় দুইদিন পরে গোপীনাথের সঙ্গে পুনরায় তাঁহার গুরুদেবকে দর্শন করিতে গেলাম। যেখানে গেলাম সেটি হনুমানঘাটের সন্নিহিত পুরাতন আশ্রম নয়, বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনের নিকটবর্তী মালদহিয়া পল্লীতে অবস্থিত নূতন আশ্রম; নাম "বিশুদ্ধানন্দকানন"। গোপীনাথ গুরুর নিকট আমার পরিচয় দিলে আমি নিবেদন করিলাম যে, এগার বৎসর পূর্বে আর একবার তাঁহার শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভাময় মুখে ক্ষণকালের জন্য স্বভাবসিদ্ধ মৃদু স্মিত ফুটিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব দর্শনের বিষয় স্মরণ করিতে পারিলেন এরূপ মনে হইল না। কাজেই আমি যে ধীরে ধীরে তাঁহারই কৃপাদ্বারা তাঁহার চরণের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলাম এ বোধ তখনও আমার হয় নাই।

স্বামীজি এবারও একখানি তক্তপোষে বসিয়াছিলেন এবং নীচে ফরাসে অনেক লোক ছিলেন। অনুমানে বুঝিয়াছিলাম অধিকাংশই স্বামীজির শিষ্য। একখানি অপেক্ষাকৃত বড় হীরকখণ্ড ঐখানে ছিল, এবং তৎসম্বন্ধে যে আলাপ চলিতেছিল তাহা হইতে জানিয়াছিলাম ঐটি সূর্যবিজ্ঞান-বলেই প্রস্তুত হইয়াছে। অন্যান্য প্রসঙ্গও কিছু কিছু হইল। তৎপর স্বামীজির একটি শিষ্যকে খুঁজিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিলাম। ইনি অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায়। আমার শ্বশুর-পরিবারের আত্মীয়। এখন আর পূর্বদৃষ্ট অবসরপ্রাপ্ত সবজজ হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে আশ্রমবাস সাধ্য ছিল না; শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায় মহাশয় তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও বড় ঘরের সন্তান, মোটা পেন্সন পাইতেছিলেন; স্ত্রী পুত্র সবই বর্তমান থাকিলেও বৃদ্ধ বয়সে আশ্রমে ভূশয্যায় শয়ন ও অতি সাধারণ খাদ্যে উদর পূরণ করিয়া নির্বিকার চিত্তে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিতেছিলেন।

কাশী হইতে গবালিয়র, আজমীর, পুষ্করতীর্থ, চিতোর, উদয়পুর, অমৃতসর, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি বহুস্থান ঘুরিয়া পনের-কুড়ি দিন পরে আবার কাশীতে ফিরিয়া আসি। শ্রীমান শৈলেন এবার সঙ্গে ছিলেন না, তাঁহাকে অমৃতসরে তাঁহার এব আত্মীয়ের বাসায় রাখিয়া আমি একা কলিকাতা ফিরিতেছিলাম। কাশীতে এবার দুই বা তিন দিন মাত্র ছিলাম। সঙ্গীটি না থাকাতে বাসায় বসিয় গোপীনাথের সঙ্গে দীক্ষাদি সম্বন্ধে বহু আলাপ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছিলাম। সংক্ষেপে উহা এইরূপ—

আমি। গোপীনাথ, তুমি ত নানা শাস্ত্র যথেষ্ট চর্চা করিয়াছ। কুলগুরুর নিকটই মন্ত্রগ্রহণের অবশ্যকর্তব্যতা-সম্বন্ধে যেসকল বচন আছে, তাহার যৌক্তিকতা বিষয়ে মনে নানা সন্দেহ হয়। রামদয়াল মজুমদার মহাশয় বলেন, কুলগুর যেরূপ ব্যক্তিই হউন, তাঁহার নিকটেই মন্ত্র নেওয়া উচিত।

গোপী। হাঁ, শাস্ত্রে ঐরূপ কথা আছে।

আমি। আমি ত যতদূর বুঝিয়াছি ইহার একমাত্র হেতু এই যে, কুলগুরু কুলদেবতাসম্বন্ধে খবর রাখেন। পূর্বপুরুষগণ যে দেবতার সাধনা করিয়া গিয়াছেন সেই দেবতার ধ্যান ও তাহার নামজপ দ্বারাই তাঁহাদের বংশধরদিগের আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হওয়া সহজ। এমনও হইতে পারে পূর্ব জন্মের আধ্যাত্মিক প্রযত্নের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই লোকে বংশবিশেষে জন্মগ্রহণ করে।

গোপী। হইতে পারে। তবে কুলমন্ত্র যে সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর তাহা বা বলি কিরূপে? সেদিন আমার আত্মীয় (স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী) মাখনবাবু গুরুদেব হইতে দীক্ষা নিলেন। ইঁহার কুলগুরু হইতে পূর্বে দীক্ষা হইয়াছিল বাবার নিকট যখন ইনি দীক্ষা নেন, তখন বাবা ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। "তুমি কি মন্ত্র পাইয়াছ?" ভদ্রলোক চিরন্তন সংস্কারবশতঃ মন্ত্রটি বলিতে সঙ্কোচ বোধ করায় বাবা বলেন, "এই মন্ত্র ত?" বাবা ঠিক মন্ত্রটিই বলেন; এবং তারপর বলেন, "এটি তোমার অগ্নিমন্ত্র, তুমি বেশী জপ কর নাই, তাই রক্ষা; নচেৎ ঘোরতর অকল্যাণই হইত।"

গোপীনাথ বলিতে লাগিলেন, "সদ্‌গুরু নিজ সাধনবলে দীক্ষাপ্রার্থীর পূ পূর্ব জন্মের সাধনের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিয়া এজন্মের উপযোগী মন্ত্র দান করেন দেবতার ধ্যানটা বেশী কিছু নয়, উপযুক্ত মন্ত্র উপযুক্ত ভাবে সাধন করিলে দেবতা স্বতঃ দর্শন দেন। মন্ত্রটি একটা বহিরাবরণ-মাত্র, ঐ আবরণের অন্তরালে থাকে শক্তি। সদ্‌গুরু ঐ শক্তির চৈতন্য-সম্পাদন-পূর্বক উপযুক্ত আবরণে আবৃত করিয়া

১. অধুনা পরলোকগত সুগায়ক মাখনলাল ভট্টাচার্য। ইনি ঐ সময়ে গোপীনাথের বাসায় কিছুদিনের জন্য ছিলেন। মাখনবাবু পাবনা মথুরার ভট্টাচার্য বংশীয়। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে মথুরা ভট্টাচার্য-বংশের বহু শিষ্য আছে। মাখন ভট্টাচার্য মহাশয়ও গুরুতা-ব্যবসায়ী ছিলেন।

ন্মকে দান করেন। ঐরূপ শক্তিসমন্বিত মন্ত্রই সাধককে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর রিয়া দিতে পারে।

কুলমন্ত্র তখনও আমার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়া আছে; তাই বলিলাম, লমন্ত্রব্যতিরেকে যে-কোনও মন্ত্র পারে কি?

গোপীনাথ। মন্ত্রের কথা কি? সদ্গুরু-প্রদত্ত যে-কোনও শব্দই পারে। গুলি ত কিছু নয়, ভিতরে যে চৈতন্যময় বস্তু থাকে তাহাই হইতেছে মন্ত্র।

আমি। তুমি বলিতেছ ঐ মন্ত্রটি সাধকের প্রকৃতির অনুকূল হওয়া চাই; লমন্ত্র অনুকূল নাও হইতে পারে?

গোপী। হাঁ, মাখনবাবুর কুলমন্ত্র প্রতিকূল ছিল। অন্যেরও ঐরূপ হইতে পারে।

আমি। ভগবানের নামও অনুকূল-প্রতিকূল আছে নাকি?

গোপী। ভগবান্‌কে মিত্রভাবে শত্রুভাবে—দুইভাবেই ভজন করা যায়; এবং ই ভাবেই তাঁহাকে পাওয়াও যায়। সাধারণ লোক ত কেবল ভগবানকেই চায় ।, ঐহিক কল্যাণও চায়; ভুক্তি এবং মুক্তি দুইই চায়। অরিমন্ত্র ঐহিক কল্যাণের নুকূল নয়, বিরোধী। যে সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী, তার পক্ষে মিত্রমন্ত্র আর রিমন্ত্র নাই—সব সমান। অরিমন্ত্র আশু সিদ্ধিদায়কও হইতে পারে। গৃহীর ক্ষে অরিমন্ত্র ঐহিক কল্যাণের অনুকূল নয়। শক্তিশালী গুরুকে ত সবই বিচার রিতে হয়।

আমি। আমি শুনিয়াছি গৃহীর পক্ষে সন্ন্যাসী হইতে মন্ত্রগ্রহণ মঙ্গলজনক নয়।

গোপী। হাঁ, শাস্ত্রে আছে বটে সন্ন্যাসী সন্ন্যাস-মন্ত্রই দিতে পারে, গৃহীকে ক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে বিধিসঙ্গত নয়। তবে পরমহংস সে বিধির অধীন নন; ননা পরমহংস গৃহীও নহেন, সন্ন্যাসীও নহেন।

বহু বৎসর পরে গুরুভ্রাতা (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্স্‌পেক্টার) শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ য়চৌধুরীর মুখে অরিমন্ত্রে দীক্ষার এক শোচনীয় ইতিবৃত্ত শুনিয়াছি। প্রসঙ্গ-াপ্ত বলিয়া উহা এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণাপ্রসাদ, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ অন্নদাপ্রসাদ য়চৌধুরী—ইঁহাদের সকলেরই কুলগুরু হইতে প্রথমে দীক্ষা হয়। পরে ইঁহারা মীজির শরণাপন্ন হন। অন্নদাপ্রসাদ স্বভাবতঃ খুব ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান ও ত্যপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কুলগুরু হইতে দীক্ষালাভের পর মধ্যে মধ্যে হার মন অত্যন্ত বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইত। বিষাদটি ছিল ইংরাজীতে যাহাকে ল religious melancholia সেই জাতের। স্বামীজি হইতে দীক্ষা গ্রহণ রিতে বসিয়া তিনি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "আমাকে আমার কুলগুরু যে মন্ত্র য়াছেন তাহাই দিবেন, অন্যমন্ত্রে আমার বিশ্বাস হইবে না।" অন্নদাপ্রসাদের হিক অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়াও অগত্যা স্বামীজি তাঁহাকে কুলগুরুদত্ত মন্ত্রই

দিলেন। কিছুকাল পরে স্বামীজি তাঁহার অপর এক শিষ্য দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে (ইনিও পুলিশ কর্মচারী—তখন বর্ধমানে কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টার ছিলেন) কথাপ্রসঙ্গে বলেন, অন্নদা অল্পকালমধ্যেই আত্মহত্যা করিবে এবং উহা অনিবার্য। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুর আদেশ অনুসারে প্রকাশ না করিয়া মধ্যে মধ্যে দক্ষিণাপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্নদা কেমন আছেন? দক্ষিণাদাদার সহিত এক বিভাগের কর্মচারী বলিয়াও বটে, গুরুভাই বলিয়াও বটে, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সেইজন্য প্রতিপত্রেই দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদাপ্রসাদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে দক্ষিণাদাদা মনে মনে কি বিস্মিত হইতেন। তারপর একদিন যখন সত্যসত্যই অন্নদাপ্রসাদ আত্মহত্যা করিয়া ফেলিল, তখন ঐরূপ জিজ্ঞাসার প্রকৃত কারণ প্রকাশ পাইল। স্বামীজি দক্ষিণাপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদকে অন্নদার মৃত্যুর পর বলিয়াছিলেন অন্নদার পূর্ব মন্ত্র অরিমন্ত্র ছিল, তাহাতেই মাথা খারাপ হইয়াছিল; তবে তখন মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত ছিল না বলিয়া দ্রুত অনিষ্ট করে নাই। "তবে," স্বামীজি বলেন, "দাদা, গুরুদেব (শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস) বলিয়াছেন, অন্নদার ঠিক আত্মহত্যা হয় নাই; ফাঁসিলাগিবার পূর্বেই তাহার প্রাণহরণ করা হইয়াছিল। আত্মহত্যার চেষ্টা তাহার কর্মক্ষয়ের কর্ম—ইহার ফলে তাহার কোনও অসদ্‌গতির আশঙ্কা নাই।"

রাধিকাপ্রসাদের কুলমন্ত্র তাঁহার পক্ষে অরিমন্ত্র ছিল কিনা তাহা প্রকাশ নাই। তিনি আবার খ্রীঃ ১৮৯৩ সনে কলিকাতায় আর্যমিশনের আচার্য সুবিখ্যাত পঞ্চানন ভট্টাচার্য হইতে যোগক্রিয়া প্রাপ্ত হন। তাহার কিছুকাল পর হইতেই তিনি গুরুতর অম্বলের ব্যারামে ভুগিতেছিলেন। ১৯০৪ সনে রাণীগঞ্জের নিকট উখরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক থাকা কালে তিনি স্বামীজিকে প্রথম দর্শন করেন। তখন তাঁহার অম্বলের ব্যারামের কথা শুনিয়া স্বামীজি বলেন, "আপনি পেটুক লোক, লোভবশতঃ খাইতে বসিয়া অধিক খাইয়া ফেলেন। এদিকে এরূপ যোগক্রিয়া নিয়াছিলেন যাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণা মন্দীভূত হয়। ফলে আপনার যোগক্রিয়া (শ্বাসের ক্রিয়া) আপনার পরিপাক যন্ত্রকে এরূপ অবস্থায় আনিয়াছে যে উদরস্থ খাদ্য জীর্ণ হইতে পারে না। এইভাবে চলিলে আপনার ক্ষয়রোগ অনিবার্য।" বস্তুতঃ সত্যসত্যই কিছুদিন পরে জ্বর হওয়ার সঙ্গে তাঁহার গলা দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, যদিও তিনি স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই যোগক্রিয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে দক্ষিণাদাদা গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, "রাধিকাপ্রসাদকে বলিও, দাদা গুরুদেব বলিয়াছেন, রাধিকার যে ব্যাধিই হউক, তাহাকে মরিতে দেওয়া হইবে না, সে যেন নিশ্চিন্ত থাকে। ইহা ১৯০৪ সনের কথা; ১৯০৮ সনে রাধিকা রায়চৌধুরী স্বামীজি হইতে রীতিমত দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপূর্বে তাঁহা হইতে আসন-মুদ্রাদি পাইয়াছিলেন। দীক্ষার পর দশ বৎসর সাধন-ভজন করিয়া

তিনি ১৯১৮ সনে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরলোক গমনের বৃত্তান্তও অতি অপূর্ব। কিন্তু উহা বর্ণনার স্থান এ নয়। তিনি স্বামীজির অত্যন্ত ভক্তিমান শিষ্য ছিলেন।

দেখা গেল সাধনপথে অনুপযুক্ত মন্ত্র এবং অনুপযুক্ত ক্রিয়া প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটাইতে পারে। অতএব সদ্‌গুরু পাওয়া গেলে তাঁহার নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ কর্তব্য।

এখন পূর্বে যে প্রসঙ্গ হইতেছিল তাহারই অনুসরণ করা যা'ক। যেদিন গোপীনাথের আত্মীয় মাখন ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্বামীজি হইতে দীক্ষা হয়, সেদিন আমি কাশীতে গোপীনাথের বাসায়ই ছিলাম। গোপীনাথের সহিত তাঁহার দীক্ষার্থ আশ্রমে গমন এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পরেই তথা হইতে প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করিয়া, আমার মনে হইয়াছিল স্বামীজি-প্রদত্ত দীক্ষাতে অনুষ্ঠানবাহুল্য কিছুই নাই। আমি আমার এই ধারণা ব্যক্ত করিলে গোপীনাথ বলিলেন, মন্ত্রদান-কালে বেশী সময় লাগিবার কোন কারণ নাই ; কিন্তু তৎপূর্ব রাত্রিতে গুরুকে শিষ্যের উপযুক্ত মন্ত্র নির্ণয় করিতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার কয়েক (সাধারণতঃ তিন) জন্মের সাধন তথ্য-নির্ণয় করিতে হয়। কাহারও কাহারও তাহারও অধিক জন্মের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে হয়।

গোপীনাথ আরও বলিলেন, মন্ত্র ঠিক হইল কিনা তাহার পরীক্ষার এক উপায় আছে।[১] দীক্ষার জন্য আবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে একটি নূতন কাঁসার বাটিতে পাঁচ তোলা ঘৃত দিতে হয়। গুরু মন্ত্র নির্ণয়পূর্বক প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা ঐ মন্ত্র ঘৃতে প্রয়োগ করিলে ঘৃত মন্ত্রের তেজে ফুটিয়া উঠে। উহা না হইলে বুঝা যায় মন্ত্র ঠিক হয় নাই। তখন প্রকৃত মন্ত্রোদ্ধার জন্য পুনরায় পরিশ্রম করিতে হয়। দীক্ষান্তে ঘৃত পাত্রটি ভোজ্য ও দক্ষিণাসহ কোনও ব্রাহ্মণকুমারীকে দান করিতে হয়।

আমি সব কথা শুনিয়া গেলাম। যে বিষয়ে কিছু জানি না, বা যে মর্মের কথা অন্যত্র শুনি নাই তাহাতে আমার মত রুচিসম্পন্ন লোকের বিশ্বাসস্থাপন দুঃসাধ্য ছিল। আবার জানি না বা পূর্বে শুনি নাই বলিয়া স্পষ্ট অবিশ্বাস করাও যুক্তিসঙ্গত নয় এ বোধও ছিল।

কাজেই আমার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা কিছু কঠিন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কুহেলিকাবহুল অবস্থা আছে যাহাতে অনবরত সংশয় উঠিতে ও পড়িতে থাকে, কোনও দিক হইতে আলোকের কোনও স্পষ্ট রশ্মি আসিয়া সত্য আবিষ্কারে বা গন্তব্যপথনির্ণয়ে সাহায্য করে না, সেই রকমের একটা অবস্থা তখন আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। সে যাহা হউক প্রশ্ন করিলাম, "স্বামীজি কোন্ মতে দীক্ষা দেন ?" প্রশ্নের পশ্চাতে মনের ভাবটা

১. এই কথা স্বামীজীর মুখে পরে আমিও শুনিয়াছি।

ছিল এই রকম : আমি আজন্ম যে আবেষ্টনে বর্ধিত হইয়াছি তাহা ছাড়িতে হইলে সহজে পারিব কি ? যে সকল বিধিনিষেধ কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছি সেইগুলিই পালন করিতে হইলে মন সহজে সম্মত হইবে কি ?

গোপীনাথ উত্তর দিলেন, "গুরুদেব পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন পরীক্ষা করিয়া শাক্ত বৈষ্ণব, শৈব যাহার পক্ষে যেটি উপযুক্ত তাঁহাকে সেইরূপ মন্ত্র দেন।"

এখনও কুহেলিকা কাটিল না। আর একটা সমস্যা মনে উদিত হইল। আমি শুনিয়াছিলাম অত্যুৎসাহী গুরুরা অনেক সময়ে শিষ্যের ঘাড়ে এমন কর্তব্যভার চাপাইয়া দেন যে, দৈনন্দিন সংসারযাত্রার সহিত সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া তাহা যথানিয়মে সম্পাদন করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজি যাহা করিতে দেন, তাহাতে কতটা সময় লাগে ?"

গোপীনাথ। এ বেলা আধঘণ্টা, ওবেলা আধঘণ্টাই যথেষ্ট।

গোপীনাথের শেষোক্ত কথায় মনে কিছু ভরসা হইল।

প্রশ্ন। আহারাদি সম্বন্ধে কোনও নিয়ম আছে ?

উত্তর। বিশেষ নাই। গুরুদেব কেবল পেঁয়াজ ও ডিম খাইতে মানা করেন।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার (অজীর্ণরোগের) জন্য পেঁয়াজ পূর্ব হইতেই বর্জন করিয়াছিলাম। আর, কি উড়িয়া কি পশ্চিমা কোনও পাচকই ডিম রান্না করিতে চাহিত না বলিয়া বাড়ীতে ডিম কদাচিৎ খাওয়া হইত। কাজেই তাহা বর্জন করা কোনও রূপেই একটা ট্রাজেডি (মর্মান্তিক ব্যাপার) ছিল না।

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, গোপীনাথ তাঁহার গুরুর একখানি জীবনী সঙ্কলন করিতেছেন। উহার দুই ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, আরও কয়েক ভাগ হইবে। গোপীনাথ প্রথম ভাগের এক খণ্ড আমাকে দিলেন। দ্বিতীয় ভাগের কোনও খণ্ড হাতে ছিল না বলিয়া তখন দিতে পারিলেন না, পরে দিবেন বলিলেন।

আরও শুনিলাম স্বামীজি প্রতিবৎসরই গ্রীষ্মের সময় কলিকাতায় আসিয়া কয়েকমাস এখানে যাপন করেন। এমন কি, গোপীনাথও ঐ সময়ে কিছুদিনের জন্য এখানে আসিয়া গুরুসঙ্গ করেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এ সংবাদ পূর্বে পাই নাই। নচেৎ হয়ত স্বামীজির সহিত এখানে দুই চারিবার সাক্ষাৎ করা যাইত। অনেকেই বলেন সময় না হইলে কিছুই হয় না। অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে তাহা ত স্পষ্টই দেখা গেল।

সে যাহা হউক, কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের সঙ্গে আর একবার স্বামীজি দর্শনে গেলাম। এবার কি আলাপাদি হইয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। উঠিয়া আসিবার সময় প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আমার প্রতি যেন আপনার দয়া থাকে।"

স্বামীজি অতি সহজ সরল-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা" ; ইহার অধিক আর কিছুই বলিলেন না। অধিক কিছু আশাও করি নাই।

বহুদিন পরে শুনিয়াছি, গুরুভ্রাতা হোমিওপ্যাথিক ডাঃ ফণিভূষণ চৌধুরী যখন স্কুলের ছাত্র, তখন সহাধ্যায়ী ও বন্ধু বিশ্বেশ্বর দত্তের মুখে প্রায়ই স্বামীজি সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্যজনক কথা শুনিতেন ; কতক বিশ্বাস করিতেন, কতক করিতেন না। অবশেষে একদিন তিনি বিশ্বেশ্বর দত্তেরই আগ্রহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধুনা পরলোকগত (এটর্ণী) ননী দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসেন। তিনি যখন ঐ বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন হঠাৎ স্বামীজি বাহির হইতে তথায় আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলেন, "কি গো, ভাল ত ?" পনের-ষোল বৎসর-বয়স্ক ফণিভূষণ এই অতর্কিত দর্শন ও সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ; তাই কেমন একটু অপ্রতিভ হইয়া গিয়া শুধু "আজ্ঞে হাঁ" এইটুকু বলিতে পারিলেন। স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, আবার দেখা হবে।" এই দেখা হইল ষোল বৎসর পরে, যখন ফণিভূষণের দীক্ষার কাল আসন্ন হইয়াছে। তখন পিতার বাধাসত্ত্বেও লুকাইয়া গিয়া তিনি স্বামীজির চরণ আশ্রয় করেন।

স্বামীজি আমাকে ফণীদাদার মত অতি দূর ইঙ্গিত দ্বারাও বুঝিতে দেন নাই, আমি তাঁহারই চিহ্নিত দাস। এগার বৎসর পূর্বেও নয়, এ দিনেও নয়। উৎকৃষ্ট অধিকারী অনেককেই তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া শ্রীচরণে টানিয়া নিয়াছেন। খ্রীঃ ১৯১৭ সনের ডিসেম্বরে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ স্বামীজির নিকট প্রথম যান এবং তাহার পর হইতে তাঁহার সর্ববিষয়ে অসাধারণত্ব দর্শন করিয়া প্রায় প্রত্যহই যাইতে থাকেন ; কিন্তু দীক্ষা লওয়ার কথা তখনও ভাবেন নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার কি হার্টের (হৃৎপিণ্ডের) কোনও ব্যারাম ছিল ? হার্টটা এখনও দুর্বল দেখিতেছি।" ছয় বৎসর পূর্বে গোপীনাথ হৃদ্‌রোগে প্রায় এক বৎসরকাল ভোগেন। কিন্তু সে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তিনি নিজেকে সুস্থ বলিয়াই জানিতেন। সে যাহা হউক, স্বামীজি বলিলেন, "দীক্ষা হইলে সব সারিয়া যাইবে, কোনও চিন্তার কারণ নাই।" ইঙ্গিতরূপ বীজ সৎক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল বলিয়া শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইল এবং দুই মাস মধ্যেই স্বামীজি গোপীনাথে শক্তিপাত করিলেন।

৺উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন পুলিশের দারোগা। স্বামীজির তদানীন্তন লীলাস্থল গুক্‌রা তাঁহার এলাকার অন্তর্গত ছিল। উপেন্দ্রবাবুকে একদিন গুক্‌রায় দেখিয়া স্বামীজি নিজের কোনও কোনও ভক্তকে বলেন, "এই দারোগা বাবুটি আমার বহুকালের পরিচিত, এখন এ সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে।" এই "বহুকালের" অর্থ পরে প্রকাশ পাইয়াছে। এ জন্মে তৎপূর্বে উপেন্দ্রবাবু স্বামীজিকে কখনও দেখেন নাই। কুলগুরু হইতে তাঁহার দীক্ষাও হইয়াছিল। পরে স্বামীজির

আকর্ষণে তাঁহার নিকট আসেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার অপার স্নেহ ও অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ-সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপ্রসঙ্গের" তৃতীয়খণ্ডে ইঁহার লিখিত বিবরণটি খুব চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ দাদার মুখে শুনিয়াছি তিনিও প্রায় আমারই মত অনেকটা বেশী বয়স পর্য্যন্ত ধর্ম্মচর্চাবিষয়ে প্রায় অনুদ্বুদ্ধ বা নিরুদ্যম ছিলেন। মুর্শিদাবাদে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে তত্রত্য কোর্ট-ইন্স্পেক্টর শরচ্চন্দ্র খাঁ হইতে তিনি স্বামীজির নাম ও বিভূতি ইত্যাদির কথা শুনিতে পান। তৎপূর্বেও তিনি তাঁহার এক ভ্রাতার মুখে কাশীর এক সন্ন্যাসীর (প্রকৃতপক্ষে স্বামীজির) দু'একটি বিভূতিসম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। তখন তিনি বিজ্ঞের মত তাঁহাকে বলেন, বিভূতি টিভূতির মূল্য কিছু নাই; বরং উহা দেখাইলে সাধুদের পতন হয়। কয়েকবৎসর পরে তিনি অন্য এক ষ্টেশনে (ঢাকা মুন্সীগঞ্জে) নিযুক্ত থাকা কালে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাংলা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী হইতে টেলিগ্রাফে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগের প্রস্তাব প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গ ঢাকাতে তাঁহার নিজভবনে বাস করিতেছিলেন, এবং তিনিও সপ্তাহে দুই দিন তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে পারিতেছিলেন বলিয়া নিজের ও স্ত্রীর অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই চীফ সেক্রেটারীর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে পূর্বোক্ত শরচ্চন্দ্র খাঁ মহাশয়ও শিয়ালদহে কোর্ট ইন্স্পেক্টর হইয়া আসেন। একদিন তিনি কোর্ট হইতে একটু সকাল-সকাল বিদায়ের প্রার্থনা করিলে সুরেশদাদা কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনি গুরুদর্শনে যাইবেন। তখন সুরেশদাদারও মনে শরৎ খাঁ মহাশয়ের গুরুকে একবার দর্শন করিবার ইচ্ছা জন্মে। কয়েকদিন পরে সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় এবং দর্শনমাত্রই তিনি স্বামীজির প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। কয়েকদিন স্বামীজির নিকট গতায়াত করিবার পর একদিন তিনি দীক্ষা প্রার্থনা করিলে স্বামীজি তাঁহার পার্শ্বে স্থিত একটি খাতা হইতে একখানি কাগজ টানিয়া বাহির করিয়া বলেন, "এই দেখ তোমার জাতচক্র; (বলা বাহুল্য সুরেশদাদা কখনও নিজের জন্মতারিখ ইত্যাদি স্বামীজিকে বলেন নাই), তোমাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে। তবে একটু বিলম্ব আছে।" ইহার পরে মাসেক-দুইমাস মধ্যেই সুরেশদাদার দীক্ষা হয়।

উপেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও দীক্ষার পূর্বে স্বামীজিকে নিজ কোষ্ঠী আনিয়া দেখাইতে চাহিলে, স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "কেন গো, কোষ্ঠী আন্তে হবে কেন? তোমার কোষ্ঠী আমার কাছে আছে, তুমি কি আমার আজকার পরিচিত?" উপেন্দ্র চৌধুরী বলিলেন, "কৈ দেখি?" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি উপেন্দ্রবাবুর নোট বহিতে তাঁহার জন্ম-বার, তিথি-নক্ষত্র, সন-তারিখ সহ জাতচক্র আঁকিয়া দিলেন।

সে যাহা হউক, যে প্রসঙ্গ হইতেছিল,—এইসকল উচ্চ অধিকারীদিগের কথা স্বতন্ত্র। আমি অতি নিকৃষ্ট অধিকারী, পদে পদে ঘোরতর সন্দিগ্ধচিত্ত। আমার ভাবী গুরু যদি প্রথমদর্শনে বা কোনও সময়েই স্পষ্ট কোনরূপ ইঙ্গিত দ্বারা আমাকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমার যে প্রকৃতি, তাহাতে খুব সম্ভব ফল বিপরীত হইত। বোধ করি সেইজন্য আমি যে স্বামীজির পূর্বনির্দিষ্ট দাস এরূপ কোনও আভাস পূর্ব হইতে আমাকে তিনি দেন নাই। আমি তাঁহার গাম্ভীর্য দ্বারাই অধিক উপকৃত হইয়াছি। আরও একটি কথা এইস্থলে বলা যাইতে পারে। আমি যে আবেষ্টনে বর্ধিত, তাহাতে কুলগুরু হইতে একবার দীক্ষা হইলে কখনই সদ্গুরুর অনুসন্ধান করিতাম না। শাস্ত্রবাক্যের কুহেলিকায় দৃষ্টি হারাইয়া আমার পরিচিত ও সম্মানিত বহু শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির অনুকরণে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিতাম—কুলগুরুই সদ্গুরু। কুলগুরুর কৃপা হইতে তৎকাল পর্যন্ত যে বঞ্চিত ছিলাম ইহাও গুরুশক্তিরই খেলা সন্দেহ নাই। আমি আধ্যাত্মিকবিষয়ে সুপ্ত বা বিভ্রমগ্রস্ত থাকিলেও সদাজাগ্রতী গুরুশক্তি আমাকে উক্তরূপ বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তিন

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া অবসরমত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ-লিখিত "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ" ১ম খণ্ড পড়িয়া ফেলিলাম। ঐ গ্রন্থে বহু অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ আছে যাহাতে সকলের পক্ষে বিশ্বাসস্থাপন করা কঠিন। ঐ পুস্তক যে কাহাকেও (যথা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রভৃতিকে) মুগ্ধ ও স্বামীজির দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা পরে শুনিয়াছি। ইঁহারা জন্মান্তরীণ শুভসংস্কারবিশিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সম্ভবতঃ সেরূপ সংস্কারের অভাবে অথবা এ জন্মের শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে অলৌকিক ব্যাপারসমূহের বিবরণ সহজে হজম করিতে পারিতাম না। কাজেই ঐ পুস্তকদ্বারা খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এ কথা বলিতে পারি না। আমি সমালোচকের মনোবৃত্তি লইয়া উহা পড়িয়াছিলাম এবং তাহাই আমার অভ্যাসসিদ্ধ। কেননা বেঙ্গল লাইব্রেরীতে বসিয়া ভালমন্দ নানা রকমের বই পড়া ও তাহার সমালোচনা করা আমার নিত্যকর্ম ছিল। তবে এই সময়ে আমার এরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, যেহেতু সকল শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগের জীবনীতেই এই অলৌকিক ব্যাপারের সমাবেশ দেখা যায় অতএব সেরূপ ঘটনামাত্রেরই বিবরণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও ধীরবুদ্ধির কার্য নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের সবটাই আমরা জানিয়া ফেলিয়াছি এবং আমরা যাহা জানিয়াছি তাহার বাহিরে কিছু

ঘটে না বা ঘটিতে পারে না—ইহাও এক রকমের কুসংস্কার ; যদিও ইহাকে তথা কথিত কুসংস্কারের বিরোধী মনে করা হয়।

সৌভাগ্যক্রমে আমি পুস্তকপাঠের পূর্বে স্বামীজিকে একাধিকবার দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার শক্তি কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এবং অনেক কথা প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের প্রদত্ত বিবরণে শুনিয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপায় আমার নানারূপ বিরুদ্ধ মনোবৃত্তিসত্বেও তাঁহার প্রতি কিছু শ্রদ্ধার আবেশ আমাতে হইয়াছিল। সেইজন্য যে সময়ে তিনি কলিকাতায় প্রতিবৎসর আসেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম সেইরূপ সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করি নাই। তবে নানা কার্যের চাপে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এই সময়ে আমি নিজের পদ ছাড়িয়া অস্থায়িভাবে বাংলা গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদকের পদে নিযুক্ত ছিলাম, এবং সেই কার্যে আমাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। যাহা হউক কর্মের চাপের মধ্যেই উক্ত আফিসের একটি বাবুদ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া খবর পাইয়াছিলাম স্বামীজি কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনে (ভবানীপুরে) আছেন। এক রবিবারে একটি বন্ধু সহ ঐ বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, স্বামীজি বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। আমরা অল্প দূরে রাস্তায় অপেক্ষা করিতে করিতেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু আমরা ঐ বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়া শুনিলাম তিনি ততক্ষণ সন্ধ্যাহ্নিক করিতে নিজের কামরায় ঢুকিয়াছেন, সেদিন আর সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। আরও কিছুদিন পরে আর একদিন একটু সকাল সকাল গিয়া শুনিলাম তিনি পুরী চলিয়া গিয়াছেন রথযাত্রার পরে ফিরিবেন।

এইরূপে দুইবার ব্যর্থমনোরথ হইলেও আমার উৎসাহ যে নির্বাপিত হয় নাই ইহা এখন আমি তাঁহারই কৃপা মনে করি। অবশেষে ১৮ই শ্রাবণ (১৩২৭ সাল খ্রীঃ ৩রা আগষ্ট, ১৯২০) তারিখে দুইটি বন্ধু সহ বেলা ৩টায় পূর্বোক্ত ঠিকানায় যাইয়া তাঁহার দর্শন পাইলাম। পাদস্পর্শ-পূর্বক প্রণাম করিয়া তক্তপোষের খুব নিকটে ফরাসের উপর বসিলাম। প্রকোষ্ঠটি বৃহৎ নয় ; কয়েকটি লোকেই ভরা দেখা যাইতেছিল। কিন্তু কেহই আমার মত স্বামীজির অতটা সন্নিকটে বসে নাই। আমার আচরণ একটু দৃষ্টিকটু বিবেচিত হইবার ভয়ে আমি এই বলিয়া আলাপ আরম্ভ করিলাম যে, আমি কাণে কিছু খাটো ; সেইজন্য নিকটে বসিলে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে বাবাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

তৎপর পূর্বে তাঁহার সহিত আমার যে কয়বার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহার বিবরণ দিলাম এবং দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় তাঁহার যে বিভূতির বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম তাহারও উল্লেখ করিলাম। শেষোক্ত ব্যাপারসম্বন্ধে তিনি বলিলেন "হাঁ সেটা ওই পুরাতন আশ্রমে হইয়াছিল।"

কে একজন বলিলেন, বিভূতির দ্রষ্টা আমেরিকান ভদ্রলোকই Times of India পত্রিকায় উক্ত বিবরণ প্রথমে প্রকাশ করেন।

কথায় কথায় স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাণের এ অবস্থা কি করিয়া হইল ?"

আমি আমার যাহা বিশ্বাস তাহাই বলিলাম।

স্বামীজি। সূর্যবিজ্ঞান-মন্দির হইয়া গেলে এ ব্যারাম সারিতে পারিবে।

আমি। সারিবে কিনা বাবা জানেন। সূর্যবিজ্ঞান-মন্দির সম্পূর্ণ হইতে কত বাকি ?

স্বামীজি। মন্দির ত ঠিকই আছে। নানা বর্ণের এক ইঞ্চি পুরু বড় বড় কাচ চাই। ফ্রান্সে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। তারা লক্ষাধিক টাকা দাম চায়। অগত্যা তিব্বত হইতে আনাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু এপথে মানুষ ছাড়া যান-বাহন নাই, আনাইবার ব্যয় ও ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা খুব বেশী। একটা ব্যবস্থা হয়ত হইয়া যাইবে।

আমি। হইলেই ভাল ; আমাদের মত রোগাতুরের খুবই আশার কথা। এখন আমাদের অদৃষ্ট।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথের কথা হইল। শুনিলাম কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

স্বামীজি বলিলেন, "তার ইচ্ছা ছিল দার্জিলিং যায় ; কিন্তু কলিকাতার রাস্তায় পকেট হইতে দুই শ' টাকা মারা যাওয়াতে দার্জিলিং যাইতে পারে নাই ; পুরীও যায় নাই। কাশীই ফিরিয়া গিয়াছে।" শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায় বলিলেন, তিনি ও গোপীনাথ উভয়ে একদিন আমার বাসায় যাইবেন বলিয়া রওনা হইয়াছিলেন, কিন্তু রাস্তায় বাহির হইবার পর ঝড়-জলে ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়াতে উভয়ে ভিজিতে ভিজিতে আশ্রমেই ফিরিয়া আসেন।

পকেট হইতে এতগুলি টাকা মারা যাওয়া গোপীনাথের মত সংসারানভিজ্ঞ বা বা সংসারে উদাসীনপ্রায় ব্যক্তির যোগ্যই বটে—এই কথা আমি বলিলে স্বামীজি হাসিলেন। সে হাসি অসীম স্নেহেরই পরিচায়ক হাসি।

আমি। গোপীনাথ যেরূপ সৎ ব্যক্তি, উচ্চ অধিকারী, তাঁর প্রতি বাবার কৃপাও তেমনই অধিক। আমার প্রতি যাতে বাবার একটু কৃপা থাকে, তাই যেন হয়।

স্বামীজি। নিজের চেষ্টা চাই। ঈশ্বরের কৃপা সকলের উপরই আছে। নিজে চেষ্টা করিয়া সেটি উপলব্ধি করিতে হয়। চেষ্টা ভিন্ন অনুভবের মধ্যে তা' আসে না।

আমি। তা' ত বটেই ; ছেলে না কাঁদিলে মায়ে দুধ দেয় না—একটা কথা আছে। তথাপি একটু কৃপা না হইলে ভগবানের দিকে টান হয় না বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজী। একটু ঘা খাইলেই হয়।

আমার বুকটা কাঁপিল। মুখে বলিলাম ; তা হয়। গীতাতেও আছে—।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

কিন্তু বাবা, আর্ত ত জগতে বহু আছে, সকলে ঈশ্বরের আশ্রয় খোঁজে না। শুধু আর্ত নয়, সুকৃতী আর্ত হওয়া চাই ত ?

স্বামীজি। সেটাও ত নিজেরই চেষ্টার ফল। (এইখানে স্বামীজি কি একটা সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন। কাণের দোষে সবটা ধরতে পারি নাই, ভাবটা বুঝিয়াছিলাম।) নিজে চেষ্টা না করিলে কেহ কিছু করিয়া দিতে পারে না।

আমি। তা বটে ; (স্বামীজির কথিত শ্লোকটির ভাবার্থ অনুসরণ করিয়া) মনুসংহিতাতেও আছে—

ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপি অম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥

নির্ম্মলী ফলে জলের ময়লা কাটে ; তাই বলিয়া জলের কাছে বসিয়া তার নাম লইলেই জল পরিষ্কার হয় না।

স্বামীজি। হাঁ, হাজার প্রার্থনা করিলেও নয়, চেষ্টা দ্বারা সেই ফলটাকে কাজে লাগাইতে হয়। তবেই বোঝ।

আমি। অহেতুক কৃপা বলিয়াও একটা কথা আছে। আমরা দুর্বল, কৃপা ছাড়া আমাদের চলিবার সাধ্য কি ?

এই প্রসঙ্গের মধ্যে দু' একজন শিষ্য গৃহে ঢুকিয়া স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া সরিয়া সরিয়া বসিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার দু একটা কথাও হইতেছিল। একজনের সঙ্গে একটু বেশীক্ষণ আলাপে আমাদের প্রসঙ্গ বাধাপ্রাপ্ত হইল! স্বামীজি আমাকে যাহা বলিতেছিলেন তাহাতে আমার অন্তরের সায় থাকায় সেদিন উহার আর পুনরুত্থাপন করা উচিত বোধ করিলাম না। স্বামীজি আমার সঙ্গী দুইজনের সঙ্গেও দুই চারিটা কথা বলিয়াছিলেন।

সাতদিন পরে রবিবারে (২৫শে শ্রাবণ তারিখে) আমি পুনরায় স্বামীজির আবাসস্থলে গেলাম। স্বামীজি সে সময়ে বসিবার ঘরে ছিলেন না। আমি শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায় যে প্রকোষ্ঠে থাকেন তথায় যাইতে দেখিলাম, স্বামীজি পার্শ্বের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া কয়েকটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

দুর্গাকান্ত বাবু বলিলেন—স্বামীজি ও তিনি তিনদিন পরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কাশী যাইবেন এবং ঐ সময়ে কাশীতে যেরূপ গরম তাহাতে সম্ভবতঃ অধিকদিন সেখানে তাঁহাদের থাকা হইবে না।

আমি। কাশী আশ্রমে বিগ্রহ আছেন কি? আমি কোনও বিগ্রহ দেখি নাই।

দুর্গাকান্ত বাবু। হ্যাঁ গোপাল আছেন, অষ্টধাতুর দুর্গাপ্রতিমা আছেন। আর অনেকটি শিবলিঙ্গ আছেন।

আমি। গোপীনাথ মায়ের নামে আশ্রমে শিবস্থাপন করিয়াছেন শুনিয়াছি।

দুর্গাকান্ত বাবু। হ্যাঁ, উনি (গুরুদেব) নিজেও শিবস্থাপন করিয়াছেন। আরও অনেকে করিয়াছেন, আমিও করিয়াছি। একসঙ্গে বারটি শিব স্থাপিত হয়, পরে আরো কয়েকটি হইয়াছে। যাহারা শিব স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব শিবের সেবা-পূজার জন্য গুরুদেবের হাতে চারি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন। গুরুদেব দিয়াছেন পাঁচ হাজার টাকা। তা'ছাড়া তিনি নিজ জন্মভূমিতে (বর্দ্ধমান জিলার বণ্ডুল গ্রামে) মঠ নির্মাণ করিয়া সেই মঠে স্থাপিত শিবের সেবা-পূজার জন্য লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

আমি। এ টাকা কি শিষ্যদের দেওয়া?

দুর্গাকান্ত বাবু। না, উনি আগে ডাক্তারী ও যোগজ্যোতিষী করিতেন; তাহার আয় হইতে সঞ্চয় ছিল। আপনার দীক্ষা হইয়াছে?

আমি। না; কুলগুরু হইতে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইবার আগেই গুরুবংশের শেষ ব্যক্তি স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

দুর্গাকান্ত বাবু। আমি ত দেখুন কুলগুরু হইতে দীক্ষা নিয়াছিলাম। তারপর উঁহার নিকট (স্বামীজি হইতে) দীক্ষা নিয়াছি। দুয়ে অনেক প্রভেদ। আপনার যদি দীক্ষা নিবার ইচ্ছা হয় তবে উঁহার নিকট চাহিতে পারেন। আমি তাহাই ভাল মনে করি। বয়স ত হইল? আর বিলম্ব করিবেন না।

আমি। এ বিষয়ে গোপীনাথের সঙ্গেও আমার আলোচনা হইয়াছে; কিন্তু মন স্থির করিতে পারি নাই। আপনি ত পেন্সন নিয়া গুরুসঙ্গেই আছেন। ইহাতে কোন উপকার বোধ করিতেছেন কি?

দুর্গকান্ত বাবু। নইলে এভাবে পড়িয়া থাকিব কেন?

আমি। আচ্ছা, ওঁর কাছে দীক্ষা নিতে হলে কাল-অকাল বিচারের প্রয়োজন আছে কি?

দুর্গাকান্ত বাবু। উনি ওঁদের সেখানে (ভাবে বুঝিলাম—স্বামীজির নিজ গুরুস্থানে) জানান। সেখান হইতে অনুমতি আসিলে দীক্ষা দেন।

আমি। অনুমতি আসিতে কত সময় লাগে?

দুর্গাকান্ত বাবু। দুই তিন মাসও লাগিতে পারে। যদি দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে এখন চাহিয়া রাখিতে পারেন। চলুন এখন ওঘরে গিয়া বসি।

স্বামীজির বসিবার প্রকোষ্ঠে আসিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও তথায় আসেন নাই। একটি শিষ্য (পরে নাম শুনিয়াছি বিজয়গোপাল বসু, কলিকাতা পুলিশ কোর্টের উকিল) আমাকে বলিলেন, "আপনি ত গত রবিবারেও আসিয়াছিলেন, দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা আছে কি?" "খুব তীব্র ইচ্ছা নাই।" একথা শুনিয়া তিনি একটু মৃদু হাস্য করিলেন। শুনিলাম এক বৎসর পূর্বে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এক বৎসরে কিরূপ উন্নতি বুঝিতেছেন ইহা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "সে কথা বলিতে আমাদের নিষেধ আছে।" ইনিও আমাকে আর কালক্ষেপ না করিয়া দীক্ষাপ্রার্থনার উপদেশ দিলেন।

স্বামীজি আসিলে প্রণাম করিলাম; তিনি সস্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল ত?"

তারপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত কথাবার্তা চলিল। কতকটা শুনিতে পাইলাম, অনেকটাই নয়। একটা কথা কাণে আসিল—স্বামীজির কথা—"লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাক্‌তে নয়।" কথাটা আমার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; এত লোকের সমক্ষে দীক্ষার কথা বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছিল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম:

"বাবা, এঁরা সকলেই বাবার শিষ্য, সৌভাগ্যশালী; আমার প্রতি কি বাবার কৃপা হইতে পারে না?"

স্বামীজি। কেন পার্‌বে না? সবারই ত হচ্ছে।

আমি। ভরসা এইজন্য হয় না—অধিকারী হিসাবে আমি অতি অধম ব্যক্তি।

স্বামীজি। পূর্বজন্মের কিছু আছে।

আমি। তা বাবা জানেন; এ জন্মে ত কিছুই করা হয় নাই।

শিষ্যদের সঙ্গে স্বামীজি মৃদুস্বরে কিছু বলিলেন। সে কথার লক্ষ্য আমিও হইতে পারি ভাবিয়া মনে একটু সঙ্কোচ হইতে লাগিল। বলিলাম, "যদি কৃপা হয় তবে কখন (দীক্ষা) হইতে পারিবে?"

স্বামীজি। আমি খবর দিব।

আমি। শুনিলাম বাবা শীঘ্রই কাশী যাইতেছেন। সেখানে গোপীনাথকে বলিলেই আমি খবর পাইব।

স্বামীজি। তাহাই হইবে।

স্বামীজি নির্দিষ্ট দিনে কাশী চলিয়া গেলে আমি গোপীনাথকে আমার প্রার্থনার

বিষয় জানাইলাম। তদুত্তরে গোপীনাথ লিখিলেন, "আমি বাবাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন কোনও চিন্তার কারণ নাই। সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তবে কলিকাতায় দীক্ষা হইবে না। কাশীতে যখন ফিরিবেন তখন হইবার সম্ভাবনা আছে।"

স্বামীজির নিকট দীক্ষাপ্রার্থনা কালে তাঁহার নিকট আমার নাম গোত্র পিতার নাম ইত্যাদি কিছুই বলা হয় নাই। তাই গোপীনাথকে লিখিয়াছিলাম—আবশ্যক হইলে ঐগুলি তিনি যেন বাবাকে জানান। ভাবিয়াছিলাম ঐ সব না জানিয়া তিনি স্বীয় গুরুস্থানে কিরূপে আমার দীক্ষার প্রার্থনা জানাইবেন? পরে গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার উক্তরূপ পরিচয় তিনি বাবাকে দিয়াছিলেন কিনা। তিনি তখন আমাকে বলেন, "বাবাকে পরিচয় বলিতে হইবে কেন? আর আপনার প্রকৃত পরিচয় আপনিই কি জানেন?"

পরে জানিয়াছি স্বামীজিকে না বলিলেও কাহারও বাহ্য পরিচয়ও তাঁহার অবিদিত থাকিত না। পুরীর দয়ানিধি দাস; দাদা স্বামীজির মাহাত্ম্যের বিষয় অন্যের মুখে শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রথম দিনেই দীক্ষাপ্রার্থী হন। স্বামীজি তদুত্তরে স্বীয় অভ্যাস-মত বলেন, "আচ্ছা, আমি সেখানে লিখে দিব।" তারপর কিছুক্ষণ কথাবার্তার অন্তে তিনি উঠিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে যান। ফিরিয়া আসিলে দয়ানিধি দাদা জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, কবে আপনার গুরুপীঠে চিঠি লিখিবেন?" তাহাতে তিনি উত্তর দেন, "এই ত লিখে দিয়ে এলাম।"

দয়ানিধি। সে কি? আপনাকে ত আমার নাম ধাম ইত্যাদি কিছুই এখন পর্যন্ত বলা হয় নাই।"

স্বামীজি। সে সব বলতে হবে কেন? তুমি কি আমার অপরিচিত? তোমার নাম দয়ানিধি দাস। অমুক বৎসরে অমুক মাসের অমুক দিনে এতটার সময় তোমার জন্ম। আর কি জানতে চাও?

দয়ানিধি দাস ত অবাক! শ্রীঅরবিন্দের কথায়—যোগ-বিভূতি এই সকল স্থলে সত্যই বিভূতিই নয়—স্বাভাবিক হালচাল মাত্র। পক্ষান্তরে একথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, কোনও কোনও দীক্ষাপ্রার্থীর বেলায় আমি স্বয়ং স্বামীজিকে বলিতে শুনিয়াছি, "তোমার নাম, জাতি, ঠিকানা সব এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়ে যাও।" এও একটা রহস্য। স্বামীজি হঠাৎ সকলের কাছে নিজকে ধরা দিতে চাহিতেন না বলিয়াই সম্ভবতঃ এই রকমের বিভিন্ন আচরণ হইত। যে দুই এক জনকে এইরূপ কথা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি তাঁহারা দীক্ষা পাইয়াছিলেন কিনা *ইহা অনুসন্ধান করি নাই। যাঁহারা কৃপা পাইবেন না তাঁহাদের নিকট তাঁহার* আত্মগোপন করা বিচিত্র নয়। একদিন সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক ভট্টাচার্য গুরু গ্রহণ জন্য উৎসুক হইয়া স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যাহাদের

কুলগুরু নাই, তাহাদের কুলমন্ত্র উদ্ধারের উপায় কি? তদুত্তরে স্বামীজি বলেন, "ও-সব আমি কিছু জানি না, বাপু।" অথচ কত কত জনের কুলমন্ত্র ত তিনি নিজ হইতে বলিয়া দিতেন। স্বামীজির কথায় হউক বা অন্য কারণেই হউক শশাঙ্কবাবু তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই; পরে তিনি অন্য গুরু গ্রহণ করেন। আর একবার আমার এক অতি ঘনিষ্ঠ (ব্রাহ্ম) বন্ধু তাঁহাকে এই মর্মে প্রশ্ন করেন—"মানুষ বিপদে পড়িয়া যখন বড় কাতর হয় তখন তাহার সে কাতরতা ঈশ্বরকে স্পর্শ করে কিনা?" তদুত্তরে স্বামীজি বলেন, "কি করে বলব বাপু? আমি কি ঈশ্বরের কাছে গিয়েছি?" লোকোত্তর মানুষগণের সব ভাব কে বুঝিতে পারে?

সে যাহা হউক, স্বামীজি কাশীতে কয়েকদিন মাত্র থাকিয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আমি ১৪ই ভাদ্র তারিখে পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। এই দিন দীক্ষার প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, দীক্ষা কাশীতেই হইবে। একখানি দিনপঞ্জিকা তাঁহার হাতের কাছেই ছিল. তাহা দেখিয়া বলিলেন, সপ্তমী ও নবমী পূজার দিন দীক্ষার দিন আছে। পঞ্জিকা আমার পূর্বেই দেখা ছিল; আমি বলিলাম, মহাষ্টমীর দিনও মনে হয় দীক্ষার পক্ষে শুভ।

স্বামীজি। ওটা মঙ্গলবার। মঙ্গলবারে আমাদের দীক্ষা হয় না।

কলিকাতায় না হইয়া কাশীতে দীক্ষা আমি অসুবিধাজনক মনে করি নাই বরং তাহাতে খুসীই হইয়াছিলাম। কেননা কাশীতে গোপীনাথ কাছে থাকিবেন, তাহা হইতে অনেক সাহায্য ও প্রয়োজনানুরূপ উপদেশ পাইতে পারিব এই ভরসা ছিল। গোপীনাথও কয়েকদিন পরে আর এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "কাশী জ্ঞানের ক্ষেত্র, এখানে জ্ঞানময় গুরু হইতে কৃপালাভ সৌভাগ্যের কথা।"

আমি স্বামীজিকে বলিলাম, বাবা, বয়স ত অনেকটাই হইয়াছে; তবু এ পর্যন্ত ভগবানকে আশ্রয় করার জন্য মনে তেমন একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করিলাম না। সুতরাং অধিকারের দিক দিয়া বিচার করিলে আমি একজন নিকৃষ্ট অধিকারী। আমার কিছু হবে কি?

স্বামীজি। ঈশ্বরকে ডাকিবার জন্য সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈশ্বর সকলেরই। চেষ্টা করিলে—কর্ম করিলে সকলেই লাভবান হইতে পারে। চিত্তের উপর সঞ্চিত মল যোগ দ্বারা দূর হয়। উহা চেষ্টাসাধ্য।

আমি। চেষ্টা দ্বারা যে অনেক কিছু হয় ইহা সকল দেশের শাস্ত্রেই বলে তথাপি—

স্বামীজি। তথাপি আবার কি? "তথাপি মমতাবর্তে—"

আমি। বেশ ত, তাই বলি—"তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।" আমরা যে মোহগর্তে পড়িয়া আছি। কৃপা ছাড়া আমাদের ভরসা কি?

স্বামীজি। কৃপা চেষ্টানুরূপ হইবে।

আমি। অধ্যাত্মজীবনের কথা জানি না, কেননা কোন অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু লৌকিক জীবনে দেখিতে পাই চেষ্টার মূল্য অধিক নয়। নিজের জীবনে দেখিয়াছি যেটা কাম্য বলিয়া পাইবার জন্য খুব আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা করিয়াছি সেটা অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় নাই। পরে বুঝিয়াছি ভগবান কৃপা করিয়াই তাহা দেন নাই। আবার যাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি নাই, অক্লেশে পাইয়াছি। "ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া" যে একজন আছেন, তিনিই যাকে দিয়া যাহা করাইবার তাহাই করান; তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হয় না, এই আমার ধারণা। উপনিষদেও আছে, "যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—তিনি বরণ করিলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

স্বামীজি আমার বিজ্ঞতায় কোনও রূপে অসহিষ্ণুতার ভাব না দেখাইয়া সব শুনিলেন এবং তদুত্তরে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এইরূপ—পূর্বজন্মের কর্মদ্বারা ইহজন্মের কার্য কতকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্বজন্মের কর্মও নিজেরই কর্ম ত! কর্ম ভিন্ন ফল নাই। যে যেমন কর্ম করিবে সে তেমন ফল পাইবে। সেইজন্য বলা হয় "কর্মভ্যো নমঃ"।

এই সময়ে বেলা পড়িয়া গিয়াছিল; কে একজন আসিয়া সংবাদ দিলেন—গাড়ী আসিয়াছে। স্বামীজি আর কাহারও সহিত আলোচনার জন্য কালক্ষেপ না করিয়া স্বীয় অভ্যাসমত একটি মোটর গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। উপস্থিত শিষ্যগণের মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন, "আপনার মত সৌভাগ্য কার? "দীক্ষা" চাহিবামাত্র পাইলেন। এক-একজনকে কতকাল অপেক্ষা করিতে হয়।" পরে পরিচয় জানিয়াছি ইনি প্রিয়নাথ দে, এম. এ., বি. এল্. পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—আলিপুরে ফৌজদারী কোর্টে সরকারপক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেন। ঐদিন আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হয়।

তীব্র আকুতির অভাবেও শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরুর কৃপায়—হ্যাঁ কৃপাই জোর করিয়া বলিব—সদ্‌গুরু লাভের পথে দাঁড়াইলাম। মনের দ্বিধা কাটিয়া গেল। কেবল আশঙ্কা রহিল সমুচিত "কর্ম" করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি হইবে কিনা।

২৮শে ভাদ্র পুনরায় শ্রীচরণদর্শন করিতে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন বাল্যবন্ধু (টাউন স্কুলের শিক্ষক) শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র। কলিকাতায় স্বামীজির সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনও ইনি সঙ্গে ছিলেন। শুনিলাম স্বামীজি ১০ই আশ্বিন কাশী রওনা হইবেন। আমাদের আফিসের পূজার ছুটিও ঐ তারিখ হইতে; বলিলাম—হয়ত ঐ তারিখে আমারও কাশী যাওয়া হইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা সকল শাস্ত্রেই বলে, ধর্মজীবনের আরম্ভ হয় শ্রদ্ধা হইতে। শ্রদ্ধা, আস্তিক্যবুদ্ধি বা বিশ্বাসের উপরেই আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিত্তি

স্থাপিত হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও দেখিয়াছি, "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া"—ইত্যাদি।

স্বামীজি মুখের ভাবে অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন।

আমি। আমাদের ত ঐখানেই অভাব। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা কিসে হয়?

স্বামীজি। কর্ম করিতে করিতে জ্ঞান হয়, বিচারবুদ্ধি খুলিয়া যায়, সত্য-দর্শন হয়। দর্শন হইলেই বিশ্বাস হয়।

আমি। অনেকের মুখেই শুনিতে পাই—শাস্ত্র পড়া ভাল। যেমন গীতাদি প্রত্যহ পড়িবার জন্য অনেকে উপদেশ দেন।

স্বামীজি। বই পড়ে যে জ্ঞান হয় সেটা শুষ্ক জ্ঞান। যদি শাস্ত্র পড়া থেকে জ্ঞান হ'ত তা'হ'লে বড় বড় পণ্ডিতেরা সকলেই সিদ্ধপুরুষ হয়ে যেত। নানা শাস্ত্র পড়লে বরং মাথা ঘুলিয়ে যায়। নানা মুনির নানা মত, নিজে কাজ করলে বুঝা যায় কোন্‌টা কতখানি ঠিক।

আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ, বহু গ্রন্থ পড়া শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ। উপনিষদে আছে "বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ"—উহা বাক্যের গ্লানিকর।

অম্বিকা। কাজ করিবার প্রবৃত্তিটাই যে সহজে হইতে চায় না।

স্বামীজি। করিতে করিতেই প্রবৃত্তি হয়। লোকে বলে কলিতে যোগ নাই। কেন থাকিবে না? বরঞ্চ বেশী আছে। গৃহী গুরুরা লোককে যোগ দেয় না তাই লোকে যোগের পথ ঠিক ধরিতে পারে না।

যোগের কথায় স্বামীজি আরও বলিলেন, "যোগে চিত্ত নির্মল হয়। মনের উপর অনেক ময়লা জমিয়া আছে কিনা, তাই কিছু হইতেছে না। যোগে সেই ময়লা দূর করিয়া দিতে পারে।"

এই সময়ে কয়েকটি কারণে মনে একটু সন্দেহের উদয় হইয়াছিল—আমার অস্থায়ী নূতন পদে পূজার ছুটীতে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি পাইব কিনা। সে কথা স্বামীজিকে কিছু বলি নাই। কয়েকদিন পরে কাশী হইতে গোপীনাথের এক যুবক আত্মীয় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিও স্বামীজির শিষ্য। আমার দীক্ষা হইবে একথা তিনি কাশীতে শুনিয়া আসিয়াছিলেন। এখন শুনিলেন, আমার দীক্ষার দিন স্থির হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ছুটী পাইব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি বলিলেন, "বাবা যখন দিন ঠিক করিয়া দিয়াছেন তখন আমি বলিতেছি আপনি ছুটী পাইয়া রহিয়াছেন। আপনি দেখিবেন, এ অবশ্য হইবে।"

ইঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ফলতঃ হইলও তাহাই। কলিকাতার বাহিরে যাইবার অনুমতি পাইতে আমার কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না।

৯ই আশ্বিন সকালের দিকে আবার আশ্রমে গেলাম। ভাবিলাম এ সময়ে সম্ভবতঃ দেখা হইবে না। অন্ততঃ শুনিয়া আসিব পর দিন স্বামীজির কাশী যাওয়া ঠিক কি না। সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হইল।

স্বামীজি। গোপীনাথকে চিঠি লিখে দিয়েছ ত?

আমি। আজ্ঞে না; আজ দিব।

একটি ব্রাহ্মণ আসিলেন। পরে শুনিয়াছি, ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্টাচার্য, স্বামীজিরই শিষ্য। স্বামীজির সঙ্গে কথায় কথায় ইনি কি একটা সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন, তাহাতে "আনন্দ" শব্দ ছিল।

স্বামীজি। আনন্দও চারি প্রকার আছে, সব আনন্দই ব্রহ্মানন্দ নয়।

আমি। বাবা, আনন্দমাত্রই ভগবানের স্বরূপ হইতে আসে এইরূপ একটা মত শাস্ত্রে আছে জানি।

স্বামীজি। তা' কি করে হবে আমাকে বুঝিয়ে দেও। আমি তোমার গলা কেটে আনন্দ পাই—এটাও কি ব্রহ্মানন্দ?

আমি। সব আনন্দই ব্রহ্মানন্দের অংশ এইরূপ একটা মত আছে।

স্বামীজি। আনন্দ অনেকপ্রকার, নির্মাণও অনেকপ্রকার। এসব পরে বুঝিয়ে দেব।

আনন্দ সম্বন্ধে আর কোনও কথা হইল না। স্বামীজির মন্তব্য আমার ধারণার বিপরীত ছিল না। আমরা যে আনন্দের সঙ্গে পরিচিত, সেটা চিত্তবৃত্তিমাত্র। ব্রহ্মানন্দ তাহা হইতে পৃথক বস্তু; চিত্তরোধ করিলে সেটির আস্বাদন পাওয়া যায়। আমার প্রথম উক্তির মর্ম অন্যরূপ। তাহা আর আমি স্বামীজির নিকট বিশ্লেষণ করিবার ধৃষ্টতা দেখাইলাম না। নির্মাণসম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইল। ত্রিগুণেরই প্রকাশভেদে নির্মাণের বিচিত্রতা হয়, এই কথা আমি বলিয়াছিলাম। স্বামীজি বলিলেন, একই উপাদান হইতে কিরূপে এত ভেদ হয় তা প্রত্যক্ষ দেখবে।

শুনিয়া আসিলাম ১০ই আশ্বিনই স্বামীজির কাশীযাত্রা ঠিক। বেনারস এক্সপ্রেস ট্রেনে কয়েকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছে। বহু শিষ্য সঙ্গে যাইবেন।

চার

ইখানে সংক্ষেপে স্বামীজির জীবনকথা কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

সন ১২৬২ সালের ২৯শে ফাল্গুন (খ্রীঃ ১৮৫৬, ১১ই মার্চ) তারিখে স্বামীজি ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ভোলানাথ; পিতার নাম অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবী। জন্মস্থান বণ্ডুল গ্রাম; পোঃ

তাওয়ারডিহি, থানা মন্তেশ্বর, জিলা বর্ধমান। বর্ধমান শহর হইতে বণ্ডুলের দূরত্ব আনুমানিক ১৪ মাইল; শেষ আট মাইলে অদ্যাপি কোনও বাঁধা রাস্তা নাই; মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। বর্ষায় পথ গরুর গাড়ীর পক্ষেও দুর্গম; মোটর গাড়ী, লরী ইত্যাদির তো কথাই নাই। গ্রামটি ক্ষুদ্র, কিন্তু অবস্থানটি সুন্দর। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র বৎসরের অধিক ভাগ গ্রামকে একটি স্বাভাবিক লক্ষ্মীশ্রী দান করে। গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির। গ্রামের বাহিরে উত্তরদিকে অনতিদূরে একটি বটগাছ ও তাহার নিকটে শ্মশান। এই মন্দির ও শ্মশান-সন্নিহিত বটতলা বাল্যে স্বামীজির অতি প্রিয় লীলাভূমি ছিল।

স্বামীজির জন্মের ছয়মাস পরেই তাঁহার পিতা স্বর্গলাভ করেন। একবার কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমা'দগকে বলিয়াছিলেন—ঐ সময়ে অর্থাৎ আমাদিগের সহিত আলাপের সময়ে তাঁহার পিতা তপোলোকে আছেন। পিতার আকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও স্মৃতি ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়েরও থাকিবার কথা নয়, কেননা তিনি স্বামীজি হইতে মাত্র আড়াই বৎসরের বড় ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। সে যাহা হউক, স্বামীজি যোগসাধনে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিবার পর ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অত্যধিক নির্বন্ধে তিনি তাঁহাকে শবোপরি উপবিষ্ট পিতার সজীব মূর্তি দেখাইয়াছিলেন। একথাও স্বামীজির মুখে শুনিয়াছি যে, ঐরূপ দর্শনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বেশীদিন বাঁচিবেন না—ইহা তিনি জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে পিতার সজীব মূর্তি দর্শন করাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার পুনঃ পুনঃ নির্বন্ধাতিশয়ে না দেখাইয়া পারেন নাই। ফল যাহা অনিবার্য ছিল, তাহাই হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা (যিনি তাঁহার একমাত্র সহোদর ছিলেন) অল্পকাল পরেই পরলোকে গমন করিলেন।* স্বামীজির দেহরক্ষার কিছুকালপূর্বে প্রাণাচার্য কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী কিছুদিন তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন স্বামীজি যেন একদিন তাঁহার (কবিরাজ-মহাশয়ের) পিতার সজীব মূর্তি তাঁহাকে

* শ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের এক শিষ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার ঐকান্তিক নির্ব[ন্ধে] গিরিজী তাঁহাকে ও তাঁহার পরলোকগতা পত্নীকে একসঙ্গে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি পত্নীকে নিজের পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্টা দেখিয়াছিলেন। কলিকাতার অ্যাডিশন্যাল প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রে[ট] অধুনা পরলোকগত খাঁ বাহাদুর আবদুল গফার স্বীয় গুরুর জীবনচরিতে (A short Biography of M[y] Huzur; published by G. Mohiuddin. 22, Gardner Lane, Calcutta) লিখিয়াছেন যে, তি[নি] অর্থাৎ খাঁ বাহাদুরের গুরু মেদিনীপুর মজর শরিফের হজরত সৈয়দ শা মুর্শেদ আলি অল্ কাদেরী (খ্রী[ঃ] ১৮৫২-১৯০১) তাঁহার এক শিষ্যের ইংরেজজাতীয়া পত্নীকে তাঁহার মৃত দুইটি অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়[কে] দেখাইয়াছিলেন এবং ঐ মহিলাটি তাহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তাও বলিয়াছিলেন। এই পীর সাহে[ব] সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এরূপ শক্তিশালী পীর বর্তমানকালে বোধ করি অল্পই আছেন। ইঁহার পু[ত্র] সৈয়দ শা ইরশাদ আলি অল্ কাদেরীও একজন বহুজনমান্য সাধুপুরুষ। তিনি নিজগুণে এই গ্র[ন্থ]কারকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন। তিনি সাধারণতঃ কলিকাতা তালতলা খানকা শরিফে থাকেন

দেখান। স্বামীজি আরোগ্যলাভ করিলে উহা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকারও করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আর আরোগ্যলাভ করেন নাই।

স্বামীজির মাতা বহুকাল (সন ১৩২৫ সাল) পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন। স্বামীজির মাতৃভক্তি অতি অসাধারণ ছিল। আমি কলিকাতা ও কাশী উভয়ত্র দেখিয়াছি, তিনি প্রত্যহ প্রাতে বসিবার প্রকোষ্ঠে আসিয়াই তথায় দেয়ালে লম্বিত মাতার এক তৈলচিত্রকে প্রণাম করিতেন এবং সন্ধ্যায়ও ঐ প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিবার সময় তাহাই করিতেন। তাঁহার কথায় অনেক সময়েই মাতার প্রতি ভক্তি ও মাতার আজ্ঞানুবর্তিতার প্রমাণ পাওয়া যাইত। স্বামীজির মর্তজীবনের শেষ একটি কার্যও পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া মাতার ছবিকে হাত তুলিয়া প্রণাম। পরমহংসের পৈত্র কর্ম কিছু না থাকিলেও স্বামীজি প্রতি বৎসর মাতার মৃত্যুদিন ২২শে পৌষ তারিখে বহু কুমারী ভোজন করাইতেন। পিতা বা অন্য কাহারও সম্বন্ধে তাঁহাকে উহা করিতে দেখি নাই।

স্বামীজির বাল্যকালে তাঁহার খুল্লতাত (পিতার সহোদর নয়, কিন্তু একান্নবর্তী) চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে সস্নেহে লালন-পালন করিয়াছিলেন। স্বামীজির বাল্যকালে এই পরিবারটি ছিল নিতান্তই মধ্যবিত্ত পরিবার। সংসারে আয়ের প্রধানপথ ছিল ৩০ কি ৩২ বিঘা জমিতে উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য। তদুপরি তাঁহার খুল্লতাত কলিকাতায় চাকুরী করিয়া নগদ কিছু উপার্জন করিতেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্ধমানে কম্পাউণ্ডারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী করিয়াও কিছু উপার্জন করিতেন। এইভাবে সংসার চলিত ; অভাব-অনটন বিশেষ ছিল না। সে যাহা হউক, স্বামীজি স্নেহবান খুল্লতাতের প্রতি চিরদিন মনে অসীম কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতেন। তদীয় পুত্র ৺ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভগিনীদিগের প্রতি তিনি চিরকাল বিপুল স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইন্দ্রকাকা এফ. এ. পরীক্ষায় (First Arts বর্তমান কালের I. A.) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁহার ভগিনীগণও বিধবা হইয়া সন্তানাদিসহ এই বাড়ীতেই থাকিতেন এবং এখনও আছেন। সংসারের কর্তৃত্ব ইঁহারাই (বিশেষতঃ ইন্দ্রকাকার ভগিনী কাশীশ্বরী দেবী) করিতেন। ইন্দ্রকাকা স্বল্পায়ু ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শিবপদ চট্টোপাধ্যায়কে স্বামীজি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন ; এবং তাঁহার কোনও অভাব বা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিতেন না। শিবপদ দাদাকে তিনি বি. এ. ও বি. এল্. পর্যন্ত পাশ করাইয়া ওকালতী ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি ভগিনীকেও তিনি সৎপাত্রসাৎ করিয়া গিয়াছেন। একটি জামাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় কালক্রমে স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

স্বামীজির জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন একথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার একমাত্র কন্যা (শ্রীযুক্তা ত্রিগুণা-দেবী) মধ্যে মধ্যে বগুলে আসিতেন ও থাকিতেন ; শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা ভাল

বলিয়া তিনি এখানে বেশী থাকিতেন না। স্বামীজি তাঁহাকেও যথেষ্ট স্নে
করিতেন।

বস্তুতঃ গার্হস্থ্যজীবনেও স্বামীজির তুল্য স্নেহবান ও কর্তব্যবোধ-সম্পন্ন লো
অধিক দেখা যায় না। বাল্যেই স্বামীজির কতকগুলি অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রকা
পাইয়াছিল। সেসকল কথা এখন থাক।* তাঁহার শিক্ষা বাংলা বিদ্যাল
হইয়াছিল। পরে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি আমাকে একদি
বলিয়াছিলেন, "পাণিনি ব্যাকরণ কতদূর পড়িয়াছিলাম"; অন্য একদিন বলিয়াছিলে
"সংস্কৃত কথাবার্তা বেশ বুঝিতে পারিতাম।" রঘুবংশের দুই একটি শ্লোক
শ্লোকাংশ তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছি। অবশ্য সংস্কৃত অপেক্ষা বাংলা ভাষা
তাঁহার অধিকার অধিক ছিল। অল্পবয়সে তিনি বাংলায় কবিতা ও গান রচন
করিতে পারিতেন। তাঁহার ঐরূপ প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার স্নেহবান খুল্লতা
ও অন্য সকলেরই ইচ্ছা ছিল তিনি ইংরেজি পড়েন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাঁহা
ইংরেজি কেতাব ধরাইতে পারা যায় নাই।

বার বৎসর বয়সে একটা ক্ষেপা কুকুর তাঁহাকে কামড়ায়। দৃশ্যতঃ এ
দুর্ঘটনাটিই পরিণামে তাঁহার সকল গৌরবের মূল হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষেপা কুকু
অনেককেই কামড়ায়—এই অধম গ্রন্থকারকেও কামড়াইয়াছিল। কেহ কেহ মর
বাঁচে অনেকেই, সেকালে নানাস্থানে দুই একজন চিকিৎসক ও দেশজ নানারক
ঔষধ পাওয়া যাইত, এবং সেইরূপ চিকিৎসাই সকলে করাইত। ইদানী
পাশ্চাত্যমতে ইহার সুচিকিৎসা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, কুকু
দংশনের পরে দষ্টস্থানে অনেকদিনব্যাপী সুতীব্র জ্বালা-যন্ত্রণার কথা বড় একা
শুনা যায় না। ভোলানাথের ভাবী কল্যাণের জন্যই ঐ অসাধারণ উপসর্গটি
আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি জ্বালায় অস্থির হইয়া স্বজনসঙ্গে চন্দননগ
গোঁদলপাড়ায় চিকিৎসার্থ আগমন করেন। কুকুর ও শৃগালের দংশনের জন্য
স্থানের চিকিৎসা অদ্যাপি সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐ চিকিৎসায়ও তাঁহার জ্বালার অবসা
হইল না। ঐ স্থান হইতে তিনি ভাগীরথীর অপর তীরে হুগলীতে এক আত্মী
গৃহে আসেন। এখানে আসিয়া এই দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালকের খেয়াল হইল-
আত্মহত্যা করিয়া ঐ অসহ্য জ্বালার হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। যে রো
জলাতঙ্কের আশঙ্কা প্রবল, সেই রোগের শান্তির কামনায় তিনি ভাগীরথীর জ
এক সন্ধ্যায় ডুবিয়া মরিতে গেলেন!

কিন্তু ডোবা হইল না। জলে নামিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, মধ্য-গঙ্গায় এ
শিবমূর্তি সাধু পুনঃ পুনঃ ডুব দিতেছেন এবং উন্মজ্জনকালে গঙ্গার জল গুম্ভাকা
তাঁহার দেহের সহিত উপরে উঠিতেছে। পূব হইতে একটা যোগাযোগ অবশ্যই ছিল

* দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট (২) শ্রীগুরুলীলাস্তোত্র।

কন্তু ভোলানাথের মনে হইল যেন সাধুর দৃষ্টি হঠাৎ তাঁহার উপর পড়িল। সাধু াত তুলিয়া ভোলানাথকে জলে নামিতে নিষেধ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বং তীরে উঠিয়া ভোলানাথের সঙ্কল্প ও তাহার কারণ তাঁহার মুখে অবগত হইয়া লিলেন, "ও কিছু নয়, আমি এখনই তোমার সকল জ্বালার অবসান করিয়া দতেছি।" করিলেনও তাহাই ; ভোলানাথ হৃষ্টচিত্তে বাসায় ফিরিলেন।

কিন্তু বাসায় ফিরিয়া তাঁহার অন্যরকম বুদ্ধি জাগিল। বালকটি ছিলেন তান্তই অসাধারণ রকমের ; ঐ বয়সেই অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গান রচনা রিয়াছিলেন। বহুকাল পরে সেগুলির কয়েকটি গোপীনাথ পাইয়া পুস্তকাকারে দ্রিত করিয়াছেন। তাহারও কয়েক বৎসর পরে আমি আরও কয়েকটি গান ামীজি হইতে পাইয়াছি। সবই ধর্মবিষয়ক বা আধ্যাত্মিক ভাবের গান। এই াল্যদুর্লভ পরিপক্কতার দরুনই ভোলানাথ বুঝিয়াছিলেন যে, যিনি এত সহজে ত কষ্টদায়ক ব্যাধির উপশম করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার কাছে উচ্চতর অনেক স্তুই চাহিবার ও পাইবার আছে। এই বুদ্ধি হইতে পরদিন তিনি পুনরায় সেই যাগীর সন্ধানে গঙ্গাতীরে আসিলেন এবং আসিয়াই দেখা পাইলেন। এইসব ্যাপার যে পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট এবং সন্ন্যাসীরও বিভাবিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। বার ভোলানাথ গঙ্গাতীরে আসিয়া দেখেন সন্ন্যাসী সৈকতে বসিয়া সন্ধ্যা রিতেছেন। তিনি যখন গঙ্গাস্পর্শ করিবার জন্য হাত নামান তখন গঙ্গাজল ীয় তল (level) হইতে কিছুটা উঠিয়া তাঁহার হস্ত স্পর্শ করে, আবার তনি হাত তুলিলে নীচে নামিয়া যায়। ভোলানাথ অবাক হইয়া এই ্যাপার দেখিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সন্ন্যাসীর সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত হইলে ক্তিবিহ্বল ভাবে অগ্রসর হইয়া প্রণামপূর্বক বলিলেন, "আপনি আমাকে ীবন দিয়াছেন, এখন আমার একটা গতি করুন।" সন্নাসী বালককে অধীর ইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "সময়ে সব হইবে, সদ্‌গুরু মিলিয়া যাইবে ; এখন ইতে কিছুদিন (একটি আসন দেখাইয়া) এইভাবে বসিয়া (একটি বীজ বলিয়া য়া) এই বীজটি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় জপ করিবে।" এই বলিয়া তিনি রমস্নেহসহকারে বালকের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন বং নিজেও অন্য একদিকে চলিয়া গেলেন।

দুই বৎসর পরে—এই সময়ে ভোলানাথ বর্ধমান শহরে অবস্থিত করিয়া সংস্কৃত ড়িতেছিলেন—একদিন তিনি রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে লক্ষ্য করিলেন— কটি ভদ্রশ্রেণীর মুসলমান গল্পের মত কিছু বলিতেছেন এবং আর কতকটি লোক ্বভাবে তাঁহার কথা শুনিতেছে। কৌতুহলবশে ভোলানাথ তথায় দাঁড়াইলেন বং শুনিতে পাইলেন ঢাকায় একটি সাধু আসিয়াছেন যাঁহার বুড়ীগঙ্গায় ডুব দিয়া ঠিবার কালে দেখা যায় নদীর জল তাঁহার শরীর ঘিরিয়া শুম্ভাকারে উঠিতেছে বং যিনি পারে বসিয়া জলস্পর্শ করিতে গেলে জল আপনা হইতে কতটুকু উঠিয়া

তাঁহার হস্ত স্পর্শ করে। এই বিবরণ শুনিয়াই ভোলানাথ বুঝিলেন, সাধুটি তাঁহা পূর্বদৃষ্ট মহাপুরুষ। তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার জন্ত ইতঃপূর্বে ভোলানাথের মনে প্রবল ব্যগ্রতার উদয় হইয়াছিল। এখন উক্ত মুসলমা ভদ্রলোকটির মুখে তাঁহার একটা ঠিকানা পাইয়া তাঁহার নিকট যাইবার জ দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। তিনি মুসলমান ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিয়া জানিলে —তাঁহার নিবাস ঢাকায় এবং তিনি কয়েকদিন পরে তথায় ফিরিয়া যাইবেন ভোলানাথের সাধুর নিকট যাইবার প্রবল আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সঙ্গে নি যাইতে সম্মত হইলেন। ইহাতে ভোলানাথের আনন্দের অবধি রহিল না ; কি তিনি মাতার আদেশ না লইয়া কোনও কার্য করিতেন না বলিয়া সেই আদে লাভ করিবার জন্ত অবিলম্বে বণ্ডুলে চলিয়া গেলেন।

ভোলানাথের মাতা সব কথা শুনিয়া বাড়ীর অন্ত সকলের মত জিজ্ঞসা করিলেন কেহই মত দিলেন না। কিন্তু ভবিতব্য দুর্নিবার। ভোলানাথের মাতা বলিলে "কোষ্ঠীতে উঠিয়াছে ভুরির (মাতা ভোলানাথকে 'ভুরি' বলিতেন) পরমায়ু মা বাইশ বৎসর। যদি ঐ রকম শক্তিমান মহাপুরুষের চেলা হইলে পরমায়ু বাড়ে তাতে লাভ বই ক্ষতি কি ? অদৃষ্টে যা' আছে তা' হবেই ; ও যখন যাওয়ার জন এত জিদ করিতেছে তখন যাওয়াই আমি ভাল মনে করি।" অনেক তর্ক-বিতর্কে পর মায়ের মতই প্রবল রহিল। ভোলানাথ জননীর পদধুলি লইয়া ঢাকা যাইবার জন্ত বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া আসিলেন।

ভোলানাথ বর্ধমানে ফিরিয়া আসিলে হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক আর এক বালক তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। উত্তরকালে ইঁহা সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা স্বামীজির মুখে শুনিয়াছি। ইঁহার নিবাস বর্ধমা জেলাতেই কোথাও ছিল বলিয়া আমার ও আমার অনেক গুরুভাইয়ের ধারণা ঠিক কোথায় তাহা আমি বোধ করি শুনি নাই, বা শুনিলেও মনে নাই। হরিপ বয়সে ভোলানাথ হইতে দুই-তিন বৎসরের বড় ছিলেন। দুই বন্ধুতে যথাসম পূর্বোক্ত মুসলমান ভদ্রলোকটির সৌজন্তে তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় যাত্রা করিলেন ভদ্রলোকটি ছিলেন ঢাকার নবাব-পরিবারের জামাতা। ঢাকায় পৌঁছিয়া তি উভয় বালককে প্রথমে নবাব-বাড়ীতেই নিয়া যান এবং নিকটস্থ একটি ময়রা দোকানে তাঁহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিতেও উদ্যত হন। কিন্তু বালক প্রথমে সাধু-দর্শনের জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হওয়ায়, সে ব্যবস্থা স্থগিত করিয়া তাঁহাদিগ রমনায় সাধুর নিকট পৌঁছাইয়া দেন। তাঁহারা ভদ্রলোকটির নির্বন্ধ সত্ত্বেও আ নবাববাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

রমনা এখন পুরাতন ঢাকা শহরের সংলগ্ন একটি নূতন ও নানা সুব্যবস্থা-সম শহর। সেকালে ঐ বিস্তীর্ণ পল্লী নিবিড় জঙ্গলে আবৃত ছিল ; মধ্যে মধ্যে একটি ধনী লোকের উদ্যান-বাটিকা এবং তদ্ব্যতীত কয়েকটি হিন্দু দেবস্থান ছি

যথায় দূরদূরান্তর হইতে সাধুগণ সময় সময় আসিতেন। স্বামীজি আমার নিকট তদানীন্তন রমনার যে বর্ণনা দিয়াছেন সে অবস্থা কৈশোরে আমিও কতকটা দেখিয়াছি। ভোলানাথ ও হরিপদ সাধুটিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি ঝিলের ধারে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত স্থলে যোগাসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন। ঐ ঝিলের কিয়দংশ এখনও উত্তরকালে নির্মিত লাটভবনের (যাহাতে এখন পূর্ব-পাকিস্তানের* হাইকোর্ট বসিয়াছে) বেষ্টনের মধ্যে দেখা যায়।

সন্ন্যাসিপ্রবর ভোলানাথকে দেখিয়া প্রীত হইলেন, কিন্তু মুখে বলিলেন, "কেন এসেছ, আবার ওকে (হরিপদকে) সঙ্গে করে কেন নিয়ে এসেছ ?"

ভোলানাথ। আমি ওকে আনি নাই, ও নিজের আগ্রহে এসেছে।

সন্ন্যাসী উভয়কে গৃহে ফিরিতে কিছুক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিলেন—সেটা বোধ করি উভয়ের আগ্রহ পরীক্ষার্থ ; কিন্তু উঁহারা কেহই তাহাতে সম্মত হইলেন না। সন্ন্যাসীর পরবর্তী আচরণে মনে হয় যেন তিনি ইহাদের জন্যই ঢাকাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কেননা আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই দিনই তিনি সেই স্থান ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন এবং একটু গভীর রাত্রিতে নিজের দুই হাতে দুই বালকের বাহু ধরিয়া বনপথে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি তাহাদের চক্ষু কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেন এবং ভয় পাইতে ও কোন প্রশ্ন করিতে নিষেধ করেন। বালকদ্বয়ের ধারণা তাঁহারা সমস্ত রাত্রিই হাঁটিয়াছিলেন। পথে ব্যাঘ্রের গর্জন ও শৃগালের রবও শুনিয়াছিলেন। প্রাতে সন্ন্যাসী তাঁহাদের চক্ষুর কাপড় খুলিয়া দিলে তাঁহারা দেখিলেন তাঁহারা এক পাহাড় অঞ্চলে আসিয়াছেন ; স্থানটি বিজন। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে কোনও ভয় না করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং অন্যত্র চলিয়া গেলেন। একটু বেলা হইলে পথিকদিগের নিকট অনুসন্ধানে তাঁহারা জানিলেন যে, তাঁহারা যেখানে আসিয়াছেন, সে স্থানের নাম বিন্ধ্যাচল ; গ্রাম অদূরেই. এই স্থানে তাঁহাদের অবস্থানের বিবরণ পাঠক পরে স্বামীজির নিজ মুখের কথায়ই পাইবেন।

ইহার পরে উক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহারা বিন্ধ্যাচল হইতে কিছুদূরে এক আশ্রমে এবং ক্রমে পূর্বোক্ত প্রকারে হিমালয় অতিক্রম করিয়া পশ্চিম তিব্বতে এক অতি প্রশস্ত ও মনোরম মালক্ষেত্রের মধ্যস্থ জ্ঞানগঞ্জ-নামক এক বহু ব্রহ্মচারী-দণ্ডী-সন্ন্যাসী-পরমহংসাধ্যুষিত আশ্রমে গমন করেন।

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই গ্রন্থের সম্বন্ধ অতি অল্প বলিয়া আপাততঃ তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। আপাততঃ বলিবার যোগ্য কিছু নাইও—অন্ততঃ আমার জানা নাই। তাঁহার বিষয়ে যাহা শুনিয়াছি তাহার কিছু কিছু পরে যথাস্থানে বলা যাইবে।

---

* বর্তমান বাংলা দেশ।—প্রকাশক।

ভোলানাথ জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমে পৌঁছিয়া তথায় কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ঐ কয়দিনে তথায় যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন, কত যোগী দিবারাত্রি নানা যন্ত্র লইয়া বিজ্ঞান আলোচনায় ব্যাপৃত। কত ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী কত কঠোর সাধনে লিপ্ত। কুমারীভোজনের আয়োজন হইলে কোথা হইতে সহস্র কুমারী আসিয়া সেবাগ্রহণ করেন। আশ্রমেও বহু কুমারী আছেন। এক এক জন পরমহংসের বয়স শুনিলেন চারিশত পাঁচশত বৎসর। পরমহংসতুল্য দশায় উন্নতা যোগিনীগণ সেখানে ভৈরবী-মাতা বলিয়া অভিহিতা হন। সেরূপ মাতৃগণও অনেক আছেন--তাঁহাদের বয়সও ঐরূপ শত-শত বৎসর। সবই অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব।

ভোলানাথ যাঁহার সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জ আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীনীমানন্দ পরমহংস; জন্ম-পরিচয়ে তিনি বাঙ্গালী, বয়স তখন ন্যূনাধিক পাঁচশত বৎসর বলিয়া প্রকাশ।

জ্ঞানগঞ্জ হইতে স্বামী নীমানন্দ ভোলানাথকে উত্তর-তিব্বতে মনোহর-তীর্থ নামক অতিদুর্গম অথচ অতিরমণীয় এক আশ্রমে নিয়া যান। এইটি হইতেছে তাঁহার ও জ্ঞানগঞ্জের অন্যান্য পরমহংসাদির গুরু ব্রহ্মর্ষি মহাতপার* আসন। ভোলানাথ দেখিলেন ব্রহ্মর্ষি মহাতপাঃ অতিবৃদ্ধ; তাঁহার বয়স শুনিলেন প্রায় তের শত বৎসর। তাঁহারও গুরুমাতা তখন দেহে বর্তমান। সকলে তাঁহাকে ক্ষেপাই মা বলিয়া অভিহিত করেন—বয়স মহাতপারও দ্বিগুণ; কিন্তু ভোলানাথ দেখিলেন ক্ষেপাই মাকে দেখিতে তেমন বৃদ্ধা দেখায় না—প্রায় তরুণীই মনে হয়। মনোহর-তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী—ভোলানাথের জননীর নাম। ইহাও মাতৃভক্ত ভোলানাথের প্রচুর বিস্ময়ের ও আনন্দের কারণ হইল।

স্বামী নীমানন্দ মনোহর-তীর্থে পৌঁছিয়াই ভোলানাথকে স্বীয় গুরুর পদপ্রান্তে উপনীত করিলেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত আলাপ হইতে ভোলানাথের মনে হইল—তাঁহার জ্ঞানগঞ্জ আগমনের বৃত্তান্ত পূর্ব হইতে ব্রহ্মর্ষি মহাতপার বিদিত ছিল, এমন কি সেদিন তাঁহার মনোহরতীর্থে আগমনও তাঁহারই অনুমতিক্রমে

---

* মহাতপাঃ স্বামী নীমানন্দের গুরুর প্রকৃত নাম নয়; তাঁহার প্রকৃত নাম কেহ জানিত না—অথবা জানিলেও বলিত না। সকলে সসম্ভ্রমে মহাতপাঃ এই নামেই তাঁহার উল্লেখ করিত। আমরাও স্বামীজির মুখে উঁহার অন্য নাম কখনও শুনি নাই। কিন্তু স্বামীজির দেহ-রক্ষার পর অলৌকিকভাবে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তা আমাদের একটি পরমার্থ-ভগিনী প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রহ্মর্ষি মহাতপার প্রকৃত নাম শ্রীশ্রীঅচলানন্দ পরমহংস। আবার একথাও তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন যে, অচলানন্দ প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃতদেহবদ্ধ (তন্ত্রোক্ত) সদাশিবতত্ত্ব। তাঁহার মতে ক্ষেপাই মা হইতেছেন সাদাখ্য তত্ত্বর (সদাশিব তত্ত্বের) উচ্চতর তত্ত্ব শক্তিরূপা আদি মা। এইসকল গুহ্য (esoteric) তত্ত্ব এ গ্রন্থে আলোচ্য নয়। আর উহা স্বামীজির দেহে থাকাকালে তাঁহার স্বমুখ হইতে শ্রুতও নয়। তবে ইহাও সত্য যে, তিনি যে কারণেই হউক গুহ্যতর তত্ত্বসকল প্রকাশ করিতে সর্বদাই অনিচ্ছুক ছিলেন।

হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীমহাতপাঃ কালক্ষেপ না করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা ভোলানাথের শিরঃস্পর্শ করিলেন এবং কর্ণে একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন।

দীক্ষার পর ব্রহ্মর্ষি মহাতপার এক শিষ্য পরমহংস শ্রীশ্রীভৃগুরামস্বামী ভোলানাথের যোগশিক্ষার এবং অপর এক শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ পরমহংস বিজ্ঞানশিক্ষার ভারগ্রহণ করেন। স্বামীজির মুখে তাঁহার গুরুর কথা অল্পই শুনা যাইত। তিনি পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীকে "দাদা গুরুদেব" বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবং তিনিও তাঁহাকে শিষ্যবৎ, এমন কি কনিষ্ঠ সহোদরবৎ, স্নেহ করিতেন। ভৃগুরাম স্বামীর বয়স চারিশত বৎসর বলিয়া স্বামীজি বলিতেন। জ্ঞানগঞ্জে ব্রহ্মর্ষি মহাতপার শিষ্য অন্যান্য পরমহংস অপেক্ষা বয়সে কিঞ্চিৎ কনীয়ান্ হইলেও ভৃগুরাম স্বামী শক্তিতে সকলের জ্যেষ্ঠ ও স্বীয় গুরুর প্রিয়তম ছিলেন, ইহাও বহুবার স্বামীজির মুখে শুনিয়াছি।

জ্ঞানগঞ্জের নিয়ম অনুসারে ভোলানাথকে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিতে হয়। তৎপর তিনি চারি বৎসর দণ্ডীর এবং চারি বৎসর সন্ন্যাসীর আচারে থাকেন এবং তৎপর 'তীর্থস্বামী'-পদে উন্নীত হন। এই সুদীর্ঘকালমধ্যে তিনি দণ্ডী ও পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) অবস্থায় দুই তিনবার মাত্র বণ্ডুলে আসিয়া জননীকে দর্শন দিয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্যাবস্থায়ই তিনি 'বিশুদ্ধানন্দ' নাম প্রাপ্ত হন।

তীর্থস্বামী-পদে উন্নীত হইবার পরে বিশুদ্ধানন্দের প্রতি তদীয় গুরুর আদেশ হয় তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থ হইতে হইবে। তিনি চৌদ্দ বৎসর তিন মাস বয়সে জ্ঞানগঞ্জে আগমন করেন। গৃহে ফিরিবার আদেশপ্রাপ্তির সময় তাঁহার বয়স অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর। এই সুদীর্ঘকাল যোগমার্গে বিচরণের আনন্দ তিনি এত বিশেষপ্রকারেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার এত অসামান্য শক্তি-সকলের বিকাশ হইয়াছিল যে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের আদেশ তিনি বিড়ম্বনা মনে করিলেন। তাঁহার ভয় হইল—ঐ আশ্রমের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তাঁহার সকল সিদ্ধি ঋদ্ধি বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। গুরুর আশ্রমে বাসের সুদীর্ঘকালমধ্যে তিনি গুরুর কোনও আদেশ ঈষন্মাত্রও লঙ্ঘন করেন নাই। এখন এই ভয়াবহ আদেশে তিনি বিচলিত হইলেন। তথাপি সাহস করিয়া গুরুর সমক্ষে স্বীয় অনিচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্নেহময় গুরু সর্বজ্ঞতাবলে তাঁহার মনোভাব সম্যক্রূপে অবগত হইয়া আশ্বাস দিলেন, গৃহস্থ হইলেও তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষতি কিছুই হইবে না, সাধন অব্যাহতভাবেই চলিবে এবং তাহার ফলে আরও উচ্চতর সিদ্ধিসকল যথাকালে তাঁহার আয়ত্ত হইবে। ইহার পরেও বিবেচ্য রহিল– এত বয়সে বিবাহ করিয়া তিনি কি প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিবেন? কেন না তৎকালপর্যন্ত লৌকিকশিক্ষা তাঁহার বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলেই চলে ; পৈত্রিক বিষয়-আশয়ও তেমন কিছু ছিল না। এ সম্বন্ধে আদেশ হইল, "ডাক্তারী করিও এবং যোগ-জ্যোতিষ দ্বারা লোকের কোষ্ঠিবিচারাদি করিয়া সমুচিত কবচাদি

দিও। ইহার আয়েই তোমার সাংসারিক সকল প্রয়োজন নির্বাহিত হইয়া যাইবে। তৎপর যখন যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সমুচিত আদেশ পাইবে।"

তীর্থস্বামী বিশুদ্ধানন্দ অগত্যা গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গৃহে ফিরিলেন। ইহাতে তাঁহার স্নেহময়ী জননী যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। তিনি অবিলম্বে পুত্রকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তীর্থস্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভূতনাথ বর্ধমানে কম্পাউণ্ডারী এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারীও করিতেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার বইগুলি নাড়াচড়া করিয়া, বস্তুতঃ স্বীয় যোগসিদ্ধিবলেই, ডাক্তারী বিদ্যা অল্পকাল মধ্যেই স্বামীজির প্রয়োজনানুরূপ আয়ত্ত হইয়া গেল। গৃহে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মাতৃদেবী ও খুল্লতাতের উৎসাহসমন্বিত চেষ্টায় দারপরিগ্রহ হইল। কন্যা একটু বয়স্থা দেখিয়াই আনা হইয়াছিল; নাম কৃষ্ণভামিনী দেবী; পিত্রালয় মন্তেশ্বর গ্রামে; পিতার নাম কালীচরণ সরকার। ইহার এক ভ্রাতা মহিমারঞ্জন সরকার উত্তর কালে স্বামীজির শিষ্য হইয়াছিলেন। ইহাকে আমি বহুবার দেখিয়াছি। স্বামীজির অতি পুরাতন শিষ্য শ্রীযুক্ত দক্ষিণাদাদার মুখে শুনিয়াছি শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস স্বামীজিকে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে আদেশ দিয়া তাঁহার ভাবী শ্বশুরালয় শ্বশুর ও পত্নীর নাম পর্যন্ত বলিয়া দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত বিবরণ পাইয়াছি তাহাতে তাঁহার তুল্য সুশীলা, কর্মঠা ও সর্ববিষয়ে আত্মবিলোপ-পরায়ণা মহিলা কদাচিৎ দেখা যায়। শ্বশ্রূমাতা, খুল্লশ্বশ্রূ, জ্যেষ্ঠা জা, দেবর (ইন্দ্রকাকা) বহু ননদ (ইন্দ্রকাকার সহোদরাগণ) ইত্যাদি সহ তাঁহাকে সংসার করিতে হইয়াছিল; শেষ পর্যন্ত কোনও দিন তিনি সকলের সেবিকা ভিন্ন অন্য অভিমান মনে আনেন নাই। স্বামীজির শিষ্য (সবজজ) হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রথমে স্বামীজির শিষ্য হন। স্বামীজি প্রথমে ইহাদের বাড়ীতে গেলে হরগোবিন্দ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহার প্রতি সাধারণ আগন্তুক ভদ্রলোকোচিত সৌজন্যমাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা খড়দহের গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন এবং যোগীর স্থান ভক্তের বহু নিম্নে বলিয়াই জানিতেন। ক্রমে তাঁহাদের মতির ও ভাবের পরিবর্তন হয় এবং বাটীস্থ যুবকবৃদ্ধ সকলে এবং মহিলাগণও সকলেই স্বামীজির চরণাশ্রয় করেন। এই পরিবারের সহিত স্বামীজির বংশের এতদূর ঘনিষ্ঠতা হয় যে, স্বামীজির দ্বিতীয় পুত্র বিষ্ণুপদ বাঁকুড়া শহরে ইহাদের বাসাবাটীতে থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। মাতাঠাকুরাণী বন্ধুলের বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। একবার তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য স্থানান্তরে কিছুকাল বাসের প্রয়োজন হইলে তিনি ইহাদের ভদ্রাসন-বাটীতে (বাঁকুড়া জেলায় তেলিবেড়িয়া

্রামে) গিয়া কয়েক মাস ছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার চরিত্রের একটি রমণীয় বশেষত্ব সুব্যক্ত হয়। যাইবার সময় তিনি ইঁহাদিগকে এইরূপ সর্তে আবদ্ধ করিয়া নয়াছিলেন যে, তিনি ইঁহাদের বাড়ীতে গুরুমার মত থাকিবেন না, স্বজনের তে থাকিবেন। তিনি এই সম্পত্তিশালী ও দাসদাসীসম্পন্ন পরিবারে আসিয়াও ্রত্যুষে উঠিয়া উঠান ঝাড়ু দেওয়া, আবশ্যক মত বাটনা বাটা ইত্যাদি কাজও হস্তে করিতেন এবং বাড়ীর কর্তারা আপত্তি করিলে চলিয়া যাইবেন বলিয়া ভয় দখাইতেন।

হিসাবে যেরূপ পাওয়া যায় তাহাতে মাতৃদেবী সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৮৯২ সনে স্বামিগৃহে মাসেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী এই গৃহে স্থির হইয়া বসিলেন এবং তীর্থস্বামী বিশুদ্ধানন্দের অজস্র অর্থাগম হইতে লাগিল। সন ১৩০১ সালের ৷ই আষাঢ় (খ্রীঃ ১৮৯৪ জুন) তাঁহার প্রথমপুত্র দুর্গাদাসের জন্ম হয়; ক্রমে আর এক পুত্র বিষ্ণুপদ, এবং এক কন্যা বিশ্বেশ্বরী (ডাকনাম মটর) জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয় বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খেরুর গ্রামে; স্বামীর নাম মোহিনীমোহন রায় (এম্. বি.)। বিশ্বেশ্বরী ও বিষ্ণুপদ উভয়েই অত্যন্ত অল্পায়ু ছিলেন; উভয়েই কচি বয়সে বিবাহের পরেই পরলোক প্রাপ্ত হন। তবে মাতৃদেবী ও পিতামহী দেবী এই শোকগুলি পান নাই। তাঁহাদের উভয়ের আগ্রহেই অল্পবয়সে দুই পুত্র ও কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। বিষ্ণুপদ বা বিশ্বেশ্বরী কোনও সন্তান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠপুত্র পূজনীয় দুর্গাদাস ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পিতার তিরোভাবের পরে মাত্র চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ইনি দুইবার দারপরিগ্রহ করেন, প্রথমা পত্নী একপুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে দ্বিতীয়া পত্নী গৃহে আসেন। প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম শ্রীসরোজমোহন, ইনি বি. এ. পাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষে দুইটি মাত্র পুত্র; নাম শ্রীঅবনীমোহন ও শ্রীষোড়শীমোহন। উভয়ে এখন ছাত্রাবস্থায়। স্বামীজিকে বাদ দিলে দেখা যায় তাঁহার পরিবারে প্রায় সকলেই অর্থাৎ তাঁহার পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, খুল্লতাতপুত্র এবং তাঁহার নিজের পুত্রকন্যা সকলেই অল্পায়ু। পূর্বেই বলা হইয়াছে তাঁহারও আয়ু কোষ্ঠীতে বাইশ বৎসরমাত্র ছিল; যোগ-ক্রিয়ার ফলে ও গুরুকৃপায় তাহা (অশীতির উপর পর্যন্ত) বর্ধিত হইয়াছিল।

ডাক্তারীবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া স্বামীজি বর্ধমান জেলায় গুস্করা-নামক গ্রামে স্থানীয় জমিদারদিগের আশ্রয়ে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি বোধ করি খ্রীঃ ১৮৯৩ সনে গুস্করায় যান এবং ১৯২১ সন পর্যন্ত তথায় থাকেন। গুস্করাই তাঁহার ডাক্তারী লীলার ক্ষেত্র ছিল; ঐ স্থান শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসই তাঁহার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশেই তিনি হঠাৎ উহা ত্যাগ করিয়া আসেন। তারপর তিনি আর বৃত্তিরূপে রোগীর চিকিৎসা করেন নাই। গুস্করার জমিদারদিগের বংশগত উপাধি ছিল চোঙদার। তিনি ইঁহাদের বহির্বাটীর

একাংশে এক গৃহে একক বাস করিতেন এবং প্রথম প্রথম যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এত অসাধারণ শক্তিসকল কি প্রচ্ছন্ন থাকিবার যোগ্য? বস্তুতঃ শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বিভূতিসমূহ ছিল তাঁহার "normal way of seeing and acting" কাজেই ক্রমে সেগুলি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন হইতে কেহ কেহ তাঁহাকে "ডাক্তারবাবু" না বলিয়া "ভোলানাথ সাধু"ও বলিত। "বিশুদ্ধানন্দ" নাম তখনও প্রচ্ছন্ন ছিল।

গুষ্করার জমিদার-বংশের গিরিশচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র চোঙ্গদার বিষয়-সম্পত্তি বাড়াইয়া অবস্থার খুব উন্নতিসাধন করেন। উভয়েই সৎলোক ছিলেন এবং ধর্মার্থে প্রচুর ব্যয় করিতেন। হরিশ্চন্দ্রই নিজেদের কাছারী বাড়ীতে একটি গৃহ "ডাক্তার বাবুর" বাসের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ডাক্তারবাবুকে চিনিতে তাঁহার বেশীদিন লাগে নাই। তিনি বলিতেন "ইনি একটি শালগ্রাম; দয়া ক'রে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন; যতদিন থাকবেন ততদিনই আমাদের মঙ্গল।" কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের পুত্র তারাপ্রসন্ন বিপরীতপ্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি স্বামীজির দ্বারা অশেষপ্রকারে উপকৃত হইয়াও লোকসমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারিতেন না, এমন কি অযথা নিন্দাও করিতেন। স্বামীজি তাঁহার স্ত্রীর ও পুত্র ধনেশ্বরের খুব প্রশংসা করিতেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র মহাবিষ্ণু ও তৎপুত্র যজ্ঞেশ্বর উভয়েই স্বামীজিতে ভক্তিমান ছিলেন। স্বামীজির চরিত্রের এক বিশিষ্টতা ছিল যে, তিনি উপকারী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যুপকার করা নিজের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। উত্তরকালে দেখিয়াছি যে, যে ডাক্তার বা কবিরাজ তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহাকেই তিনি হীরক বা অন্যবিধ মূল্যবান প্রস্তরাদি উপহার দিয়া কিংবা অন্য কোনও বিশিষ্ট প্রকারে তাঁহার ঋণ শোধ করিয়াছেন। এমন কি সাহেব ডাক্তার (ডেনহাম হোয়াইট) ভিজিট নিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিলেও তিনি সূর্য-বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে (আংটিতে ধারণ জন্য) হীরক প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কাজেই স্বামীজি যতদিন গুষ্করাতে ছিলেন ততদিন চোঙ্গদার বংশের প্রত্যেকের, এমন কি তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদারেরও, অশেষপ্রকার উপকারই করিয়াছেন।* তিনি গুষ্করা

* নিম্নলিখিত ব্যাপারের বিবরণটি আমি সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা দক্ষিণাপ্রসাদ রায়চৌধুরী একখানি পত্রে পাইয়াছি। তিনি লিখিতেছেন—

গুষ্করার যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের পিতার (মহাবিষ্ণু চোঙ্গদারের) মৃত্যু যে তারিখে হয়, সেই তারি রাত্রিতে ৺কাশী আশ্রমে বাবার আহ্নিকের ঘরের জানালায় তাঁহার জীবাত্মা আসিয়া বাবাকে অনুযো করেন যে, অতি গভীর অন্ধকারে তিনি পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না, কি করিবেন কোথায় যাইবেন সে চিন্তায় কাতর হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছেন। বাবা তদুত্তরে বলেন, "কোনও ভয় নাই আপনার উপরে যে তীব্র জ্যোতিঃ একটি দেখিতেছেন তাহার অনুসরণ করিয়া চলিয়া যান। সেই জ্যোতি আপনাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। আপনি শিষ্য না হইলেও আমার ভক্ত ও মৃত্যু-শয্যায় আমার আশ্র ভিক্ষা করিয়াছেন। যান, আপনাকে মা-ভৈঃ।" পরদিন বাবা আমাদিগকে এই বিবরণটি বলেন এবং তা একদিন বা দুইদিন পরে যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের পত্র আসে। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "অমুক দি বাবা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, মৃত্যুকালে আপনাকে বার বার ডাকিয়াছিলেন।"

ছাড়িয়া আসিবার পর অল্পদিনমধ্যে নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য এই বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হয়।

ডাক্তাররূপে গুস্করায় স্বামীজির সুনাম অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইজন্য দূরস্থান হইতেও ধনী রোগী তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থ যাইতেন। "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে" তাঁহার নানা শিষ্য-কর্তৃক তাঁহার কৃত চিকিৎসার যেসকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা ছাড়া আমি নিজে যাহা শুনিয়াছি এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁহার ঔষধসকলের অল্পাংশই ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্গত ছিল। সেইজন্য অসাধ্যপ্রায় ব্যাধিও তাঁহার ঔষধে দ্রুত ও নির্দোষভাবে প্রতিকৃত হইত। তাঁহার হাতে আসিয়া রোগী আপনাকে নিরাপদ মনে করিত। আয়ুহীন রোগী তিনি প্রায় গ্রহণ করিতেন না। এইজন্য প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁহার চিকিৎসার অসাধারণ সাফল্যে অল্পদিনমধ্যেই তাঁহার বেশ অর্থাগম হইতে থাকে। বিপদের বন্ধু বলিয়া দক্ষ চিকিৎসকেরা সাধারণতঃই জনপ্রিয় হন। আয়ুর্বেদে আছে—

> ক্বচিদর্থঃ ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদ্যশঃ।
> ক্বচিৎ কর্মাভ্যাসশ্চেতি চিকিৎসা নৈব নিষ্ফলা ॥

চিকিৎসা (চিকিৎসকের পক্ষে) কখনই নিষ্ফল হয় না। কোনও স্থানে অর্থ, কোনও স্থানে (পরোপকার হেতু) ধর্ম, কোথাও বন্ধুলাভ, এবং কোথাও যশোলাভ হয়; কোথাও (অন্য রকম প্রাপ্তি না ঘটিলে অন্ততঃ) চিকিৎসাকার্যে অভিজ্ঞতালাভ হয়। বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামীর (বা ভোলানাথ ডাক্তারের) ধর্ম, অর্থ, বন্ধু, যশঃ সকলই স্বল্পকালে সুপ্রাপ্য হইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। গ্রামাঞ্চল বলিয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিত। ঐ সময়ে যোগজ্যোতিষ দ্বারা লোকের কোষ্ঠী ও গ্রহফলাদির বিচার করিয়া দিতেন এবং গ্রহদোষ নিবারণ জন্য কবচাদি দিতেন এবং অন্যরূপেও তাহাদের উপকার করিতেন। ইহাতেও তাঁহার খুব অর্থাগম হইতে থাকে। তিনি দিবাভাগে ঐসকল কার্য করিয়া রাত্রিকালে তীব্র তৎপরতাসহকারে যোগচর্যায় রত থাকিতেন। এইজন্য রাত্রিতে তিনি অন্নাহার না করিয়া সামান্য জলযোগ-মাত্র করিতেন। তাঁহার দিনের আহার্য কৃত্তিবাসের মাতা বলিয়া পরিচিতা এক শুদ্ধা বিধবা ব্রাহ্মণীর হস্তে তাহারই (ব্রাহ্মণীর) গৃহে প্রস্তুত হইত। মাতাপুত্র উভয়েই স্বামীজির যথেষ্ট পরিচর্যা করিয়াছিলেন। রাত্রির জলযোগের দ্রব্য আসিত সাধারণতঃ বঙ্ক ঘোষ নামক এক ময়রার দোকান হইতে। ঐ দোকানটি তাঁহার বাসস্থানের নিকটেই ছিল। তাঁহার গুস্করা জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এখন পাওয়া একরূপ অসম্ভব। তাঁহার তৎকালীন যে কতিপয় শিষ্যের সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছে, তাঁহারা কেহই গুস্করার অধিবাসী নহেন এবং সেখানে বেশীদিন থাকেনও নাই। গুস্করায় অবস্থিতিকালে তিনি দিনে বহুবার স্নান করিতেন। প্রাতঃস্নানের পর আবার

বেলা ১০টা বা ১১টায় স্নান হইত। বৈকালে পায়খানা হইতে আসিবার পর—(তিনি দিনে ঐ একবারমাত্রই পায়খানায় যাইতেন)—স্নান করিতেন, সন্ধ্যা আহ্নিকক্রিয়ার পর জলযোগ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য শয়ন করিতেন, মহানিশায় যোগে বসিতেন, তাহার পর রাত্রি ২টায় আবার স্নান করিয়া পূজা করিতেন। "যা নিশা সর্বাভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী" (সকল প্রাণীর পক্ষে যেটি রাত্রিকাল সংযমী পুরুষ তখন জাগিয়া থাকেন)। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রার ব্যবস্থা খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল বলিয়া রাত্রির আহারটা চিরদিনই তাঁহার লঘু ছিল; পরে আমি যখন তাঁহাকে দেখি তখন প্রথম রাত্রিতে কিছুই আহার করিতেন না; রাত্রির ক্রিয়াসমাপ্তির পর সাড়ে চারিটায় কিঞ্চিৎ ফলের রস ইত্যাদি পান করিতেন। গুষ্করায় অনেক মহানিশায় তিনি শ্মশানে গিয়া ক্রিয়া করিতেন; একাকী যাইতেন এবং ঐ কার্য তিনি লোকের অগোচর রাখিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু বেশীদিন তাহাতে কৃতকার্য হন নাই। দুষ্টলোক অসদ্‌বুদ্ধি হইতে রাত্রিতে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিত; উহা করিতে গিয়া দুই-একজন বিপন্নও হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিয়াছেন, চোঙ্গদার জমিদারদিগের কর্মচারী রামলাল নগদীর এক ভাই দুর্বুদ্ধিবশতঃ একদা রাত্রিতে স্বামীজিকে অনুসরণ করিতে গিয়া কি-প্রকারে বলা যায় না পুষ্করিণীতে পড়িয়া গিয়াছিল; অবশেষে স্বামীজি কর্তৃক তাহার প্রাণরক্ষা হয়। এইরূপ সন্ধানী লোকেরাই ক্রমে তাঁহার গুপ্ত ও উগ্র সাধনের প্রচারের হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

প্রাতঃকালে ক্রিয়া হইতে বাহির হইবার পর সাধারণতঃ রোগী বা অন্যরূপ প্রসাদপ্রার্থী লোক তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, এবং তিনিও যাহার যে প্রার্থনা তাহা যথাসম্ভব পূর্ণ করিতেন। বালকবালিকারাও ফল ও মিষ্টান্ন ইত্যাদির জন্য প্রত্যহ তাঁহার কাছে আসিত। তাহাদের প্রার্থনাও অপূর্ণ থাকিত না। গুষ্করার অদূরবর্তী মাহাতা গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষমল্লিক এই সময়ে বালক ছিলেন, তাঁহার পিতা শৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষমল্লিক স্বামীজির শিষ্য হন। প্রাণকৃষ্ণ অনেক সময়ে গুষ্করায় আসিতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "আমরা সকালে বা বিকালে তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতাম এবং তিনিও বলিতেন, 'এই আঙ্গুর খাবি?' আমরা 'খাব' বলিলেই এমন হইয়াছে যে, পার্শ্ববর্তী জাম গাছ হইতে কতকগুলি কাঁচা ফল সহ একটা ডাল ভাঙ্গিয়া তিনি আমাদের দিতেন; আমরা দেখিতাম সে ডালের ফলগুলি বাস্তবিক কাঁচা জাম নয়, আঙ্গুরই।" বালক বালিকারা চিরদিনই স্বামীজির অতিপ্রিয় ছিল। যীশু খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, Suffer little children to come unto me (ছোট শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও)। স্বামীজির স্বভাব এবং কথাবার্তা এমনই মধুর ছিল যে, বালক বালিকারা চিরদিনই অতিসহজে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তিনিও তাহাদের সঙ্গে অনেক কৌতুক ও রঙ্গরস করিতেন।

খ্রীঃ ১৯০২-৩ সন হইতেই তিনি যোগজ্যোতিষ দ্বারা অর্থার্জন ছাড়িয়া দেন ; ঃ পূর্বেই বলিয়াছি গুরুত্যাগের পর (খ্রীঃ ১৯১১) বৈদ্যবৃত্তিও ত্যাগ করেন। ১৯০২ সন বা উহারই কাছাকাছি কোনও সময় হইতে গুরুরই আদেশক্রমে নি একটি দুইটি করিয়া শিষ্য করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম শিষ্যেরা ং ভক্তেরাও মোদকাদি অনতিবিশিষ্ট শ্রেণীর সরলবিশ্বাসী—ইংরাজীতে াদিগকে বলে unsophisticated—লোক ছিলেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী র হেড্মাষ্টার ও শিক্ষকগণ, টোলের পণ্ডিত মহাশয়, এবং গ্রামস্থ আরও দু'-দশ ব্রাহ্মণাদি ভদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিও অবশ্যই তাঁহার নিকট আসিতেন, এবং তামাক-ন ও গল্প-গুজব এবং সময় সময় ধর্মপ্রসঙ্গও করিতেন। কেহ কেহ তাঁহার দ্বারা জ বস্ত্রাঞ্চলে বা রুমালে এক-আধটুকু গন্ধ করাইয়া নিতেন, রোগ হইলে ঔষধ তেন, স্ব স্ব গ্রহসঞ্চারাদির ফলাফল শুনিয়া যাইতেন এবং নিজ নিজ স্বভাব সারে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা নিন্দা করিতেন। নিকটবর্তী অঞ্চলের দুইটি সাধু—খাঁকি া ও রতন ক্ষেপা—মধ্যে মধ্যে আসিতেন ;—একজন কড্ডে, অপর কুড়ুম্বা তে। ইহারা স্বামীজিকে ভোলা-ক্ষেপা বলিতেন। "ক্ষেপামি" বস্তুতঃ াতে কোন কালেই কিছুই ছিল না—তবে প্রেয়ের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ের পথে ই জাগতিক হিসাবে ক্ষেপামি বই কি ? আর স্বামীজি নিজেও স্বরচিত গানের ণিতায়" নিজেকে "বিশে ক্ষেপা" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অনন্ত নাগের ফণার খবর রাখি না ; আমরা জানি এবং বোধ করি ঠিকই জানি—এইসকল পারাই জগৎটাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাহা মানুষের পাপের ভারে তলে বা আরও নীচে—অবীচিনরকে পড়িয়া যাইতেছে না।

খাঁকি বাবা ও রতন ক্ষেপা ছাড়া দীর্ঘনগরের দুইটি উন্নত সাধক—জগদানন্দ াহার শিষ্য শিবানন্দও—স্বামীজিকে চিনিয়াছিলেন। বিষয়ী লোকের চিনিতে টু সময় লাগে ; যদিও সাধুর—গুরুর—প্রয়োজন তাহাদেরই অধিক। তবে রও শিষ্যের প্রয়োজন আছে। "তস্য (ঈশ্বরস্য) স্বানুগ্রহাভাবেঽপি কানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্" (নিজের কাম্য কিছু না থাকিলেও লোককে অনুগ্রহ াই ঈশ্বরের প্রয়োজন)। এই অনুগ্রহের প্রয়োজনেই স্বামীজির বিভূতিগুলি ংকালের শিউলী ফুলের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে যেন অজস্র ঝরিয়া পড়িত। ্যবান লোকেরাই তাহা কাজে লাগাইবার প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে।

মোদকাদি শ্রেণীর শিষ্যদের পরে গ্রাম্য তালুকদার (যথা, মাহাতার রীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষমল্লিক, অসিতাচরণ ঘোষমল্লিক ইত্যাদি) এবং ডাক্তার ারীন্দ্রকৃষ্ণেরই ভগিনীপতি প্রতাপনারায়ণ সিংহ) এবং ভদ্রশ্রেণীর অন্যান্য ক্তিগণ ক্রমে ক্রমে শিষ্য হইতে থাকেন। প্রাচীনতম উচ্চশিক্ষিত শিষ্যগণের ্য বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার হরিদাস পাল উল্লেখযোগ্য। আর একজন খযোগ্য ব্যক্তি হইতেছেন রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইনি কৈশোর হইতে

স্বামীজির হাতের তৈরী বলিলেই হয়। বড় হইয়া তিনি নেপালে এঞ্জিনিয়ারি করিতেন। স্বামীজি অনেক সময় ইঁহার ও ইঁহার স্ত্রীর যোগপথে অসাধার উন্নতির গল্প করিতেন। স্বামীজির প্রথম যুগের শিষ্যগণ সকলেই বিভূতিতে মু হইয়াই তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করেন। পূর্বোক্ত তালুকদার শৌরীন্দ্রকৃষ্ণও বিভূতি দ্বারাই আকৃষ্ট হন। খ্রীঃ ১৯০৪-৫ সনে ইঁহার এক ভাইঝির বিবাহের পরদি জামাতার হাতের আংটি চুরি যায়; এটা বাড়ীর লোকের বড় লজ্জার কথা অনেক অনুসন্ধানেও যখন আংটি পাওয়া গেল না, তখন গ্রামেরই একটি সাধার লোক বলেন, গুস্করায় ভোলানাথ সাধুর কাছে গেলে তিনি বলিয়া দিতে পারিবে আংটি কোথায় আছে। তখন শৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ছুটিয়া গুস্করায় আসেন এবং তাঁহা কিছু বলিবার পূর্বেই স্বামীজি বলেন, "তুমি মাহাতো থেকে আস্‌ছ? তোমা ভাইঝির বিয়েতে আংটি হারিয়েছে? সেটা তোমার চাকর ভোলানাথ পা (স্বামীজি নামটাই বলেন) নিয়েছে এবং তোমারই অমুক ঘরে অমুক স্থা কাগজে মোড়া আছে। চাকরটাকে কিন্তু কিছু বলো না।" ব্যস, আংটিও পাওয় গেল; আর অল্প কয়েকদিন পরে, পূর্বে কুলগুরু হইতে দীক্ষিত হইলেও শৌরীন্দ্রকৃষ্ণ আসিয়া স্বামীজির চরণ আশ্রয় করিলেন। এইরূপেই বিপদ সম্পা পরিণত হয়। ইহারই নাম কৃপা।

ই. আই. রেলওয়ের ষ্টেশনমাষ্টার সম্প্রতি পরলোকগত জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ে মতে খ্রীঃ ১৯০৯ সন পর্যন্ত স্বামীজির শিষ্যদের মধ্যে পুলিশের লোকের সংখ্যা অধিক ছিল। রাইটার কন্‌ষ্টেবল হইতে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পর্যন্ত সক শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীই তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সব ইন্‌স্পেক্টর (পরে ইন্‌স্পেক্টর) উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীই (বোধ করি খ্রীঃ ১৯০৩-৪ সনে প্রথম শিষ্য হন। কুলগুরু হইতে প্রথম দীক্ষিত হইলেও ইঁহাকে স্বামীজি একর ডাকিয়া আনিয়াই শিষ্য করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইনি কালক্র উন্নতও খুবই হইয়াছিলেন। ইঁহার পর ত্রৈলোক্যনাথ দাস ও নিবারণচন্দ্র ঘো (উভয়েই দারোগা) এবং পুলিশ অফিসের কেরাণী প্রেমচাঁদ ঘোষ ইত্যাদি শি হন। উপেন্দ্রের প্রতি বদ্ধমূল ঈর্ষা ও শত্রুতাই উক্ত দারোগাদ্বয়ের গুরুপ্রাপ্তি কারণ। ইঁহারা বহু চেষ্টায় উপেন্দ্রকে বিপদে ফেলিতে না পারিয়া বা বিপ পড়িলেও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ মুক্ত হইতে দেখিয়া অনুসন্ধা জানিতে পারেন যে, এক অলৌকিক শক্তিশালী গুরুই তাঁহাকে প্রতি পদে র করিতেছেন। তখন তাঁহারাও সেই মহাপুরুষের চরণ শরণ করেন। পুলিশে লোক হইলে কি হয়? ত্রৈলোক্য ক্রমে চাকরী ছাড়িয়া, এমন কি সংসারও ত্যা করিয়া, নির্জন তীর্থে সাধন-ভজনে রত হন।

পুলিশের লোকেরা দলে দলে স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া কে কেহ তাঁহাকে "ডাকাতে কালী" বলিয়া পরিহাস করিত। অর্থাৎ ডাকাতে

ন এই আশায় কালীপূজা করে যে, ডাকাতি করিতে গিয়া বা করিয়া তাহারা পড়িবে না, সেইরূপ পুলিশের লোকেরাও (ঐ সকল ব্যক্তির মতে) স্বামীজিকে উদ্দেশ্যে গুরু করিতেছিল যে, যেন তাহারা ঘুষ খাইয়া ও লোকের উপর াচার করিয়া ধরা না পড়ে। সে যাহা হউক, ঐ কথা শুনিয়া কাটোয়ার নীন্তন মুন্সেফ শ্রীযুক্ত তুর্গাকান্ত রায় ভাবিলেন—পুলিশের লোক কি সহজে ারও কাছে মাথা নত করে ? অবশ্যই এই সাধুতে কোনও অসাধারণ শক্তি ছ। এই ভাবিয়া তিনি স্বামীজিকে দেখিতে আসিয়া ক্রমে তাঁহার শিষ্যত্ব া করেন। ইঁহারও কুলগুরু হইতে পূর্বে দীক্ষা হইয়াছিল ; সে কথা প্রসঙ্গক্রমে ই উল্লিখিত হইয়াছে।

তুর্গাকান্ত রায় মহাশয়ের দীক্ষা হয় খ্রীঃ ১৯০৬ সনে। ঐরূপ সময়েই কলিকাতা কোর্টের উকীল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দীক্ষা হয়। হাইকোর্টের উকীল গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীক্ষা হয় খ্রীঃ ১৯০৭ সনে। উখরা উচ্চ-ইংরেজি লয়ের প্রধান শিক্ষক রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও তাঁহার ভ্রাতা (উত্তরকালে শ ইন্‌স্পেক্টর) দক্ষিণাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর এবং অবসরপ্রাপ্ত সবজজ হরগোবিন্দ াপাধ্যায়ের নিজের ও তাঁহার তুই ভ্রাতা এবং পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি পরিবারস্থ লের দীক্ষা হয় খ্রীঃ ১৯০৮ সনে। হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বি. এস্‌সি.) এবং তাহার ভগিনীপতির দীক্ষা তৎপূর্বেই াছিল। বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দীক্ষাও ৎসর হইয়া থাকিবে, অন্ততঃ খ্রীঃ ১৯০৯ সনে ডাক্তার (পরে রায় সাহেব) ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্‌. এম্‌. এস্‌.-এর দীক্ষার পূর্বে হইয়াছিল। কাজেই একথা ংশয়ে বলা যায় স্বামীজি গুস্করা থাকিতেই এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকালমধ্যেই ার মহিমার খ্যাতি বর্ধমানের এক পল্লী-অঞ্চল ছাড়িয়া বহুদূর প্রসারিত হইয়াছিল নানাস্থানের বহু শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। লের নাম উল্লেখ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে াও মনে হয় না। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রায় বাহাতুর গিরীন্দ্রনাথ াপাধ্যায়ের দীক্ষার বিবরণে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। তিনি বাঁকুড়ায় পুলিশ-র রূপে কার্য করিবার কালে স্বপ্নে মন্ত্র ও দেবতার সাক্ষাৎ পান। তদবধি র দীক্ষাগ্রহণের জন্য আগ্রহ জন্মে। তিনি যে দেবতার দর্শন পাইয়াছিলেন, ার একখানি মূর্তি কোনও কর্মকার দ্বারা গড়াইয়া নিজের এক বাক্সে লুকাইয়া ন এবং নিজের স্বপ্নের কথা কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না করিয়া অন্বেষণ করিতে থাকেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে াপ্তির কথা স্বতঃ বলিতে পারিবেন তিনিই অবশ্য তাঁহার বিধাতৃনির্দিষ্ট গুরু। কালমধ্যে তিনি বহু সাধুপুরুষকে দর্শন ও স্বকল্পিত নিকষে পরীক্ষা করিলেন, কেহই তাঁহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন না। অবশেষে স্বামীজীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ হইল। তিনি দীক্ষার প্রসঙ্গ তুলিবামাত্র স্বামীজি বলিলেন, "তুমি ত স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছ।"

গিরীন্দ্র মুখো। কে বলিল?

স্বামীজি। পাও নাই কি? এই মন্ত্র তুমি পাইয়াছ, এবং এই দেবতার এ মূর্তিও তোমার কাছে আছে।

গিরীন্দ্র। নাই।

স্বামীজি। আমি যদি তোমার বাড়ী হইতে তাহা বাহির করিতে পারি?

গিরীন্দ্র। চলুন আমার বাড়ী, কোথায় মূর্তি আছে দেখাইবেন।

স্বামীজি। চল।

তারপর তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া স্বামীজি একটি বাক্স দেখাইয়া বলিলেন এই বাক্সটি খোল দেখি।

গিরীন্দ্র। এর চাবিটি হারাইয়া গিয়াছে।

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, "তবে তালাই ভাঙ্গিয়া ফেল।"

বলা বাহুল্য তালা ভাঙ্গিতে হইল না। গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বামীজির পদধূলি লইয়া দীক্ষাপ্রার্থনা করিলেন। স্বামীজি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একরূপ জোর করিয়া অর্থাৎ গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সর্তেই তাঁহাকে বাধ্য করিয়া কৃপাবিতরণ করিয়াছিলেন। গুরুকৃপা যে নিষ্ক্রিয় (Passive) কিছু নয় ইহা তাহাই প্রমাণ করে না কি? উহা যখন আসে তখন স্বতঃই আসে এবং সকল কৃত্রিম বাধা অতিক্রম করিয়াই আসে।*

এইরূপ কোনও সময়েই ঠিক কি সূত্রে তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার গুরুরাতে গিয়া স্বামীজির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন। বিভূতির প্রসঙ্গে স্বামীজি তাঁহাকে দেহের সর্বজনবিদিত কতিপয় দ্বারব্যতীত আরও বহুদ্বারের কথা বলেন; এমন কি প্রতি লোমকূপই এক একটি দ্বার এবং উহা যোগীর ইচ্ছামত সঙ্কোচ-প্রসারের যোগ্য এই কথা বলেন। ডাক্তার সরকার এই কথার প্রমাণ চাহিলে স্বামীজি শরীরের নানাস্থানে অক্লেশে স্ফটিক ঢুকাইয়া দিয়া এবং নানাস্থান দিয়া পুনরায় তাহা বাহির করিয়া তাঁহাকে বিস্মিত করেন। তদ্ভিন্ন এক দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড ঘৃতসিক্ত করিয়া মুখ দ্বারা তাহা অনাবৃত দেহ মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া নাভি দিয়া উহা নির্গত করিয়া দেখান যে নাভিও একটি প্রশস্ত দ্বার। ডাঃ সরকার স্বহস্তে স্বামীজির অনাবৃত নাভি হইতে ধীরে ধীরে ঐ বস্ত্রখণ্ড টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেহতত্ত্ব-বিদ্যা যে ক

*রায় বাহাদুর গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমি দেখি নাই; তিনি আমার দীক্ষার পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন। আমি উক্ত বিবরণটি পাইয়াছি সম্প্রতি পরলোকগত গুরুভ্রাতা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্স্পেক্টর গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হইতে।

ম্পূর্ণ তাহা আপনি ভাল ভাবেই দেখাইয়া দিলেন।" এই বিবরণ স্বামীজির খ বহুবার শুনিয়াছি। তদ্ভিন্ন বঙ্গ-গৌরব বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুও শুক্ররাতে মীজিকে দেখিতে গিয়াছিলেন এ কথাও তাঁহার (স্বামীজির) মুখে শুনিয়াছি, ন্তু তাঁহার সঙ্গে কিরূপ আলাপাদি হইয়াছিল এবং তাঁহাকে কোনও বিভূতি র্শন করা হইয়াছিল কিনা তাহা শুনি নাই। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ঘোষমল্লিক লন, যেদিন জগদীশ বসু শুক্ররায় যান সেদিন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ন তিনি চৌদ্দ-পনের বৎসরের বালক। তাহার প্রদত্ত বিবরণে এ বিষয়ে ানও আলোকপাত হয় না। তিনি বলেন, জগদীশ বসু সন্ধ্যাকালে শুক্ররায় ঁাছেন, ঐ সময়ে স্বামীজি আহ্নিক কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বামীজির শিষ্য ধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন উপস্থিত ছিলেন, তিনি জগদীশ বসুকে একরূপ াচিত ভাবেই একটা বিস্ময়কর বিভূতি দেখান। উহার বিবরণে (বিশেষতঃ ণকৃষ্ণ ঘোষের তদানীন্তন বয়স স্মরণ করিলে) বিশেষ আস্থা স্থাপন করা চলে । স্বামীজির আহ্নিককৃত্যের পরে বসু মহাশয় বেশীক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ রিবার অবসর পান নাই,কেননা তিনি নাকি সেই দিনই রাত্রি ১০টার ট্রেনে লিকাতায় ফিরিয়া আসেন—ইহাও আমার প্রাণকৃষ্ণ দাদা হইতে শ্রুত। সে হা হউক, ইহা ঠিক যে, স্বামীজি উত্তরকালে প্রতি বৎসর কয়েকমাস কলিকাতায় স করিলেও যে কারণেই হউক জগদীশ বসু আর কখনও স্বামীজির সহিত ক্ষাৎ করিতে আসেন নাই। হইতে পারে স্বামীজির আগমন-সংবাদ তাঁহার র্ণে পৌঁছে নাই। ইহাও সম্ভব তিনি সে সময়ে সর্বদা নিজ গবেষণাকার্যে রূপ ব্যাপৃত থাকিতেন যে, যোগবিভূতিসম্বন্ধে কোনও কৌতূহল তাঁহার মনে বল হইতে পারে নাই। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পরে কলিকাতার ডাঃ শেখর কালী ও ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত (উভয়েই এল্. এম্. এস্. ও হোমিওপ্যাথিক কিৎসক) স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্তের হিত সাক্ষাতের বিবরণ আমি গুরুভ্রাতা মন্মথনাথ সেন হইতে পাইয়াছি। উহা নি এবং তৎসহ আরও অনেকে শুনিয়াছেন স্বামীজির স্বমুখ হইতে। মন্মথ নের পিতা, ডিমলার রাজকুমার, যামিনীবল্লভ সেনের সহিত ডাঃ অক্ষয়কুমার ত্তের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে তখনও কুমার যামিনীবল্লভ মীজি হইতে দীক্ষালাভ করেন নাই। একদিন তিনি এবং ডাঃ অক্ষয়কুমার ত্ত কয়লার খনির ব্যবসায়ে লব্ধখ্যাতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (W. C. anerjee-র) গৃহে স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ দিন স্বামীজি লেন্স্ দিয়া াহাদিগকে কোনও একটা জিনিষ তৈয়ার করিয়া দেখাইতেছিলেন। এই সময়ে ভাবতঃ অবিশ্বাসী ডাঃ দত্ত স্বামীজি কোনও কৌশল করিতেছেন মনে করিয়া াহার হাত ধরিয়া ফেলেন। ইহাতে স্বামীজি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে একটি চড় য়া বলেন, "এই দেখ হাতে কি আছে ?" ইহা বলিয়াই তিনি যে কম্বলের আসনে

বসিয়াছিলেন তাহা হইতে কতকটুকু পশম ছিঁড়িয়া লইয়া লেন্সের সাহা ব্যতিরেকেই অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির বলে তৎক্ষণাৎ তাহা একটি অতি সুন্দর ও উ প্রবালে পরিণত করেন।* এটিও হয়ত তাঁহার হাতের একটি কৌশল এই সন্দেহ ডাঃ দত্তের মনে আছে বুঝিতে পারিয়া স্বামীজি স্বীয় নাভিদ্বার স্ফী বিস্ফারিত করিয়া একটি পাশ বালিসের অর্ধাংশ দেহমধ্যে ঢুকাইয়া দেন। ইহা ডাঃ দত্ত বোধ করি ভীত হইয়াই মূর্ছাগ্রস্ত হন এবং পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে প পড়িয়া ক্ষমা ও দীক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার দীক্ষালাভ হয় নাই। স্বামী মন্মথ সেন-প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন যে, উহার প্রার্থনার বিষয় জ্ঞানগঞ্জে লিখি পরে তথা হইতে এই মর্মে উত্তর আসে,—অক্ষয়ের পরমায়ু অল্পই বাকী আ দীক্ষাতে এ জন্মে তাহার কোনও লাভ হইবে না। ডাঃ চন্দ্রশেখর কালীকে তি কোনও বিভূতি দেখাইয়াছিলেন কিনা শুনি নাই। তবে পরিচয় যে হইয়া তাহা তিনি আমার সমক্ষে ডাঃ কালীর পুত্র ডাঃ সুধাংশুশেখর কালী বলিয়াছিলেন। শিক্ষিত অথচ অল্পাধিক নাস্তিক ব্যক্তিদিগের উপকারা স্বামীজি চিরদিনই সামান্তরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের খেলা কিছু কি দেখাইতেন। বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণও ইহাদের অন্তর্গত। ইহারা পুস্তকে সংবাদপত্রে ঐ সব দর্শনের বিষয় প্রকাশও করিয়াছেন। তন্মধ্যে Paul Brunto প্রণীত A search in Secret India গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

খ্রীঃ ১৯১১ সনে স্বামীজি গুষ্করা চিরদিনের জন্ত ত্যাগ করিয়া বর্ধমান আসে উহার কিছু পূর্ব হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে বর্ধমানে আসিয়া থাকিতেন, তখন তথ রোগীর চিকিৎসাও করিয়াছেন। বর্ধমানে স্থায়িভাবে আসিয়া প্রথমে তি রাণীগঞ্জ বাজারের নিকট একটি বাড়ীতে কতিপয় শিষ্যসহ বাস করিতে থাকে তৎপর রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে শিষ্যদিগের প্রদত্ত অর্থে একটি আ ("বিশুদ্ধাশ্রম") প্রস্তুত হয়। তৎপূর্বে বণ্ডুলে একটি মন্দির ও ছোটখাট আশ্র এবং পুষ্করিণী ইত্যাদি হইয়াছিল। একটি গুহাও হইয়াছিল; উহা এখন নষ্ট হই গিয়াছে। বণ্ডুলে শিবমন্দির, আশ্রম ইত্যাদি সবই স্বামীজির অনিচ্ছায় তদী "দাদা গুরুদেব" ভৃগুরাম পরমহংসের আদেশে হইয়াছিল। মন্দিরে জ্ঞানগ আশ্রমের "হরহরি" বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্ধমানে "বিশুদ্ধাশ্রম" স্থাপি হওয়ার কিয়ৎকাল পরে স্বামীজির শিষ্য ঝালদার রাজা উদ্ধবচন্দ্র সিংহ ঝালদা স্বব্যয়ে একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়া গুরুকে দান করেন। স্বামীজি সাধনাবস্থা কিছুদিন ঝালদার সন্নিহিত পাহাড়ে ছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের সহিত পূর্ব হইতে তাঁহার একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

খ্রীঃ ১৯১১ সনে তিনি রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রতাপনারায়ণ সিং

*এই প্রবালটি কুমার যামিনীবল্লভ স্বামীজি হইতে চাহিয়া নেন এবং বলেন, "এটি আমার বংশানুক্র আমাদের বাড়ীতে থাকিবে।" এখন সেটি তাঁহার কনিষ্ঠ-পুত্র মন্মথনাথের কাছে আছে।

াৱীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষমল্লিক, কেদারনাথ সিংহ প্রভৃতি কতিপয় শিষ্যসহ চন্দ্রনাথ ও ামাখ্যা তীর্থদর্শনে যান। ১৯২৭ সনে যোগেশ বসু, বিধু চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ বিরাজ, দক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহুশিষ্য সহ পুনরায় কামাখ্যা যান। কের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে ঐ স্থলে দুইবারেই তাঁহার যে সকল ঐশ্বর্য প্রকাশিত ইয়াছিল তাহার বিবরণ দিলাম না।

খ্রীঃ ১৯১৫ সনে স্বামীজি হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী-প্রভৃতি কুড়ি-বাইশ জন শিষ্য সহ দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত নাতীর্থ দর্শন করেন।* ফিরিবার পথে মাদুরা, চিদম্বরম্, শ্রীরঙ্গম্, ত্রিচিনাপল্লী ক্ষিতীর্থ-প্রভৃতি দর্শন করেন। পরে যখন তাঁহারা কাঞ্চীতে যমুনাবাঈ শালায় পেঁৗছিলেন, তখন দেখিলেন, কলে জল নাই ; ধর্মশালায় জল সরবরাহের ন্য ব্যবস্থাও নাই। জল পাইবার সময় বহুক্ষণ পূর্বেই অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ামীজি তখন বিভূতিবলে এক ঘণ্টার জন্য কলে প্রচুর পরিমাণে জল আনয়ন রিয়াছিলেন। ধর্মশালার ব্যক্তিগণকর্তৃক এই সংবাদ শহরে প্রচারিত হইলে স্থানীয় হু নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে।

খ্রীঃ ১৯১৬ সনে তিনি ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রভৃতি য়েকজন শিষ্যসহ মথুরা, বৃন্দাবন-প্রভৃতি দর্শনে যান। তাঁহারা ঐ সমুদয় স্থান ইয়া হরিদ্বার পেঁৗছিলে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী (শ্রীযুক্ত উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যা) শ্রীযুক্তা কালীদাসী দেবী পিতৃগৃহে টাইফয়েড্ জ্বরে শয্যাগত হন এবং াক্তারগণ তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। কালীদিদির অবস্থা তাঁহার ক্ষপতি পিতা প্রত্যহ তারযোগে সতীশ মুখোপাধ্যায়কে ও স্বামীজীকে জ্ঞাপন বং সতীশ মুখোপাধ্যায়কে অবিলম্বে কলিকাতা ফিরিতে অনুরোধ করিতে লেন। তিনি পত্নীর পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেও স্বামীজি তাঁহাকে ন্তা করিতে নিষেধ করেন এবং তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করাও নাবশ্যক—এই কথা বলেন। অবশেষে যখন সংবাদ গেল যে, ডাক্তারগণ াগীকে শেষ জবাব দিয়াছেন, তখন সতীশ মুখোপাধ্যায় অধীর হইলে

*শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (লিচু দাদা) আমাকে বলিয়াছেন, স্বামিজী সন্ন্যাসিদশায় যখন গঙ্গোত্তরী ন, তখন তথা হইতে এক কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আনিয়া তাহা অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। রামেশ্বর বের মস্তকে সেই জল স্বয়ং দেন, এবং শিষ্যগণের হস্ত দ্বারাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেওয়াইয়াছিলেন। াঙালীরা মৎস্যভোজী বলিয়া রামেশ্বরমন্দিরে বাঙালী ব্রাহ্মণদিগকেও ঢুকিতে দেওয়া হইত না। ঐ কথা নিয়া মণীন্দ্রদাদা স্বামীজিকে উহা বলিলে তিনি বলেন. "দেখা যাক্, কি হয়। ভিতরে যাইতে না দেয় ত হির হইতেই দর্শন করিব।" কিন্তু স্বামীজি যখন গরদের কষায় বসন পরিয়া ও অত্যন্ত গ্রীষ্মের জন্য ুরীয় মাথায় বাঁধিয়া কমণ্ডলুহস্তে রামেশ্বরমন্দিরের দিকে শিষ্যগণসহ অগ্রসর হইলেন, তখন কেহ আপত্তি রিল না, দ্বারপথের চন্দনকাষ্ঠের অর্গল নীরবে সরাইয়া দেওয়া হইল। স্বামীজি সশিষ্য ভিতরে গিয়া াজল দ্বারা শিবের স্নানাদি কার্য সাধন করেন।

স্বামীজি কাশীতে বসিয়াই (এই সময়ে তাঁহারা হরিদ্বার হইতে কাশী আসিয়াছিলেন) কালী দেবীর ব্যারাম স্বয়ং টানিয়া নেন, এবং সেই মুহূর্তে কালীদেবী কলিকাতায় জ্বরমুক্ত হন। স্বামীজি বলিয়াছিলেন, কালীদেবীর আ কয়েকদিন ভোগ ছিল, সেই ভোগ সতীশ মুখোপাধ্যায়ের অধীরতার জন্য তাঁহা নিজে টানিয়া নিয়া স্বদেহে ভোগ করিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহাকে কয়েকদি শয্যাশ্রয় করিয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার গাত্রে টাইফয়েড্ জ্ব বিস্ফোটক পর্যন্ত বহির্গত হইয়াছিল। উহার চিহ্ন তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাব পর্যন্ত ছিল। গুরুভক্ত সতীশ মুখোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতাবশে কাশীতে হনুমান ঘাটে নিকট একটি বাটী ক্রয় করিয়া তাহা গুরুকে উৎসর্গ করেন। এই আশ্রমের না "বিশুদ্ধানন্দ কুটীর"। এই আশ্রমেই খ্রীঃ ১৯১৮ সনে আমি স্বামীজিকে প্রথম দ করি। কাশীর উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে পুরীতে "বিশুদ্ধধাম" আশ্রম হয়, ইহা বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে। তৎপর কাশীতে মালদাহিয়া অঞ্চলে "বিশুদ্ধান কানন" আশ্রম শিষ্যগণের টাকায় হয়।

কাশীর প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বামীজির তথায় অবস্থিতিকা তদীয় পত্নী—মাতা কৃষ্ণভামিনী দেবী—বণ্ডুলে দেহরক্ষা করেন। শুনিয়াছি ঘটনার কয়েকমাস পূর্বে স্বামীজি তাঁহার শিষ্য গুষ্করার নিকটবর্তী মাহা গ্রামনিবাসী ডাঃ প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও শৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ-মল্লিককে বলে "তোমাদের মা আর বেশীদিন দেহে থাকিবেন না, তাঁহার যদি কোনও আকাঙ্ অপূর্ণ থাকে তাহা তাঁহার মুখে শুনিয়া পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিও।"* তদনুসা ডাঃ প্রতাপনারায়ণ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া মাতাঠাকুরাণী বলেন, "আমার কো আকাঙ্ক্ষা নাই; তবে ইচ্ছা হয় একদিন কয়েকটি কুমারীকে ভোজন করাই।"

প্রশ্ন। আপনার তীর্থদর্শনে ইচ্ছা হয় কি?

উত্তর। না তীর্থ ত সব আমার মধ্যেই আছে।

মাতৃদেবীর শেষরোগের কালে ডাঃ প্রতাপনারায়ণ প্রত্যহ ঘোড়ায় মাহা হইতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া যাইতে তাঁহার এই সেবার বিষয় স্বামীজি কখনই বিস্মৃত হন নাই।

স্বামীজি বর্ধমানে উপস্থিত হইলে বহু ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করি থাকে। খ্রীঃ ১৯০৯-১০ সনেই তিনি গুরুকর্তৃক পরমহংস-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রথম শিষ্যগণ প্রায় খিদিরপুর অঞ্চলের লোক ছিলেন। চাক হইতে অবসর গ্রহণের পর রায় বাহাদুর গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভবানী

---

* মাতাঠাকুরাণী যে দেহ রক্ষা করিবেন ইহা কিছুকাল পূর্বে স্বামীজি দক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী তাঁহার পত্নীকেও বলিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী মাতাঠাকুরাণীকে খুব ভক্তি করিতেন; সেইজন্য স্বামী বলেন, "দেখিতে হইলে এইবার গিয়া দেখিয়া আইস। পরে আমাকে অনুযোগ দিও না।"

কাঁসারীপাড়ায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। ১৯১৪ সনে তাঁহারই গৃহে যোগেশচন্দ্র বসু. প্রকাশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহার পরে যোগেশ বসুর আগ্রহে স্বামীজি প্রতিবৎসর কিছুদিন ভবানীপুরে (৭নং কুণ্ডু রোড) তাঁহার গৃহে যাপন করিতে থাকেন। ঐ সময়ে ভবানীপুর অঞ্চলের অনেকে এবং অন্য অঞ্চলেরও কেহ কেহ তাঁহার চরণ আশ্রয় করেন। ইহারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত, পদমর্যাদাসম্পন্ন, ও অল্পাধিক সঙ্গতিবান্ ব্যক্তি। সেইজন্য কলিকাতায় তাঁহার কিছু প্রতিষ্ঠা হয়, যদিও প্রতিষ্ঠা আদৌ তাঁহারকাম্য ছিল না। বাঙলার নানা মহাপুরুষগণের অনুমোদিত অষ্টপ্রহর বা তদধিককাল- ব্যাপী বা অন্যরূপে বিরাট্ কীর্তনাদি বা বিরাট রকমের দরিদ্রসেবার আয়োজন স্বামীজির উপদেশের বা কর্মপদ্ধতির অঙ্গ ছিল না। তিনি উন্মাদিনী ভক্তি বা জনসেবার নামেও সাড়ম্বর কর্মবাহুল্য কাম্য মনে করেন না। বাক্সংযম, কায়সংযম, মনঃসংযম তাঁহাদের আচরণীয় ও উপদেশ্য ; লোকবাসনা এমন কি শাস্ত্রবাসনাও বর্জনীয়। মুক্তিকোপনিষদ্ বলিয়াছেন,

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াঽপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে ॥

এই প্রকার সংযমের বাহুল্যে যোগীদিগের প্রচার কখনও দ্রুতবেগে হয় না ; প্রচার তাঁহাদের অভীপ্সিত নয়। কিন্তু লোকহিতার্থ যাঁহাদের আবির্ভাব, তাঁহারা একান্তভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিবেন কি প্রকারে ? কাজেই হৈ-চৈ না থাকিলেও স্বামীজির শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বেশ বাড়িয়া যায়। গুরুরায় থাকিতেই—খ্রীঃ ১৯০৯-১০ সনে—তাঁহার শিষ্যসংখ্যা প্রায় সাত শত হইয়াছিল এইরূপ কথা জ্ঞানগঞ্জ হইতে তাঁহার নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখা যায়। শেষপর্যন্ত তাঁহার শিষ্যসংখ্যা কত হইয়াছিল, তাহার কোনও হিসাব পাওয়া যায় না। দুই-তিন সহস্র নিশ্চয়ই হইয়াছিল। ইহারা সকলেই গৃহী শিষ্য। তদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী শিষ্যও ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইঁহাদের অনেকে এখনও আছেন। ইঁহাদিগকে কদাচিৎ দেখা যাইত। ইঁহাদের সংখ্যাও হাজার খানেক* হইবে এরূপ কথা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি। কখন যে কি ভাবে ইঁহাদের দীক্ষা হয় তাহা তাঁহার ঘনিষ্ঠ গৃহী শিষ্যেরাও অবগত ছিলেন বলিয়া শুনি নাই। যোগেশচন্দ্র বসু প্রভৃতি একবার বণ্ডুলে ইঁহাদের কয়েকজনকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা হঠাৎ আসিয়া একদিন মধ্যেই হঠাৎ চলিয়া যান। ইঁহারা কেন আসিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে স্বামীজি বলেন, "পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল।"

যোগেশ বসু। কই পরীক্ষা হইতে ত দেখিলাম না।

স্বামীজি। (হাসিয়া) হইয়া গিয়াছে।

*ডক্টর সুরেশ দেব বলেন, তাঁহার মনে পড়ে তিনি যেন আরও অনেক বেশী সন্ন্যাসী শিষ্যের কথা স্বামীজির মুখে শুনিয়াছিলেন।

যোগীদের সবই অদ্ভুত। সদ্‌গুরুর লোকানুগ্রহব্রতও অতি দুশ্চর ব্রত ইহার জন্য তাঁহাকে কত নির্মাণচিত্ত দ্বারা ব্যাপার সাধন করিতে হয় স্থূলদর্শী আলোচকের তাহা বুদ্ধির অগম্য।

সন্ন্যাসীরা এক সময়ে তাঁহার নিকট অনেকে আসিতেন। আমি ইহাদিগকে দেখি নাই। আমার দীক্ষার পরে ইহাদের গমনাগমনের সংবাদও শুনি নাই, কাজেই ইহাদের সম্বন্ধে এই পুস্তকে বেশী কিছু বলিবার সুযোগ হইবে না। সেই জন্য প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা এই স্থানে বলিয়া রাখি। ব্যাপারটি গুরুভ্রাতা শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শ্রুত। শরৎ দাদা ও তাঁহার পিতা (ইদানীং পরলোকগত, কামাখ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি আবগারী বিভাগে দারোগাগিরি করিতেন) স্বামীজির অতি পুরাতন শিষ্য। ইহাদের নিবাস নদীয়া শান্তিপুরে। রায় বাহাদুর গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীও তথায়। শরৎদাদা বলিয়াছেন, গিরীন্দ্রদাদা একবার স্বামীজিকে একখানি বহুমূল্য শাল উপহার দেন। কয়েকদিন পরে গিরীন্দ্রদাদার গৃহেই স্বামীজির অবস্থানকালে কোথা হইতে কয়েকটি সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাদের বসিবার জন্য গিরীন্দ্রদাদার লোকজন-কর্তৃক একটি কম্বলাসন আনীত হইবার পূর্বেই স্বামীজি স্বীয় তক্তপোষ হইতে সেই নূতন শালখানি ফেলিয়া দেন এবং সন্ন্যাসিগণ কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া তাহা পাতিয়া তদুপরি শুধু উপবেশনই করেন নাই, তাহাদের সেবার্থে তামাক বা গাঁজা দেওয়া হইলে তাহা সেবন করিয়া সেই শালের উপরই কলিকা হইতে ছাই, গুল ইত্যাদি ঢালিতে থাকেন। এই বিসদৃশ আচরণে এবং উহা হইতে বহুমূল্য শালখানির যে দশা হইতেছিল তদ্দর্শনে রায় বাহাদুরের মনে কি ভাব হইয়াছিল তাহা অনুমান করা সহজ। গুরুকে শালখানি দিয়া তাঁহার মনে যদি কোনও রূপ গর্ব বা গৌরবের ভাব আসিয়া থাকে তবে ঐ ব্যাপারে তাহা চূর্ণ হইয়া থাকিবে। সন্ন্যাসীদিগের কোনও পরিচয় স্বামীজি দেন নাই। সাধারণতঃ কেহ সামান্য চট বা মাদুর ইত্যাদিতে বসিয়াও তাহাতে গাঁজা-তামাকের কলিকার গুল ঢালে না; সেইজন্য মনে হয় এটি স্বামীজি এবং তাঁহার জ্ঞানগঞ্জের গুরুভাইদিগের একটা খেলা। ঐশ্বর্যের জাঁকজমক সাধুদিগের চক্ষে কত তুচ্ছ তাহা রায় বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিবার বোধ করি প্রয়োজন ছিল।

খ্রীঃ ১৯১৯ সন লৌকিক হিসাবে স্বামীজির একটি দুর্বৎসর। ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে (বাং ২২শে পৌষ তারিখে) তাঁহার চিরারাধ্যা জননী রাজরাজেশ্বরী দেবী লোকান্তরগমন করেন এবং দশদিনের অশৌচ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ক্রমে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিষ্ণুপদ, কন্যা বিশ্বেশ্বরী ও অতিপ্রিয় খুল্লতাতপুত্র ইন্দ্রনাথও রাজরাজেশ্বরীর অনুগমন করেন। এত অল্পকালমধ্যে এক বাড়ীতে এতগুলি দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ—এই সময়ে য়ুরোপ হইতে এ দেশের সর্বত্র যে ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জার তরঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা বহুল অঞ্চলে এক মারাত্মক রকমের

নিউমোনিয়াকে সহকারী করিয়া মহামারীর রূপ ধারণ করে এবং ফলে ঘরে ঘরে বহুলোক মৃত্যুর কবলে পড়িতে থাকে। হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (যিনি বর্তমান সময়ে কাশীর বিশুদ্ধানন্দকানন আশ্রমে কার্যকারী সেবায়েতের পদে আছেন) এই সময়ে বণ্ডুলে ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, ঐ অঞ্চলে অনেক রোগীরই চিকিৎসার অবসর পাওয়া যাইতেছিল না; এমন কি শব শ্মশানে লইয়া যাইবার লোকেরও অভাব হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথের দেহই বাড়ীর বাহিরে দাহ করা হয়।

স্বামীজি পরমহংসোচিত নির্বিকার ভাবেই এই বিপজ্জাল গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি (কলিকাতা হইতে) মাতার মৃত্যুর পর গৃহে পৌছেন। অন্য দুর্ঘটনাগুলি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই ঘটিয়াছিল। হয়ত এগুলি তাঁহার স্থিতপ্রজ্ঞতার পরীক্ষারূপে আসিয়াছিল। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"—স্থিতপ্রজ্ঞের মন দুঃখেও উদ্বিগ্ন হইবে না, সুখেও কোনও স্পৃহা রাখিবে না। শুনিয়াছি (যদিও স্বামীজির স্বমুখ হইতে নয়) পরমহংসদশারও তিনটি স্তর স্বামীজির সম্প্রদায়ে অভ্যুপগত*; পরীক্ষা দিয়া ঐগুলি উত্তীর্ণ হইতে হয়। সর্বোচ্চ স্তরের ঊর্ধ্বে পরমপুরুষত্ব। পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি যদি পরীক্ষা হয় তাহা হইলে পরীক্ষার ভীষণতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বোধ করি এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, উহা তাঁহার সর্বোচ্চস্তরে উঠিবার সোপানরূপে তাঁহার গুরুকর্তৃক কল্পিত হইয়াছিল। দেখা যায় তিনি এই সময়ে স্থূলদেহে বণ্ডুলে থাকিয়া কাচা-পরা ছায়াদেহে কলিকাতা ভবানীপুরে যোগেশ বসু ও তৎপুত্র যতীশ বসুকে মুহূর্তের জন্য দর্শন দিয়াছিলেন। শোকে ঈষন্মাত্র মুহ্যমান হইলেও প্রিয় শিষ্যগণের সঙ্গে এই প্রকারের লীলাখেলা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইত না।

খ্রীঃ ১৯০৯ সন হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে বর্ধমান শহরে আসিয়া থাকিতেন। কখনও কখনও বাঁকুড়া শহরে, বা বাঁকুড়ার অন্তর্গত তেলিবেড়িয়া গ্রামে, ধানবাদে, গোমোতে, কুমারডুবীতে এবং পুরুলিয়ায় ভক্তিমান্ শিষ্যদিগের আগ্রহে দুই এক সপ্তাহ বা দুই এক মাসও অবস্থিতি করিতেন। ঝালদায়ও মধ্যে মধ্যে গিয়া

---

* মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।৪) "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" (ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলিয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইতরবিশেষ স্বীকৃত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য মুনির মতে ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে এই চারিটি শ্রেণী স্বীকার্য—(১) ব্রহ্মবিৎ (২) ব্রহ্মবিদ্বর, (৩) ব্রহ্মবিদ্-বরীয়ান্ ও (৪) ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে সাতটি যোগভূমি উল্লিখিত হইয়াছে যথা,—(১) শুভেচ্ছা, (২) বিচারণা, (৩) তনুমানসা, (৪) সত্ত্বাপত্তি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থাভাবিনী, ও (৭) তুর্যগা, ইহাদের মধ্যে বিদ্যারণ্য মুনির মতে প্রথম তিনটি ব্রহ্মবিদ্যার সাধনাবস্থার অন্তর্গত। চতুর্থভূমি ব্রহ্মবিদের, পঞ্চম ব্রহ্মবিদ্বরের, ষষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্বরীয়ানের এবং সপ্তম ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠের। কৌতূহলী পাঠক এই ভূমিগুলির বিস্তৃততর বিবরণ কাশীর দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত, "জীবন্মুক্তিবিবেক" গ্রন্থে ৩২১—৩৩০ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। স্বামীজির সম্প্রদায়ে পরমহংসগণ ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠের সমস্তরের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে সেই স্তরেই আবার তিনটি ভাগ স্বীকার্য।

থাকিতেন। এইরূপে এই সকল অঞ্চলে বহুক্ষেত্রে তাঁহার শক্তিপাতের * সুযোগ হয়। ইহার পর কাশীতে ও পুরীতে আশ্রম হইলে তথায়ও বৎসরে দুই চারি মাস কাটাইতেন। পুরীতে সাধারণতঃ ইষ্টারের (Easter) সময় যাইয়া রথযাত্রা পর্যন্ত থাকিতেন। একবার (১৯১৯ খ্রীঃ) অবিচ্ছেদে আট-নয় মাস ছিলেন। তাঁহার পুরীতে অবস্থানের সুযোগে বহু উড়িয়া ও উড়িষ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালী তাঁহার চরণ আশ্রয় করেন। শেষোক্তশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যে পুরীর জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে রায় সাহেব) শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও কটকের ডিষ্ট্রিক্ট্ এঞ্জিনিয়ার কুঞ্জবিহারী ঘোষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীশচন্দ্র ঘোষের ভায়রা ভাই ডিমলার রাজকুমার যামিনীবল্লভ সেনের দীক্ষাও পুরীতেই হয়। উহারা উভয়ে খ্রীঃ ১৯১৯ সনে পূজার সময়ে সস্ত্রীক দীক্ষিত হন। উড়িয়া শিষ্যগণের মধ্যে খ্যাতনামা কণ্ট্রাক্টার অনন্ত দাস, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় (পরে দেওয়ান) বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র, কটকের সরকারী উকিল ও আইনের অধ্যাপক (পরে রায় বাহাদুর) চিন্তামণি আচার্য এবং আরও কয়েকটি উকিল, ডেপুটি (পরে জিলা) ম্যাজিষ্ট্রেট্ বিশ্বেশ্বর পট্টনায়ক প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন এবং এখনও অনেকে আছেন। কাশীতেও পশ্চিমদেশীয় বহু শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার চরণ আশ্রয় করেন; তন্মধ্যে বিলাতফেরত ডাক্তার শোভারাম, সুপ্রসিদ্ধ রাজা মাধোলালের দৌহিত্র গিরিধারীলাল ব্যাস, পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মনোমোহন লাল, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জীবনশঙ্কর যাজ্ঞিক, লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হরগোবিন্দ দয়াল, ফৈজাবাদ কলেজের অধ্যাপক শ্যামবাহাদুর মাথুর, মুন্সেফ দেবীপ্রসাদ মেহেরোত্রা প্রভৃতির নাম এই স্থানে সাধারণভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে (মহামহোপাধ্যায়) গোপীনাথ কবিরাজ, সতীশচন্দ্র দে প্রভৃতির নাম ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্বামীজির অবাঙ্গালী শিষ্যদিগের মধ্যেও অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল। পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, বাঙ্গালী সাধুদিগের প্রতি কমই আকৃষ্ট হন। স্বামীজির পশ্চিমা শিষ্যগণ শুধু আকৃষ্ট হন নাই, শেষপর্যন্ত তাঁহার প্রতি তাঁহারা অসীম ভক্তিমান ছিলেন এবং এখনও আছেন।

এইরূপ বাঙ্গালী অবাঙ্গালী শত শত উচ্চ উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য লইয়া ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল তাঁহাকে নিত্য লীলা করিতে হইয়াছে। সাধুসন্তগণের বাহ্য জীবন সাধারণতঃ বৈচিত্র্যহীনই হয়, কেন না বাহ্য জগৎ অপেক্ষা মনোজগতেই তাঁহারা অধিক জাগরূক ও ক্রিয়াশীল থাকেন। ইহার মধ্যে স্বামীজিতে অধিক বিশেষত্ব হইতেছে—শেষপর্যন্ত ক্লান্তিহীন কঠোর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যগণের

* তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষার এক নাম শক্তিপাত।

হিত তাঁহার অতি বিচিত্র রকমের কৃপালীলা। বলিতে গেলে স্বীয় গুরুর াদেশে শিষ্যগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবার পর হইতে তাঁহার বাহ্য জীবন ঐ াচিত্র বিভূতি-বহুলা করুণাবরিষ্ঠা লীলা-পরিপাটি ব্যতীত আর কিছু নহে। াষ্যদিগের কল্যাণের জন্ম তিনি ছুরি দিয়া নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিয়াছেন, নজেকে পুনঃ পুনঃ রোগের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছেন, অবশেষে স্বীয় জীবনই ান করিয়াছেন। তাহাদিগকে যোগপথে আকৃষ্ট করিতে ও তাহাতে আস্থা ও বশ্বাস সহ নিয়োজিত রাখিতে তিনি অজস্র কত রকমের খেলাই প্রদর্শন করিতেন। াহার শিক্ষা ছিল লেবরেটরীর শিক্ষার মত। তিনি এমন কিছু বলিতেন না াহা প্রত্যক্ষদর্শনের যোগ্য নয় কিংবা যাহা তিনি প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিতে ানিচ্ছুক বা অসমর্থ ছিলেন। তাঁহার এই অনন্যসাধারণ শক্তিতে বিভূতি ভিন্ন ান্য কি নাম দেওয়া যায়? বিভূতির নামে শিহরিয়া উঠা অসম্যগ্-দর্শিতারই ক্ষণ। স্বামীজির জীবনকথা অবিকৃতভাবে বিবৃত করিতে হইলে বিবরককে এ বষয়ে প্রচলিত সংস্কার উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ডাক্তার জনসন লিয়াছেন, Sir, to leave things out of a book merely because people ell you they will not be believed, is meanness. * (লোকে বিশ্বাস রিবে না এইরূপ মত শুনিয়া পুস্তক হইতে কোনও সত্য বিষয় বর্জন করা মনের দ্রতারই পরিচায়ক।)

এই পুস্তকের ভূমিকারূপে স্বামীজির জীবনকথার যতটুকু বিবরণ অত্যাবশ্যক নে হইয়াছে এই পরিচ্ছেদে মাত্র ততটুকুই দেওয়া হইল। এখন প্রক্রান্ত বিষয়ের নুসরণ করা যা'ক!

পাঁচ

ই আশ্বিন (১৩৩৭ সাল) তারিখেই কাশী যাত্রা করা গেল। কিন্তু সশিষ্য মীজি যে ট্রেনে গেলেন সেটিতে নয়, দুই নম্বরের "পূজা স্পেশালে"। ফলে শীতে পৌঁছিতে অসম্ভব রকমের বিলম্ব এবং তজ্জন্য অবশ্য কিছু কষ্ট ও অসুবিধাও ল। শ্রীশ্রীগুরুদেব ঐ দিন বহু শিষ্যসহ সকালে কাশীতে পৌঁছিবেন বলিয়া হাতে যথাসময়ে তাঁহার ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য শ্রীযুক্ত গোপীনাথের ও কন্যা পূর্ব রাত্রিতেই আশ্রমে চলিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়া রাখি, গোপীনাথের র স্বাস্থ্য এই সময়ে ভাল না থাকিলেও, তিনি রন্ধনে সুনিপুণা এবং গুরুদেবের তি তাঁহার ভক্তিও অসীম, আর গুরুদেবও বহুবার অলৌকিক উপায়ে তাঁহার

* Boswell's Life of Johnson p. 262, Globe Edition.

জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এইসকল কারণে গুরুদেব বাহির হইতে কাশীতে পৌঁছিলে যথাসময়ে তাঁহার ভোগ প্রস্তুত করিবার ভার গোপীনাথের স্ত্রীই প্রায় সর্বদা সানন্দে ও সোৎসাহে গ্রহণ করিতেন এবং সশিষ্য ও সপরিজন গুরুদেবের সেদিনের সেবার ব্যয়ও গোপীনাথ বহন করিতেন। এদিন তাহাই হইয়াছিল, এবং আমার ভোজনের ব্যবস্থাও আশ্রমে হইয়াছিল। কিন্তু আমি যখন কাশীতে গোপীনাথের বাসায় পৌঁছিলাম তখন তিনি সপরিজন আশ্রমে। অবেলায় পৌঁছাতে সেদিন আশ্রমে যাইয়া প্রসাদপ্রাপ্তি অদৃষ্টে ঘটে নাই। আমি কিয়ৎকাল বিশ্রামপূর্বক বেলা প্রায় তিনটায় দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিহিত কোনও একটি ঘাটে গঙ্গাস্নান ও তৎপর শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরাদি দর্শন সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে বাহির হইয়া পড়িলাম।

শারদীয়া পূজার সময়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দশাশ্বমেধ ও তৎসন্নিহিত কয়েকটি ঘাট বিশেষপ্রকারেই উপভোগ্য হয়। এখানে ওখানে কীর্তন, কোথাও কথকতা, কোথাও পাঠ, কোথাও বৃদ্ধগণের (প্রায়শঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ক) সংলাপ, জলের উপরে মঞ্চে বা জলের সন্নিহিত সোপানে বসিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিদিগের সন্ধ্যাবন্দন, দলে দলে সুবেশ পুরুষ ও সুবেশা রমণীগণের আগমন ও বিচরণ, গঙ্গার আরতি ও সন্নিহিত সকল দেবালয় হইতে উত্থিত কাঁসর ঘণ্টাদির ঘনরোল— সবই যেন তৎকালের জন্য একটা অপার্থিব লোকের অনুভব আনিয়া দেয়। "স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা"—মনে হয় যেন স্বর্গলোকের একটা টুকরা খসিয়া ভূতলে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি পূর্বে কয়েকবার এ দৃশ্য দেখিলেও উহারই আকর্ষণে, বিশেষতঃ গোপীনাথ বিকাল পর্যন্তও বাসায় না ফিরিয়া আসাতে, অন্য দিকে না গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটেই গেলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গোপীনাথের সাক্ষাৎ পাইলাম। দীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা সেদিন বেশী কিছু হইতে পারিল না; গোপীনাথ আহ্নিক করিতে গেলেন; আমি ভোজনান্তে ক্লান্ত দেহে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন (১২ই আশ্বিন) সপ্তমী পূজা। গোপীনাথকে বলিলাম, বাবা বলিয়াছিলেন সপ্তমী বা নবমী পূজার দিন দীক্ষা হইতে পারিবে; কাল অত দেরীতে পৌঁছাতে অদ্য দীক্ষার কথাই উঠিতে পারিল না; এখন বোধ করি too late (অসময়)। গোপীনাথ 'তাহাই ঠিক' বলিলেন। আমি বলিলাম, নবমী পূজার দিন যাহাতে হইতে পারে সেই ব্যবস্থা কর।

গোপীনাথ বিকালে বাবার কাছে চলুন। তাঁহাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ দিন স্থির থাকিলে কাল সব জিনিষ কিনিয়া বিকালে আশ্রমে দিয়া আসিতে হইবে।

গোপীনাথ দীক্ষা ও সাধনাদি সম্বন্ধে অদ্য আর বেশী কিছু বলিলেন না

শুধু কহিলেন, "দীক্ষা হইয়া যাক্ তার পর ঐ বিষয়ে বলিব। এখন সব ভাসা-ভাসা লাগিবে।" গোপীনাথের কথায় এইমাত্র জানিলাম দীক্ষার সময় মন্ত্র ছাড়া স্বামীজি একটি বস্তু দেন যাহার সহযোগে প্রত্যহ দুইবার একটি ক্রিয়া করিতে হয়। ঐ ক্রিয়া লোকলোচনের অন্তরালে বদ্ধ গৃহে কর্তব্য। গোপীনাথ বলিলেন, ক্রিয়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর নির্দিষ্ট থাকিলে এবং তাহাতে অন্য লোক বেশী যাতায়াত না করিলেই ভাল হয়। উহাতে ঐ গৃহে বায়ু (গোপীনাথ বোধ করি পরমাণু বলিয়াছিলেন, কেন না বাবা ঐ শব্দটিই এরূপ স্থানে অধিক ব্যবহার করিতেন) বিশুদ্ধ থাকে। তাহাতে ক্রিয়া ভাল হয়। গোপীনাথের কথা শুনিয়া দুঃখিতই হইলাম; কেননা আমার কলিকাতার বাসায় সে সময় আহ্নিকের জন্য একখানি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। কিছুকাল পরে তাহা করিতে পারিয়াছিলাম।

বেলা তিনটায় গোপীনাথ (ছুটীর দিন হইলেও) অকস্মাৎ একটা অতি প্রয়োজনীয় সরকারী কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং আমাকে একাকীই আশ্রমে যাইতে হইল। গিয়া স্বামীজিকে একতলার বসিবার ঘরেই পাইলাম। প্রণাম করিলাম; তিনি আপনা হইতেই পথক্লেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। একঘর লোক; সকলে আমাদের কথা শুনিতেছে; তাই দীক্ষার কথা নিজ হইতে উত্থাপন করিতে একটু সঙ্কোচবোধ করিতেছিলাম, যদিও অবশ্য উহা আমারই কর্তব্য ছিল। বাবাজি বোধ করি আমার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন; তাই দুই-চারিটি কথার পর দয়া করিয়া নিজ হইতেই বলিলেন, দীক্ষার দিন কবে ঠিক করা হয়েছিল?

আমি। বাবা বলিয়াছিলেন সপ্তমী বা নবমী পূজার দিন। কাল অসময়ে আসিয়া পৌঁছাতে আজ দীক্ষা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল। বাবার যদি অনুমতি হয়, তবে পরশুর জন্য প্রস্তুত হইতে পারি।

বাবা। তাই হবে।

এই কথা বলিয়া তিনি পার্শ্বেই স্থিত একখানি দিন-পঞ্জিকা হাতে তুলিয়া লইয়া দিনটা একবার দেখিলেন। আমি তখনও জানি না যে, প্রত্যূষে দীক্ষা দেওয়াই তাঁহার নিয়ম; তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "দীক্ষার সময় কতক্ষণ আছে?"

বাবা। সমস্ত দিনই সময় আছে।

আমি। যে সমস্ত জিনিস আবশ্যক হবে তাহা গোপীনাথ জানে ত?

বাবা। হাঁ, সে সব জানে। সেই সব ঠিক করিয়া দিবে।

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, "বাবা, শুধু মন্ত্র দিলে হবে না, যাতে আমার কিছু হয় তাও করে দিতে হবে।"

বাবা। কর্ম কর; কর্ম করলেই সব হবে।

এমন সময় গোপীনাথ আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, বাবা পরশু দিন স্থির করিয়া দিয়াছেন।

গোপীনাথকে আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম আমার স্ত্রীও দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সংসারে অন্য স্ত্রীলোক না থাকায় তার পক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া কাশীতে আসা অসম্ভব। বাবাকে গোপীনাথ সে কথা বলাতে বাবা বলিলেন, "তার দীক্ষা পরে হইবে ; কাশীতে না আসিতে পারিলে কলিকাতায়ও হইতে পারিবে।" আমি আনন্দিত হইলাম।

বাবা বলিলেন, "কাল পরশু দুইদিনই এখানে প্রসাদ পাবে।"

আমি। যে আজ্ঞা।

বাবা গোপীনাথকেও ঐ কথা বলিলেন। গোপীনাথের সপরিজন নিমন্ত্রণ।

বাবা আমাকে বলিলেন, "কাল কুমারী-ভোজন হবে। ওটা এখানে প্রায়ই হয়। কাল একটু সকাল সকাল এস, দেখতে পাবে।"

আমি। ক'টায় কুমারী-ভোজন হবে ?

বাবা। এই সাড়ে আটটা ন'টায়। আজও হয়েছে, কাল পরশুও হবে। ঐসব কাপড় দেখছ ও সব কাল কুমারীদের দেওয়া হবে। (আমরা যে ঘরে বসিয়াছিলাম তাহারই একপ্রান্তে স্তূপাকারে অনেকগুলি লালরঙের শাড়ী ছিল।)

স্বামীজি উঠিয়া গেলেন। শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে নানা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কতক আমার কাণে আসিল, বেশীর ভাগই আসিল না। একটি ভদ্রলোককে গোপীনাথ বলিলেন, "আপনার সে হীরাখানি আছে ত ?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, আছে।" আমাকে দেখাইবার জন্য গোপীনাথের আগ্রহ বুঝিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, "আপনি আর অক্ষয় বাবু আসুন।"

আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পার্শ্বের একটি প্রকোষ্ঠে গেলাম। তিনি তাঁহার একটি জামার পকেট হইতে একটি হীরা-বসান অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া দেখাইলেন। আমি হাতে নিয়া তাহা দেখিলাম। হীরকসম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নাই, তবে পাথরটি বেশ বড় দেখিলাম এবং তাহাতে কোনও খুঁৎ দেখিতে পাইলাম না—এই পর্যন্ত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হীরাটি প্রস্তুত হইতে আপনি দেখিয়াছিলেন ?"

তিনি। দেখিয়াছিলাম বই কি ! পুরীতে বাবার সঙ্গে আমরা কয়েকজন বেড়াইতেছিলাম। ঐ সময়ে সমুদ্রতীরে একখানি রঙ্গীন রকমের পাথর দেখা যায়। বাবা উহা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, এটি দিয়া একখানি হীরা তৈয়ারী করা যায়। কে চাও ? ৭৫০৲ টাকা দিতে হইবে। আমি বলিলাম, আচ্ছা, আমি দিব। বাবা পাথরখানি দুইটি আঙ্গুলের মধ্যে ধরিয়া এইভাবে (ডাহিনে বামে) হাত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং মিনিটখানেক পরে বলিলেন, "দেখ পাথরটি



মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

বেশ নরম হয়ে গিয়েছে।" আমি হাতে নিয়া দেখিলাম, সত্যই পাথরটি বেশ নরম হইয়াছে। তারপর বাবা আবার সেটি হাতে নিয়া পূর্বের মত হাত নাড়িতে লাগিলেন। আবার মিনিটখানেক পরে বলিলেন, "দেখ কেমন সুঘ্রাণ হয়েছে।" সকলে শুঁকিয়া দেখিলাম, সত্যই খুব সুঘ্রাণ। আরও কিছুক্ষণ হাত চালাইবার পর পাথরটি সাদা হইল, তাহাও দেখাইলেন। আরও চালনার পর সুন্দর face (পল) কাটা হীরা হইয়া গেল। বাবা সেটি আমাকে দিলে আমি বলিলাম, "এটি আমি আংটিতে বসাইয়া হাতে পরিব।" বাবা বলিলেন, "আর একটু আগে বলিলে একেবারে আংটিতে বসানই পাইতে পারিতে।"

ভদ্রলোক আরও বলিলেন, "এ আংটি আমি সর্বদা হাতে পরি না ; আহ্নিক করার সময় পরি। বেশী লোককে এটা দেখিতেও দেই না।"

উপস্থিত একজন বলিলেন, "হীরাখানি বহুমূল্য"। আর একজন বলিলেন, "ওটা অমূল্য বস্তু। হীরারূপে ওর মূল্য যাচাই চলে না" ; কথাটাতে আমার মনও সায় দিল।

ইতঃপূর্বে ঐ দিনই বিজয়দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম, বাবা বিলাসীপাড়ার (আসাম) রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর একান্ত আগ্রহে তাঁহারই মুঠের ভিতর একখানি সাদা রুমালকে কেবল দৃষ্টি দ্বারা মধ্যে সিংহবাহিনীর মূর্তি সহ চারি কোণে নানা পুষ্পের চিত্রযুক্ত রুমালে পরিণত করিয়াছিলেন। গোপীনাথ বলিয়াছিলেন, "আজকাল বাবা ঐ সকল অলৌকিক কার্য করিতে হইলে পূর্বে বলেন, কুমারী-ভোজন যদি করাও তবেই ও-সব করিব।"

আমি। কুমারী-ভোজন কেন ?

গোপীনাথ। এসব কাজ করিবার জন্য বাবার এখন পূর্ববৎ অনুমতি নাই। শিষ্যদের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য সময় সময় করা যায়। তার জন্য দণ্ড ঐ কুমারী-ভোজন।

আমি। একটি কুমারী-ভোজন করাইলেই চলে ?

গোপীনাথ। না, একটিতে কিছুই হয় না। খুব কম পক্ষে বার জন। সাধারণতঃ ৫০।১০০।২০০ এরূপ ভোজন করাইতে বলেন।

আমি। কুমারী-ভোজনে কত লাগে ?

গোপী। কুমারী প্রতি সাধারণতঃ এক টাকা। যদি সবস্ত্র ভোজনের কথা বলেন তাহা হইলে তদনুরূপ বেশী লাগে।

এই কথাগুলি পূর্বে শুনিয়াছিলাম বলিয়া আমি পূর্বকথিত ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সাড়ে সাত শত টাকা দিয়া বোধ করি কুমারী-ভোজন হইয়াছিল ?"

তিনি। না, ও টাকাটা সবই সেখানে (অনুমানে বুঝিলাম, আবার গুরুস্থানে) পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

আমি ভাবিলাম, হয়ত সেখানে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় বাবা স্বয়ং যাচি[illegible] হীরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আশ্রম হইতে ফিরিবার পথে গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলা[illegible] উক্ত ভদ্রলোকটি কটকের ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার; নাম—কুঞ্জবিহারী ঘো[illegible] বি. এ., বি. ই.।

পরদিন মহাষ্টমী। গঙ্গাস্নান ও অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর-দর্শনে আমার একটু বিল[illegible] হইয়া গেল। ঐ দিন ঐ দুই দেব-মন্দিরে দর্শনার্থীর খুব ভিড় হয়। আমা[illegible] আশ্রমে পৌঁছিতে বেলা দশটা হইয়া গেল। গোপীনাথ ও তাঁহার পরিবার[illegible] সকলে তৎপূর্বেই আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমি আসিয়া দেখিলাম কুমারী[illegible] নূতন পাওয়া রঙীন শাড়ী পরিয়া ভোজনে বসিয়াছেন এবং ভোজনও প্রায় শে[illegible] হইয়া আসিয়াছে। প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ বারান্দা কুমারীতে ভর্তি। কুমারীরা তি[illegible] সারিতে বসিয়াছিলেন। অন্যত্র কয়েকজন সধবা ও বিধবা স্ত্রীলোকও খাইতেছে[illegible] অন্য এক গৃহে কয়েকজন ব্রাহ্মণকুমার ভোজনে বসিয়াছেন। উঠানের একদি[illegible] বহু ভিখারী ভোজনের প্রত্যাশায় বসিয়া বা দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের ম[illegible] অনাহূত কয়েকজন ব্রাহ্মণও আছেন। সধবা, বিধবা এবং কুমারগণ এবং কুমা[illegible] দেরও অধিকভাগ অনাহূত। শুনিলাম ঐ দিন মোট ১২১টি কুমারী ভো[illegible] করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কাপড় পরিতে পারেন তাঁহারা সক[illegible] কাপড়ও পাইয়াছেন। অর্থাৎ অতিশিশু কুমারীগণ কাপড় পান নাই। দক্ষিণা[illegible] প্রতি কুমারীর একটি রূপার সিকি। সধবা ও বিধবাদিগকে জনপ্রতি এক আ[illegible] কুমারগণকে দুই পয়সা করিয়া দেওয়া হইল।

কুমারীমাতাদের ভোজনের সময় বাবাজী স্বয়ং উঠানে দাঁড়াইয়া পরিদ[illegible] করিতেছিলেন। পরিবেষণ কার্য বেশ সুশৃঙ্খল ও কর্মীদিগের আন্তরিকতায় সমু[illegible] বোধ হইয়াছিল। তত্ত্বাবধানাদি-ব্যাপারে একটি ভদ্রলোকের কর্মতৎপর[illegible] বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইঁহাকে "রায় সাহেব" বলি[illegible] সম্বোধিত হইতে শুনিলাম। গালভরা দাড়ি, পরণে তসরের ধুতি, গায়ে গর[illegible] ফতুয়া, চোখে মুখে দায়িত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতার ছাপ। গোপীনাথকে প্রশ্ন ক[illegible] জানিলাম, উঁহার নাম রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সরকারের [illegible] ডিপোর ম্যানেজার। অল্পক্ষণ পরেই রায় সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হইলে দেখি[illegible] তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক, এবং কৃতকর্মাও বটেন। বলিলেন, বস্ত্রগুলি [illegible] বঙ্গলক্ষ্মী মিল হইতে ফরমাস দিয়া এবং ছোপাইয়া (রঞ্জিত করিয়া) আনিয়া[illegible] কুমারীমাতারা প্রত্যেকে এক একখানি ভাল সতরঞ্চির আসনে বসিয়া ভো[illegible] করিতেছিলেন। রায় সাহেব বলিলেন ঐগুলিও তিনি পূর্বে কোনও সময়ে [illegible] ভাণ্ডার দিয়া তৈয়ার করাইয়াছেন।

গোপীনাথ আমাকে বলেন, রায় সাহেবের বেতন মোটা না হইলেও তিনি দেন
ণ। আশ্রমের বড় লোহার ফটক উঁহারই ব্যয়ে হইয়াছে। সতরঞ্চির
াসনগুলি ও আশ্রমের বড় বড় পাপোষগুলিও উঁহারই প্রদত্ত। আশ্রমের অনেক
াজেই তিনি অগ্রসর হন এবং তৎপরতার সহিত সম্পাদন করেন। কলিকাতা
ইতে আসিয়া ইনি আশ্রমেই আছেন এবং দীক্ষার্থীদের সুবিধার্থ কয়েকটি তামার
াগদণ্ড প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছেন। গোপীনাথ বলিলেন, "ইহাতে আপনার
বিধা হইয়াছে, নচেৎ কাঠ দিয়া প্রস্তুত করাইতে হইত। ব্যবহারের পক্ষে রায়
াহেবের আনীত দণ্ডগুলিই ভাল, কেন না উহা ইচ্ছামত ছোট বড় করা যায়।
াহাতে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে উহা ছোট একটা বাক্সেও পুরিয়া
ওয়া যায়।"

যোগদণ্ড কি বস্তু ও তাহার কি ব্যবহার তাহা তখনও আমি জানি না।
াপীনাথকে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "উহা বাবার মুখে শুনিবেন।"

সন্ধিপূজা হইল। দেবতা দর্শন করিলাম; অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তি। পৌরোহিত্য
রিতেছিলেন কলিকাতার পূর্বদৃষ্ট বৈদিক হরমোহন ভট্টাচার্য। মন্দির মধ্যে
ার্ধাকৃতি একটি বেদীর এক কোণে দুর্গামূর্তি। অপর কোণে গোপাল। গোপাল
কাতেই আশ্রমে জন্মাষ্টমীর উৎসব হয়। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ঐ
সব উপলক্ষে স্বামীজি কাশী আসিয়াছিলেন; এখানকার গ্রীষ্ম সহ্য না হওয়ায়
সবের দুই-চারিদিন পরেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

বেদীর মধ্যভাগে ছোট-বড় কুড়ি-বাইশটি বাণলিঙ্গ স্থাপিত আছেন দেখিলাম।
ীর গায়ে স্থাপয়িতাদের নাম লিখিত আছে। মধ্যস্থলের লিঙ্গটি অপেক্ষাকৃত
; ঐটি স্বামীজির স্থাপিত। তাঁহার পিতৃনামানুসারে উহার নাম দেওয়া
য়াছে অখিলেশ্বর। গোপীনাথ-কর্তৃক স্থাপিত শিবের নাম তাঁহার মাতৃনামানুসারে
দেশ্বর। ঐরূপ প্রত্যেকটি লিঙ্গের এক একটি নাম আছে, এবং সেই নাম
খপূর্বক প্রত্যহ পূজা হয়।

গোপীনাথের সঙ্গে দেবতার স্নানজল (চরণামৃত) এবং কুমারীমাতাদের
ঞ্চিৎ পাত্রাবশেষ পাইয়া হলঘরে আসিয়া স্বামীজির চরণপ্রান্তে বসিলাম।
ক্ষণ তাঁহার ভোগ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে (যতদূর মনে পড়ে) বেলা
টায় তাঁহার ভোগ হইত এবং সন্ধ্যাহ্নিকের ন্যায় ইহাতেও ঈষন্মাত্র বিলম্ব হইতে
রিত না। কুমারী-ভোজন হইলে কোনও একটি কুমারীর পাত হইতে কিঞ্চিৎ
াদ তুলিয়া স্বামীজির ভোজনকালে দেওয়া হইত। কুমারীসেবাটা তাঁহার
টা আচার-মাত্র ছিল না। তাঁহার চক্ষে কুমারী জগদম্বারই প্রতীক। অনেকদিন
র একদা কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "স্বয়ং জগদম্বা ভিন্ন জগতে
বার কুমারী কে আছে রে বাপু?" অর্থাৎ নিঃসঙ্গা আদি শক্তিই প্রকৃত

কুমারী। কুমারীসেবার প্রসঙ্গ পাঠক পরে আরও শুনিবেন। বাবাজীর কা
কুমারীদের সাত খুন মাপ ছিল; তাঁহারা আশ্রমের ফুলগাছের ফুল, লেবুগা
লেবু, আতাগাছের কাঁচা আতা নির্ভয়ে এবং যথেচ্ছ ছিঁড়িতেন। শিষ্যদি
কুমারী কন্যারাই অবশ্য এইসব করিতে বেশী সাহস পাইতেন; তবে বাপ-মা
দেখিলে অবশ্যই তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন। স্বামীজির কাছে কুমারীরা অ
আবদারও করিতেন এবং তিনিও অনবরত কাহারও বাহুতে, কাহারও কাপ
কাহারও শিশিতে, কাহারও হাতের গন্ধহীন ফুলে অঙ্গুলিস্পর্শমাত্র দ্বারা গন্ধ দিতে

এই সময়ে পুরোহিত হরমোহন ভট্টাচার্য আসিয়া দশ-বারটি টাকা স্বামী
তক্তপোষের উপর রাখিয়া বলিলেন, ঐদিন দেবীর প্রণামীরূপে ঐ টাকা
পাওয়া গিয়াছে।

বাবা বলিলেন—বিগ্রহের প্রণামী তোমারই প্রাপ্য।

ভট্টাচার্য। দেবী আপনার। প্রণামী আমার কি করিয়া হইবে?

ভট্টাচার্য টাকাগুলি নিলেন না। তাঁহার নির্লোভতা প্রশংসনীয় মনে হই
ভট্টাচার্যকে আশ্রমে অনেকে "বৈদিকদা" বলেন, শুনিলাম; যদিও বোধ
তিনিই একমাত্র বৈদিক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন না। অতঃপর সংক্ষেপের জন্য
পুস্তকে ঐ ভাবেই তাঁহার উল্লেখ করা যাইবে। পরে দেখিয়াছি, পূজা,
চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি কার্যে বৈদিকদা'র দক্ষতা অসাধারণ। বংশের ধারানুস
গুরুতা ব্যবসায়ও ইঁহার ছিল। স্বামীজি ইঁহাকে এবং গুরুতা-ব্যবসায়ী আ
অনেককে কৌলিক প্রথানুসারে দীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

স্বামীজির পদপ্রান্তে বিলাসীপাড়ার রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে দেখিলা
বয়সে যুবক, সুরূপ ও সুবেশ।

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্॥

সেইজন্য ইঁহার ধর্মবিষয়ে অনুরাগ দেখিয়া ও শুনিয়া আমার খুব ভালই
হইয়াছিল। ইনি পূর্ববৎসর বহুব্যয়ে বহু শিষ্যসহ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে স্পেশাল
কলিকাতা হইতে বিলাসীপাড়া নিয়া সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিম
প্রত্যেক গুরুভ্রাতা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে* গিয়াছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হ
হাতী-ঘোড়ার শোভাযাত্রা করিয়া গুরুকে গৃহে নেওয়া হইয়াছিল। অতিথি
সেবার ব্যবস্থার মধ্যে ছিল প্রত্যেকের জন্য নূতন তক্তপোষ, নূতন শয্যা,
মশারি ইত্যাদি এবং প্রত্যহ ৮০।৮৫ প্রকারের ব্যঞ্জনযোগে ভোজন। দীক্ষার
কয়েক বৎসর ইঁহাকে পূজার সময় কাশীতে ও অন্য সময়ে কলিকাতায় গুরুদে

* বর্তমানে এই দ্বিতীয় শ্রেণী অবলুপ্ত।

বস্থান কালে প্রত্যহ তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত দেখা যাইত এবং সাধারণতঃ
াারই মোটরগাড়ীতে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন।

বেলা প্রায় ১টায় প্রসাদ পাইলাম। বহু শিষ্য প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিলেন;
তক কাশীবাসী, বাকী সব বাহির হইতে আগত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বড়
রান্দার পূর্বদিকের পংক্তি ব্রাহ্মণ শিষ্যদের ও পশ্চিমদিকের পংক্তি অপর শিষ্যদের
সবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বরাবর তাহাই নিয়ম। শিষ্যেরা খুব আনন্দ করিয়া
ইলেন। আমি নূতন লোক, প্রায় সকলেরই অপরিচিত। ইঁহাদের আনন্দে
থা যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রসাদ পাইতে পাইতে ইঁহাদের
নন্দ ও কথাবার্তায় পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাব দেখিয়া খুব প্রীতিলাভ
রিলাম। আর দেখিলাম ছোট-বড় সকলেই সকলের "দাদা"। আমার এ
ভিজ্ঞতাটিও নূতন।

ভোজনান্তে সকলে গুরুদেবের কাছে আসিয়া তাঁহার হাত হইতে পান প্রসাদ
এলাচির গুঁড়া লইলেন; কেহ কেহ জরদাও পাইলেন। স্বামীজির পার্শ্বেই
টা বড় কৌটায় সাজা ও ছেঁচা পান থাকে, আর কতকগুলি কৌটায় থাকে
াচির গুঁড়া, জরদা, পানমশলা ইত্যাদি। স্বামীজি মধ্যে মধ্যে ছেঁচা পানের
একটি গুলি নিজ মুখে ফেলিয়া দেন। শিষ্যেরা বৃদ্ধ হইলে ছেঁচা পান প্রসাদ
া, অন্য সকলে এবং বাহিরের আগন্তুক কেহ আসিলেও সাজা পান এবং জরদা
এলাচির গুঁড়া প্রসাদ পান। এই নিয়ম বরাবর ছিল।

স্বামীজি কোনও কালেই—প্রায় ২২ বৎসর পাহাড়ে-জঙ্গলে কাটাইলেও—
কা সেবন করেন নাই। তবে গুরুগ্রায় ও বর্ধমানে থাকিতে তামাক খুব
তেন—এমন কি দিনে ২০/২১ ছিলিম। বর্ধমানে মুন্সেফ, পরে সবজজ,
দ্রনাথ ঘোষ গয়া-প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত তামাক ২২টি কলিকাতে স্বহস্তে
ায়া তাহার উপর টীকা দিয়া একটি কাঠের ফ্রেম রাখিয়া দিতেন। ঐ
কাগুলির একটির পর একটিতে আগুন দেওয়া হইত। ঐ ভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত
ত। পরে বর্ধমানে থাকিতেই স্বামীজি একদিন হঠাৎ বলিলেন, "সেখান
নগঞ্জ) হইতে আমার তামাক খাওয়া বন্ধ করিয়া দিল গো"। সেই মুহূর্ত
ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর এক ছিলিম তামাকও সেবন করেন নাই।
ভ্যস্ত দৈনিক বহুবার স্নানও ঐ কারণে একদিন হঠাৎ চিরতরে বন্ধ করেন।
াকসেবন ও স্নান বন্ধের জন্য কোনও দিন তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও আপশোষ
তে বা অসুবিধা হইতেছে এরূপ বলিতে শুনা যায় নাই। তাঁহার আহার্য
সম্পূর্ণরূপে ঝাল-বর্জিত এবং (প্রসাদ মাথায় থাকুন) পাচকের দক্ষতাগুণে
সর্বস্বাদ-বর্জিত। শেষ দিকে অন্নাহার অল্পই করিতেন, প্রায় সুজির রুটিই
ছিল। তরকারীর মধ্যে উচ্ছে, পটোল, ওল, মানকচু, কাঁচা পেঁপে, কাঁকরোল
হেলেঞ্চা, পলতা ইত্যাদি দুই এক প্রকারের শাক—সাধারণতঃ সেবায় লাগিত।

শনিবার ও মঙ্গলবারে পোড়া কিছু (বেগুন পোড়া, পেঁপে পোড়া ইত্যাদি) খাইতেন। পূর্বে শিষ্যগৃহে মৎস্যও গ্রহণ করিতেন, আশ্রমে কখনও মৎস্য আসি না। যে সময়ের কথা হইতেছে তাহার বহুপূর্বেই মৎস্যও বর্জিত হইয়াছিল শিষ্যদিগের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ ছিল না।

সে যাহা হউক, পানপ্রসাদ পাইয়া দুই-চারিজন শিষ্য (বোধ করি ধূমপানে জন্য) অন্যত্র চলিয়া গেলেও, অধিকাংশ শিষ্যই গুরুসকাশে বসিয়া রহিলেন। সকলে মুখেই বেশ একটা তুষ্টির ও তৃপ্তির ছায়া দেখিয়া আমার খুবই ভাল বো হইতেছিল। শিষ্যগণের পরস্পরের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ চলিল এবং গুরুদেবও তাহাদে মধ্যে মধ্যে যোগ দিলেন। আমি নূতন দীক্ষার্থী, সুতরাং গুরুদেবের মহিমার ক শুনিতে স্বভাবতঃ আগ্রহান্বিত। সেই জন্যই শ্রীযুক্ত গোপীনাথের অনুরোধে শ্রীযু নৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, তাঁহার বিলাসীপাড়ার বাড়ীতে তাঁহারই হাতের মুঠে ভিতরে একখানি সাদা সূতীর রুমাল কি প্রকারে জগদ্ধাত্রী-মূর্তি সমন্বিত রেশ রুমালে পরিণত হইয়াছিল তাহা বলিলেন। রুমালের চিত্র তাঁহারই ফরমায়ে মত হইয়াছিল। স্বামীজি মুষ্টিবদ্ধ হস্তের দিকে দৃষ্টি দ্বারাই উহা করিয়াছিলে শুনিলাম।

নৃপেন্দ্র চৌধুরীর কথা শেষ হইবার পূর্বেই আর একটি শিষ্য আসিয়া গুরুদেব প্রণাম করিয়া পানপ্রসাদ লইয়া আমার পার্শ্বেই বসিলেন। বয়স চল্লিশ-একচল্লি বৎসর হইবে; নগ্ন সুপরিপুষ্ট দেহ, পরিধানে গরদের ধুতি, মুখখানি হাসিমাখা নাম শুনিলাম লিচু—ভাল নাম পরে শুনিয়াছি মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়*। ডাকনা আশ্রমে প্রচলিত। লিচু বাবু বলিলেন, "বাবার কথা হচ্ছিল বুঝি? আম বাড়ীতেও বাবার অনেক লীলা হয়েছে।"

তিনি বলিতে লাগিলেন—তাঁহার দীক্ষার অল্পদিন পরের কথা; সন্ধ্যা উর্ত্ত হইবার অল্পপরে তাঁহার স্ত্রী (বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর) তেতলার ছাদের এ পার্শ্বে আহ্নিকের ঘরে যাইতেছিলেন। ছাদে অন্য লোক ছিল না বলিয়া তি ভূতের ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন—ভূতের ভয়টা তাঁহার একটু বে মাত্রায়ই ছিল। সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত পৌঁছিয়া ছাদে পা বাড়াইতে পারিতেছিলে না, শরীর কাঁপিতেছিল। হঠাৎ তিনি দেখেন সম্মুখে বাবা। বাবা বলিলে "কি মা, ভয় করছে? ভয় কি? এস আমি তোমাকে পূজোর ঘরে দিয়ে আসি এই বলিয়া তিনি বধূটির হাত ধরিয়া তাহাকে পূজার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয় অন্তর্ধান করিলেন। তদবধি তাঁহার ভূতের ভয় একেবারে ভাঙ্গিয়াছে।

* স্বামীজির রামেশ্বর সেতুবন্ধযাত্রা-প্রসঙ্গে ইঁহার নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯১৫ (খ্রীঃ) ২০ বৎসর বয়সে ইঁহার দীক্ষা হয়। দীক্ষার কয়েক মাস পরেই তিনি গুরুদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যান।

আর একবার লিচুবাবুর স্ত্রী আক্কেল দাঁত উঠিবার যাতনায় বড় কাতর হইয়াছিলেন। বাবা তখন কলিকাতায়, ভবানীপুরে। লিচুবাবুদের বাড়ীও ঐ পল্লীতে! বেদনা অসহ্য হওয়ায় লিচুবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বাবার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "তুমি গিয়া বাবাকে আমার কথা বল; যদি তিনি দয়া করিয়া ঔষধ দেন তবে নিয়া আসিও।" তখন সকাল বেলা। লিচুবাবু বাবার কাছে আসিয়া প্রণাম করিলেন; বাবা বলিলেন, "কি গো, সব ভাল ত?"

লিচু। আজ্ঞা হাঁ বাবা। (আসল কথাটা খোলসা করিয়া বলিতে তাঁহার একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।)

বাবা। বৌমা কেমন?

লিচু। আজ্ঞে, বাবা, তার আক্কেল দাঁত উঠছে; বড্ড ব্যথা; দাঁতের গোড়া, গাল ইত্যাদি ফুলে উঠেছে।

বাবা। একটা ডাক্তার ডেকে মাড়িটা চিরে দাও।

লিচুবাবু বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "বাবা দাঁতের মাড়ি চিরে দিতে বল্‌লেন। এ বেলা ত হবে না, ও বেলা অফিস থেকে এসে যা হয় করা যাবে।"

অফিস হইতে ফিরিয়া লিচুবাবু দেখেন স্ত্রী দিব্য সুস্থ। শুনিলেন, দাঁতের যাতনায় তিনি শিশু মেয়েটিকে বড় যায়ের কাছে দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া শুইয়াছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা। হঠাৎ দেখেন সম্মুখে বাবা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "কি মা, বড্ড কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা দেখি।" এই বলিয়া নিজের আঙ্গুল তাহার মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া মাড়িটা একটু ঘসিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লিচুবাবুর স্ত্রী ঘুমাইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত পরে জাগিয়া তিনি ভাবিলেন, বাবার হাতে ত মুখের লালা লাগিয়া গিয়াছে, হাত ধোয়াইতে হইবে; কিন্তু বাবা কোথায়? ঘর যেমন বন্ধ করিয়া তিনি শুইয়াছিলেন তেমনি ভিতর হইতেই বন্ধ আছে।

লিচুবাবু বিবরণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গুরুর কাছে গেলেন।

বাবা। বৌমা কেমন গো?

লিচু। বাবা, আপনি নিজে গিয়ে ভাল করে দিয়ে এসেছেন।

বাবা। হ্যাঁ গো, বেটি বড্ড ডাকাডাকি কর্‌ছিল।

উক্ত ঘটনার পূর্বে একবার বাবা লিচুবাবুর স্ত্রীকে পিত্ত বা অম্ল-শূল বেদনা হইতে মুক্ত করেন। ইনি তখন মাঝে মাঝেই ঐ বেদনায় কষ্ট পাইতেন। ঐবার লিচুবাবু বাবাকে গিয়া বেদনার আক্রমণের কথা বলিলে বাবা পার্শ্বস্থিত এক টুকরা কাগজের কতকটুকু ছিঁড়িয়া লইয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে কবিরাজদের বড়ি পাকাইবার কায়দায় পাকাইতে লাগিলেন। ঐরূপে অল্পক্ষণমধ্যে চারিটি চাকতি (tablet) তৈরী হইল, দেখিতে অবিকল ডাক্তারী tablet এর মত। বাবা বলিলেন, এই চারিটি বড়ি চারিদিন সন্ধ্যাকালে জলের সঙ্গে গিলিয়া খাইতে

দিও। তাহাই করা হইয়াছিল। তাহাতেই রোগের উপশম হয়—আর হয় নাই।

সব শিষ্যই শুনিলেন, এবং স্বামীজি যে ঐ ভাবে আরও কোনও কোনও শিষ্যকে ঔষধ দিয়াছেন এ কথাও কেহ কেহ বলিলেন। স্বামীজি সবই শুনিতেছিলেন তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ওসব এখন ছেড়ে দিয়েছি। যোগ-জ্যোতিষীও আর করি না।"

আমি। যোগ-জ্যোতিষ কাহাকে বলে?

দুই একজন প্রাজ্ঞ শিষ্য আমার অজ্ঞতায় একটু হাসিলেন।

বাবা। সে একরকমের জ্যোতিষ—যাহা দিয়া লোকের পূর্ব পূর্ব জন্মের সকল বিবরণ এবং ইহ জন্মেরও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব নির্ভুল ভাবে জানা যায়—এমন কি পিতা-মাতারও সকল বৃত্তান্ত জানা যায়।

বিকাল হইয়াছিল। দীক্ষার জন্য আবশ্যক জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। তাই গোপীনাথ সহ সকাল সকাল তাঁহার বাসায় ফিরিলাম। এ বিষয়ে গোপীনাথ ও তাঁহার বাড়ীর লোকেরা ছাড়া আমার বিশেষ সহায়তা করিলেন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এবং তাঁহার পুত্র শ্রীমান সুরেশ। উভয়ে বাবার শিষ্য। সুরেশ তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে M. Sc. ডিগ্রী পাইয়া D. Sc. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করিতেছিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই অমায়িক। পিতার নাম গোপীনাথের যোগশাস্ত্রের শ্রেণীতে শ্রোতৃরূপে একবার উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা বহু পুরুষ ধরিয়া কাশীতেই আছেন। শুনিলাম সতীশ বাবু উকিল হইয়াও ওকালতি করেন না; ভূসম্পত্তির আয় আছে। ছেলেটি দেখিলাম বেশ ধর্মভাবাপন্ন। বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়াও সুরেশ ধর্মবিশ্বাসী, অলৌকিক বিষয়ে মৌলিক সন্দেহ হইতে মুক্তচিত্ত। বাল্যাবধি স্বামীজির কাছে গতায়াতের ফলে এই গুণটি হইয়াছে। ইহার দীক্ষা আমার দীক্ষার পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল।

দীক্ষার জন্য আবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে একটি যোগদণ্ড, নিজের পরিধেয় পট্টবস্ত্রের যোড়, একটি কুশাসন, একখানি ভাল পুরু গালিচার আসন ও তাহার উপর রেশমের আস্তরণ, কুমারীর জন্য একখানি লালপেড়ে শাড়ী, একটি নূতন কাঁসার বাটিতে পাঁচ ছটাক ঘৃত এবং একখানি কাঁসার রেকাব। শেষোক্ত দ্রব্যখানি ভুলে ক্রয় করা হয় নাই। আমার স্ত্রীর দীক্ষার সময় ঐটির কথা প্রথমে শুনি এবং বাবার মুখে ইহাও শুনি যে, আমার দীক্ষার সময় তিনি নিজ হইতে একখানি রেকাব দিয়াছিলেন। দীক্ষার সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে কেবল রেকাবখানিই তাঁহার থাকে, আর কিছু থাকে না। সে যাহা হউক, ভাল ঘৃত সংগ্রহ করিতে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। ফলে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। জিনিসগুলি সব সন্ধ্যার পূর্বে গুরুদেবের নিকট দিয়া আসা উচিত ছিল। আমরা যখন সেগুলি নিয়া আশ্রমে পৌঁছি, তখন বাবা সন্ধ্যাহ্নিকের পর বিশ্রাম করিতেছিলেন। সৌভাগ্য-

ক্রমে তখনও তাঁহার নিকট শিষ্যদের যাওয়া বন্ধ হয় নাই। গোপীনাথ উপরে তাঁহার নিকট চলিয়া গেলেন, পরে আমাকেও ডাকিয়া নিলেন। দেখিলাম, বাবা একটি অমুচ্চ খট্টায় শুইয়া আছেন। কয়েকটি শিষ্য মেঝেতে কম্বলে বসিয়া আছেন। ঘরে দীপ নাই, পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ হইতে আলোকের ছটা কিছু পাওয়া যাইতেছিল এবং তাহাতেই কাজ চলিতেছিল। প্রণাম করিয়া খাটের কাছে মেঝেতে বসিলাম। বাবা বলিলেন, "ভোর সাড়ে পাঁচটায় আসিও।" পরিধানের কাপড়ের যোড় পরদিন সঙ্গে আনিলেই চলিবে বলিয়া তাহা রাখিলেন না।

উপস্থিত শিষ্যেরা বাবার সঙ্গে দু'চারিটি কথা বলিলেন। স্বর বড় অমুচ্চ— আমার কানে কোনও কথা আসিল না। এমন সময় বৈদিক দাদা আহ্নিক করিয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোপীনাথ আমাকে বলিলেন, ওঁর জীবনেও বাবার অনেক মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। পুস্তকে কিছু কিছু পাওয়া যাইবে।*

আমি। বাবার মহিমার অন্ত কি? এখন আমি একটু কৃপা পাইলে হয়।

বৈদিক। মহাশয়, বলিব কি? বাবার মাহাত্ম্য বলিবার নয়। শুনিবেন? ভট্টাচার্যের কথাবার্তার ধরণে একটু তন্ময়তার ভাব আছে। বাবা সস্নেহ পরিহাসপূর্বক ইহাকে এবং আরও দুই-একটি ভাবপ্রবণ শিষ্যকে "ফর্টি নাইনের দল" বলিতেন। "ফর্টি-নাইন" (৪৯) অর্থ উনপঞ্চাশ বায়ু—যাহা লোককে একটু অসাধারণত্ব দেয়। এ সব অবশ্য পরে শুনিয়াছি।) সেবার মুন্সীগঞ্জে খিঁচুড়ি রাঁধিতেছি, দেড় শ' লোক খাইবে। খিঁচুড়ি পাক হইতেছে—কিন্তু ভুলক্রমে তখন পর্যন্ত হাতার যোগাড় হয় নাই বিলম্বও সয় না, খিঁচুড়ি পুড়িয়া যায়। কি করিব? "জয় গুরু" বলিয়া হাঁড়িতে হাত ঢুকাইয়া দিয়া নাড়িয়া দিলাম। একটু গরমও বোধ হইল না। বাবার মাহাত্ম্য ব্রহ্মা বিষ্ণুর মাহাত্ম্যের তুল্য।

ব্রাহ্মণ গুরুর সম্মুখে বসিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছেন ইহা সম্ভব বোধ হইল না। অথচ আমার চিত্ত স্বভাবতঃ অবিশ্বাসী, তাই ভাবিলাম কিছু অত্যুক্তি হয়ত আছে। যাহা হউক বলিলাম, "তুল্য" কেন বলেন? জয় বিষ্ণু বলিয়া হাত দিলে কি হইত কে জানে? দেবতায় লোকের তত জ্বলন্ত বিশ্বাস হয় না যত গুরুতে হয়। আর, শাস্ত্রও ত বলে গুরুতত্ত্ব ভগবানেরই কৃপাতত্ত্ব। তবু বাবা বলেন—কৃপা কিছু না, তোমরা চেষ্টা কর, চেষ্টাস্বরূপ কৃপা হইবে। আমার ত মনে হয় কৃপাই সব। জাফ খাঁ কৃত গঙ্গাস্তবে আছে—

* দুঃখের বিষয় হরমোহন ভট্টাচার্য ও আরও কতিপয় শিষ্যের লিখিত লীলা-কাহিনী আজ পর্যন্ত অমুদ্রিত রহিয়াছে।

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম্ ।*

বাবা। ওটা কি জান? ওটা কবির কথা।

আমি। কবির কথা ত বটেই, কিন্তু কবির প্রাণের কথা। কাজ আমরা করিব বটে, কিন্তু আপনি আমাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া নিলেই কাজ হইবে।

বাবা। কৃপা কি রকম জানিবে? তোমরা যেমন ছেলেদের ভালবাস। অন্যে আক্রমণ করিতে আসিলে তখন ছেলের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে রক্ষা কর না কি? আবার নিজে শাসন কর—যেন তারা লেখাপড়া শিখে ভাল হয়।

আমি। আমিও ত বাবা তাই চাই। আপনি শাসন করুন, কিন্তু আগ্‌লে থাকুন। দয়া করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করাইয়া নিন। দয়া হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

রাত্রি হইয়া গেল। বাবাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরে জানিয়াছি, বৈদিক ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথিত ফুটন্ত খিঁচুড়িতে হাত দিয়াও কিছুমাত্র উষ্ণতাবোধ না হওয়ার তুল্য ঘটনা বাবাজীর শিষ্যগণের মধ্যে আরও ঘটিয়াছে। অধুনা পরলোকপ্রাপ্ত নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাবার একজন অতি পুরাতন শিষ্য ছিলেন। ইনি বর্ধমানে পুলিশ অফিসে কেরাণী ছিলেন। বর্ধমানে আশ্রম (বিশুদ্ধাশ্রম) হওয়ার পূর্বে বাবা ঐ শহরের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন। সেই সময়ে নেপাল চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী তাঁহার বহু সেবা করিয়াছিলেন। নেপাল চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ঐ সময়ে একদিন "রাসেশ্বরী তৈল" পাক হইতেছিল। অর্ধমণ তিল তৈল একটা কড়াতে টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল এবং বাবা তাহা হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছিলেন পাক ঠিক হইল কিনা। উহা দেখিয়া নেপাল বাবুর ইচ্ছা হইল তিনি তপ্ত তৈলে হাত দেন। তিনি ঐ অভিপ্রায় বাবার নিকট প্রকাশ করিলে

---

* অনেক পাঠকই হয়ত জানেন দরাফ খাঁ কৃত গঙ্গা-স্তোত্রের এই শ্লোকটির বাকী অংশটি এই :-

যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বম্ মহত্ত্বম্ ।

সমস্ত শ্লোকটির অর্থ এইরূপ :—হে সুরধুনি, হে (জহ্নু) মুনির কন্যে, তুমি পুণ্যবান্‌কে তরাইতে পার। সে ত নিজের পুণ্যেই তরিয়া যায়, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব কি? যদি গতিবিহীন পাপী আমাকে তরাইতে পার তবেই তোমার মহত্ত্ব স্বীকার্য। আর সেই মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব।

সমস্ত শ্লোকটি আমার বলিবার পূর্বেই বাবা তৎসম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলেন।

বাবা অনুমতি দিলেন। নেপালবাবু নির্ভয়ে তৈলে হাত ডুবাইয়া দিলেন। তৈল ফুটিতেছিল কিন্তু তাঁহার হাতে সামান্য গরম মাত্র বোধ হইয়াছিল।*

ছয়

রাত্রি আনুমানিক নয়টায় আমরা সকলেই বাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার বিশ্রামপ্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিলাম। শুনিলাম ঐ সময় হইতে রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত তিনি সাধারণতঃ নিদ্রা যান। সাড়ে এগারটায় মহানিশার আরম্ভ ধরা হয়, তিনটায় শেষ। যোগের ঐটি সুপ্রশস্ত সময়। মহানিশার কাজের পর পুনরায় নিদ্রা নির্বিঘ্ন। বাবা সচরাচর সাড়ে চারিটায় যোগগৃহ হইতে বাহির হন। আমাকে সাড়ে পাঁচটায় যাইতে বলিয়াছিলেন। কাহারও দীক্ষা থাকিলে সাড়ে পাঁচটার পূর্বে তিনি যোগাসন ত্যাগ করেন না বা করিতে পারেন না, এইরূপ শুনিয়াছিলাম।

মনে উদ্বেগ ছিল, রাত্রিতে ঘুম ভাল হইবে না। সাড়ে তিনটায় শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলাম। গোপীনাথ তৎপূর্বেই উঠিয়া আহ্নিকে ব্যাপৃত ছিলেন। আমি হাত-মুখ ধুইয়া স্নানার্থ গঙ্গায় গেলাম, গোপীনাথের তখনকার বাসা হইতে গঙ্গা

* বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ ৩য় খণ্ড।

ঢাকাতেও একবার একটি যোগী ঐরূপ একটা তৈল পাক করিবার সময় নিজেও ফুটন্ত তৈল পুনঃ পুনঃ হাত দিয়া নাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া দুই-একজন ভক্তও তাহাতে হাত দিয়াছিলেন; এইরূপ বিবরণ আমার শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় রায় সাহেব রমেশচন্দ্র সেন (বি. এ.) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। ঐটি ১৮৯৪ সনের ঘটনা। রায় সাহেব তখন ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সাধুটি তাঁহাদের মেসের নিকট এক ঠাকুর বাড়ীতে (দেবালয়ে) ছিলেন; রায় সাহেব এবং আরও বহু লোক ঐ সাধুটির কাছে সর্বদা যাইতেন, তাহাদের মধ্যে কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, উকিল, হাকিম-প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি থাকিতেন। রায় সাহেব বলেন, সাধুটি ঢাকায় আসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এখানে এক (কি দেড়) বৎসর থাকিব." এবং সেই কাল পূর্ণ হইলে হঠাৎ তিনি চলিয়া যান। এই মহাপুরুষটি সর্বভাষাবিদ্ ছিলেন, এবং কোথায়, কিরূপে এত ভাষা শিখিলেন, এই কথা রায় সাহেব একদিন কৌতূহল বশে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি রহস্য করিয়া বলেন, "জগতে কত হাজার ভাষা আছে, মানুষ নিজ নিজ ভাষাতেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ঈশ্বর কিরূপে এত ভাষা বোঝেন?" উচ্চ গণিতশাস্ত্রের দুরূহ problems তাঁহাকে দিয়া আসিলে পরদিন তিনি তাহা সমাধান সহ ফেরত দিতেন। কলেজের অধ্যাপকগণ এইভাবে বহুবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যোগীটির আকৃতি নাকি কতকটা পাহাড়িয়া (তিব্বতি) ধরনের ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে রায় সাহেবের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাতে তাঁহাকে জ্ঞানগঞ্জের লোক বলিয়াই মনে হয়। দুঃখের বিষয় বাবার দেহ রক্ষার পর এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম বলিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হয় নাই। জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণ যে সময় সময় ঢাকায় আসিতেন তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। বাবা ঢাকা হইতেই নীমানন্দ পরমহংসের সঙ্গে তিব্বত (জ্ঞানগঞ্জ) গমন করেন।

পাঁচ-সাত মিনিটের পথমাত্র ছিল। গঙ্গাস্নান সমাধা করিয়া গোপীনাথ সহ আশ্রমে গেলাম। কিছুক্ষণ নীচে অপেক্ষা করিতে হইল, তার পর উপরের কপাট খোলার শব্দ পাইয়া গোপীনাথ উপরে গিয়া তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "বাবা আপনাকে ডাকিতেছেন।" তাড়াতাড়ি পট্টবস্ত্রখানি পরিয়া ও চাদর গায় দিয়া উপরে গেলাম। হৃৎপিণ্ডটা দপ্ দপ্ শব্দে উঠিতে-পড়িতেছিল। উপরে গিয়া দেখি আমার ভবকর্ণধার এক অপূর্ব কায়দায় কাঁধ হইতে হাঁটু পর্যন্ত লম্বমানভাবে কাপড়খানি পরিয়া বা গায়ে বাঁধিয়া প্রায় কর্ণধারের মতই দাঁড়াইয়া আছেন। পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার আদেশে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিশ্রাম-কক্ষটি পার হইয়া যোগকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

দীক্ষার সকল কথা প্রকাশ করা চলে না। বাবা পূর্বমুখ হইয়া স্বীয় আসনে বসিলেন ; আমি সমকোণভাবে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরমুখ হইয়া পূর্বদিনে ক্রীত চেল-গালিচা-কুশোত্তর আসনে বসিলাম। আসনাদি যথাবিধি পূর্বেই শোধনাদি করিয়া রাখা হইয়াছিল। বাবার ও আমার উভয়েরই সম্মুখে একটি বৃহৎ তাম্রকুণ্ডে ফুল, জল, বিল্বপত্র ও কদলীফলের মধ্যে একটি শালগ্রাম কিংবা বাণলিঙ্গ (কোন্‌টি তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।) পনের আনা নিমগ্নভাবে ছিলেন। আমি বাবার নির্দেশ অনুসারে আচমন করিয়া সেই তাম্রকুণ্ডে উক্ত শালগ্রামের বা বাণলিঙ্গের উপরে দেবতাবিশেষের পূজা করিলাম। যে বীজ ও মন্ত্রে পূজা হইল, পরে দেখিলাম উহাই আমার বীজ ও মন্ত্র এবং যে দেবতার পূজা হইল তিনিই আমার ইষ্টদেবতা। পূজার মন্ত্র বাবা সমস্তই বলিয়া দিতেছিলেন, আমিও বাচিকভাবেই সকল মন্ত্রই (এমন কি উক্ত বীজও) উচ্চারণ করিয়া পূজা করিয়াছিলাম, কেবল গায়ত্রী মনে মনে জপ করিয়াছিলাম। শেষে যখন বাবা আসন ও "ক্রিয়া" বুঝাইয়া দিয়া আমাকে মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন তখনও আমি বাচিক-জপ[১] করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাবা আমাকে উপাংশু-জপ[২] করিতে উপদেশ দিলেন।

বাবা আমার মন্ত্রবিভাগ করিয়া বলিলেন, "এই তোমার বীজ, এই তোমার দেবতা, দেবতার রূপ এইপ্রকার।" আরও বলিলেন, "বীজটি খুব ভালই পাইলে। গত তিন জন্মে তুমি এই বীজ দিয়া এই দেবতার সাধন করিয়াছ।" কথাটিতে আমার স্বভাবতঃ অবিশ্বাসী মনও এইজন্য সায় দিল যে, এই দেবতাটির প্রতি আমার আবাল্য অনুরাগ ছিল। আমি অনেক সময় মনে মনে এই দেবতার নাম জপ করিতাম এবং রূপ ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম। কখনও কখনও এই দেবতার সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটি দেবতাকে স্মরণ করিতাম, তন্মধ্যে একটিকে কিছু বেশী দিন হইতে, অপরটিকে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন যাবৎ স্মরণ করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, "বাবা, আমার ইষ্টদেবতার নামটি আমার শৈশব হইতেই প্রিয়,

১. বচন-নিষ্পাদ্য,—বাচনিক।

২. অন্যলোকের শ্রবণের অযোগ্য ; অথচ উচ্চারিত মন্ত্র নিজের শ্রবণযোগ্য।

তার সঙ্গে এই নামটিও আমি স্মরণ করি।" এইস্থানে—কেন বলিতে পারি না—দ্বিতীয় দেবতার নাম না বলিয়া তৃতীয় দেবতার নাম বলিলাম। যে নামটি আমি বলি নাই, বাবা সেইটি উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "গত তিন জন্মের পূর্বে দুই জন্মে এইটি তোমার ইষ্টনাম ছিল; আর তার পূর্ব দুই জন্মে ঐটি (অর্থাৎ তৃতীয় দেবতাটি) তোমার দেবতা ছিলেন।" বাবা স্বতঃ দ্বিতীয় দেবতাটির নামটি বলাতে আমি খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম।

ঠিক তখন ভাবি নাই, কিন্তু পরে ভাবিয়াছি—এই জন্ম সহ অন্ততঃ আট জন্ম আমার হিন্দুর ঘরেই হইয়াছে; এটি যদিও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া গৌরবের বিষয় বটে, তথাপি সাত জন্ম সাধনের পরও এতটা পাষণ্ড রহিয়া গিয়াছি, ইহা কোনও ক্রমেই গর্বের কারণ নয়। বুঝা যায় এ জন্মের মতই পূর্ব সাত জন্মেও কাজের মত কাজ কিছুই করা হয় নাই। সেকালে হিন্দুর ঘরে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে, জন্মিলে দীক্ষাও গতানুগতিক ভাবেই হইয়া যাইত; সম্ভবতঃ আমারও তাহাই হইয়াছিল; এবং সাধন যাহা হইয়াছে তাহাও বোধ করি নিয়মমাত্র-রক্ষার উপরে কিছু নয়।

আমি যখন জপে নিযুক্ত ছিলাম, তখন আমার দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ থাকিলেও চক্ষুর প্রান্ত দিয়া আমার যেন এইরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল যে, বাবা তাম্রকুণ্ড হইতে শালগ্রাম- (বা বাণলিঙ্গ)টি তুলিয়া লইয়া একখানি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া নিজের মুখ ঈষৎ ব্যাদানপূর্বক তাহা ভিতরে ছুঁড়িয়া দিলেন। আর তাহা দেখা গেল না। দীক্ষান্তে যখন বাসার দিকে ফিরি, তখন গোপীনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবাকে শিবলিঙ্গ মাথার ভিতরে রাখিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন?" আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাই বলিলাম। গোপীনাথ বলিলেন, "ঐ ভাবেই বাবা শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ মাথায় রাখিয়া দেন। পূজার প্রয়োজন হইলে আবার মুখ দিয়াই বাহির করেন।" বহুকাল পরে আমি আরও একটি সাধুকে আমার গৃহে ভোজনকালে ছোট একটি বাণলিঙ্গ মুখ হইতে বাহির করিতে এবং ভোজনান্তে পুনঃ তাহা মুখে ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছি। তবে তাঁহাকে একজন যোগী বা উন্নত মহাপুরুষ বলিয়া আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হয় নাই, কাজেই তাঁহার ক্ষেত্রে ওটা কোনও বাজে কৌশল কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নহি। সেইজন্য সাধুটির নাম উল্লেখ করিলাম না। অবশ্য আমার বিচার ঠিক না হইতেও পারে।

"ক্রিয়া"-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ্য নয়; কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঐরূপ ক্রিয়াসম্বন্ধে যোগশাস্ত্রের কোনও কোনও পুস্তকে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, বাবার উপদিষ্ট ক্রিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তাহাতে জটিলতা কিছুই নাই; স্ত্রী পুরুষ কাহারও পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য নয়; স্বাস্থ্যের হানি হওয়ারও কোনও আশঙ্কা নাই, বরং যথারীতি করিয়া গেলে শরীর ও মন উভয়ের উপরই তাহার প্রভাব অল্পদিন মধ্যেই অনুভূত

হয়। ক্রিয়া প্রত্যহই দুইবার—প্রাতে ও সন্ধ্যায় কর্তব্য ; তবে অশৌচ হইলে তাহা নিষিদ্ধ, কিন্তু জপ নিষিদ্ধ নয়। অশৌচে আহ্নিকের জন্য নির্দিষ্ট পট্টবস্ত্রপরিধান ও নির্দিষ্ট আসনে উপবেশনও নিষিদ্ধ—সাধারণ বস্ত্র পরিয়া স্বতন্ত্র একখানি আসনে (কম্বলাদিতে) বসিয়া জপমাত্র কর্তব্য। নিত্য জপ কোনও কারণেই একবেলাও বাদ দেওয়া যাইতে পারে না ; দিলে প্রত্যবায় হয়। রেলগাড়ী ইত্যাদিতে চলিবার কালে, আসনে বসিবার সুবিধা না হইলে, যে অবস্থায় থাকা যায় সেই অবস্থায়ই নিত্য জপ (মানস) অবশ্য করণীয়। ক্রিয়া লোকলোচনের অন্তরালে করিতে হয় ; দুই গুরুভাই, এমন কি, স্বামী ও স্ত্রী একসময়ে একগৃহে বসিয়া করা যায় না ; তবে পর্দা দিয়া আবরণ করিয়া লইলে করা যায়।

আহারনির্হারবিহার যোগাঃ
সদৈব সদ্ভির্বিজনে বিধেয়াঃ।

জপ ও ক্রিয়ার জন্য বাবা সাধারণতঃ পদ্মাসন করিয়া বসিতে উপদেশ দিতেন ; তবে ঐকান্তিকভাবে নয়। আমার একটা ব্যারামবিশেষের জন্যই বোধ করি তিনি আমাকে বলিলেন, "পদ্মাসন করিয়া বসিতে তোমার কষ্ট হইবে কি ? আমি বলিলাম, "একটু কষ্ট হয়ত হইবে।"

বাবা। তবে তুমি কিরূপ আসন করা সুবিধাজনক মনে কর ?

আমি একটা আসন দেখাইলাম। বাবা বলিলেন, "ওতেই হবে।" মোটের উপর কর্ম যতদূর সহজ করিয়া দেওয়া সম্ভব তাহাই তিনি করিয়া দিলেন। আর বলিলেন, "অন্ততঃ এতবার (সংখ্যাটি প্রকাশযোগ্য মনে করিলাম না) জপ দু'বেলাই করিও। ইহার উপর যদি তোমার ইচ্ছা হয় গীতা পড়িতে পার। বৃন্দাবনে সাধু রামকৃষ্ণ বাবাজী যে আমাকে প্রত্যহ অন্ততঃ এক অধ্যায় গীতা পড়িতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তদনুসারে আমিও যে কিছুদিন গীতা পড়িতেছিলাম, এখন বাবার উপদেশে সেই কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম হয়ত সেইজন্যই এই উপদেশ।

একটি কবচ দিয়া বাবা বলিলেন, "প্রথমে ঘৃত সহ ঐ বাটীটি এবং এই (লাল পেড়ে) শাড়ীখানি একটি কুমারীকে দিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইবে এবং কিছু দক্ষিণা দিবে ; তৎপর তাঁহার প্রসাদ পাইয়া এই কবচ লাল রেশমী সুতা দিয়া বাঁধিয়া ডান হাতে ধারণ করিবে। এই কবচ বহু বিপদে রক্ষা করিতে সমর্থ, নষ্ট না হইলে কিছুতেই অপমৃত্যু হইতে পারিবে না। পেঁয়াজ ও ডিম এই দুইটি নিষিদ্ধ খাদ্য। উহাদের সংস্পর্শেও কিছু খাইবে না। খাইলে কবচ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "জপ ত মাত্র দুইবার কর্তব্য। অন্য সময়ে, যেমন চলিতে চলিতে, বা ট্রামে বসিয়া, বা অন্য কাজ করিতে করিতে, মন্ত্রজপ করা যায় না কি ?

বাবা। যায়, তবে সমস্ত মন্ত্র নয়—এই (অর্থাৎ বীজাংশ) টুকু। তাহাও মানসভাবে করিবে। (বাচিক ত নয়ই; বাচিক জপ সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ; উপাংশু জপও নয়।)

দীক্ষা শেষ হইল। অতঃপর আর বাবাকে (এক বিজয়াদশমী ও জন্মোৎসবের দিন ছাড়া) পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করা যাইবে না।* তাই আজ বেশ করিয়া তাঁহার পায়ে মাথা ঘসিয়া লইলাম।

পূর্বে মনে করিয়াছিলাম, একটা যা হ'ক ছোটখাট বক্তৃতা গোছের কিছু করিব। কার্যতঃ কিছুই করিলাম না। কেবল নতমস্তকে নতমনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম। চক্ষু দিয়া জল গড়াইল না, অঝোর ক্রন্দন ত দূরের কথা। স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প—কিছুই দেখা দিল না। দেবতাও আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন না। ঘর হইতে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইবার কোনও প্রবৃত্তিরও উদয় হইল না; বুঁদ হইয়াও বসিয়া রহিলাম না। কোনও কোনও মহাপুরুষের প্রদত্ত দীক্ষার পরে ঐরূপ সব বিকার (বিকার সাত্ত্বিক হইলেও তাহা বিকারই বটে) উপস্থিত হয়—এইরূপ কোনও কোনও পুস্তকে পড়িয়াছিলাম; পরেও পড়িয়াছি এবং শুনিয়াছি। আমার কিছুই হইল না। ভাবপ্রবণ লোকদিগের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা আমার নমস্য; আমি সে শ্রেণীর বাহিরে। শুনিয়াছি, গুরু যদি আধারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মন্ত্র দেন, তাহা হইলে সকল আধার তাহার প্রথম সংঘাত (impact) সহ্য করিতে পারে না বলিয়া নানা বিকার সাময়িকভাবে উৎপন্ন হয়, এবং তাহা ভাবপ্রবণ প্রকৃতি ছাড়াও অন্যত্র উৎপন্ন হইতে পারে। আর ভাবপ্রবণ লোকেরা মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া ছাড়াই সাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হইতে পারে। তাহাদের বেলায় আধারের মন্ত্রশক্তি ধারণের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠে না। সে যাহা হউক, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দীক্ষা দিবার পূর্বে শিষ্যের বহুজন্মের সাধনেতিহাস উদ্‌ঘাটন করিয়া এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া লইতেন যে, বোধ করি সেইজন্যই মন্ত্রশক্তির প্রথম সংঘাত কোনও বিকার উৎপন্ন করিত না। তাহা স্বভাবানুগত বলিয়া স্বাভাবিক প্রণালী পথে স্বভাবশীল ক্রিয়া করিত।

আসনাদি সহ বাহিরে আসিবার কালে বাবা বলিয়া দিলেন, "কবচ ধারণের পর এখানে এসে প্রসাদ পাবে।" তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "গোপীনাথকেও সঙ্গে নিয়ে এসো, নচেৎ ওর ভুল হ'তে পারে।"

---

* এবিষয়ে বাবার ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা প্রায় সকলেই (যেন একটু গৌরবের ভাব হইতে) বলেন ও লিখিয়াছেন, বাবা তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে পা ছুঁইতে দিতেন না। প্রকৃতপক্ষে কোনও শূদ্র শিষ্যেরও পাদস্পর্শ করিবার স্বাধীনতা ছিল না। তবে বাবার ইচ্ছা হইলে পাদসংবাহনাদি ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল শিষ্যই করিতে পাইতেন। জন্মোৎসবে ও বিজয়া দিনেও ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে পারিতেন।

গোপীনাথ নীচে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাসা ফিরিলাম। একটি কুমারী গোপীনাথের বাড়ীতেই ছিলেন—তাঁহারই এক আত্মীয়া বালিকা; লক্ষ্মীর মত আকৃতি, বড় মনোরম স্বভাব; বয়স দশ এগা বৎসর হইবে। কুমারী স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিলেন এবং আমার প্রদ সঘৃত পাত্র দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন; পরে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজ করিলেন। কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলাম; প্রণাম করিলাম; প্রসাদ পাইলাম গোপীনাথের স্ত্রী সিল্কের সূতায় বেণী পাকাইয়া আমার হাতে কবচ পরাই দিলেন।

কে একজন—বোধ হয় বিজয়দাদাই—বলিয়াছিলেন, অন্য সম্প্রদায়ে দীক্ষা পূর্বে হোম হয়। বাবার সম্প্রদায়ে দীক্ষায় ঘৃত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয় না কুমারী বহ্নিরূপা; সেইজন্য ঘৃত কুমারীসাৎ করা হয়। কথাটি মনে লাগিয়াছিল

ইহার পরে সাধনপ্রণালীসম্বন্ধে গোপীনাথের স্পষ্টভাবে সকল উপদেশ দেওয়ার পথে কোনও বাধা ছিল না বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে অনেক কথা জানিয়া বুঝিয়া লইবার সুবিধা হইল। এইজন্যই কাশীতে দীক্ষা হয় ইহা আমার মনে ম কাম্য ছিল। সর্বজ্ঞ গুরু আমার শুভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন।

বেলা এগারটায় আশ্রমে গোপীনাথ সহ প্রসাদ পাইতে গেলাম। দেখিলা কুমারীভোজন তাহার পূর্বেই শেষ হইয়াছে। আমরা গিয়া কুমারীর প্রসা কিঞ্চিৎ পাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই ভোজন হইল ভোজনকালে বাবার প্রসা পাইলাম। পূর্বদিনও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আজও লক্ষ্য করিলাম—বাবার প্রসা পাইবার জন্য শিষ্যদের আগ্রহ অসীম। পাতে আহার্য দিলেও ঐ প্রসাদ না পাও পর্যন্ত কেহ ভোজন আরম্ভ করেন না। এ অভিজ্ঞতাও আমার নূতন। নব পূজার দিন সাধারণতঃ কুমারী সেবা অন্ন দ্বারাই হয়। এবার কলিকাত কর্পোরেশনের কালেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসুর আগ্রহে ও ব্যয়ে ঘৃতান্নের ব্যব হইয়াছিল।

ভোজনকালে শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বসু আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তি বলিলেন, "আমিই আপনাকে দেরী না করিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলা মনে আছে ত? আজ আপনার কি আনন্দের দিন বলুন ত?" উকিল লো কথা জানেন। ভাবিলাম উনি হয়ত এক বৎসর সাধন ভজন করিয়া খুব আনন্দ পাইতেছেন। আমার পরমবান্ধব বিজয়শঙ্করদাদাও প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিলেন গুরুর মহিমাকীর্তনে তিনি পঞ্চমুখ, কিন্তু বার বৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি এবং এখন দেখিলাম, তিনি গুরুসকাশে একেবারে নীরব; গুরুসকাশে বসিতেও গৃহের দূরত কোণে বসেন। তবে অনেকদিনের শিষ্য; দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, মেলামেশা করিয়াছেন অনেক; গুরুভাইদের সঙ্গেও তাঁর খুব মাখামাখি ভাব।

ভোজনান্তে বাবার হাত হইতে পানপ্রসাদ পাইলাম। এদিন আর শিষ্যদের ধ্যে বাবার কথার আলোচনা হয় নাই। গোপীনাথ কি একটা কাজে আশ্রমে রহিলেন; আমি বিজয়দাদার সঙ্গে বাসায় ফিরিলাম। গোপীনাথ ফিরিয়া াসিলে শুনিলাম রাত্রিতে চন্দ্রবিজ্ঞান দ্বারা জ্যোৎস্নালোক হইতে বাবা সন্দেশ প্রস্তুত করিবেন এইরূপ কথা হইয়াছে।

কথাটা নাকি এইরূপে উঠে। দশমীর দিনও কুমারীভোজন করান হইবে কিনা এই প্রশ্ন উঠিলে বাবা বলিলেন, "না, সকলেরই তিনদিন খুব খাটিতে ইয়াছে; কাল আর খাটা চলিবে না।" তারপর কি একটা কথাপ্রসঙ্গে কে লেন সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা কিছু মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইলে বেশ হয়। তখন বাবা বলেন, তবে কাল কুমারীভোজনেরই ব্যবস্থা কর চন্দ্রালোক হইতে সন্দেশ করিয়া দিব।" গাপীনাথ আশ্রম হইতে আসিয়া ঐ বিবরণ দিয়া বলিলেন, চাঁদা করিয়া কুমারী-ভাজনের টাকা তোলার প্রস্তাব হইতেছে। যদি তোলা হয় তবে সন্দেশ প্রস্তুত রা দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব হইতে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল; এবং উহা ন্ধ্যার পরেও কিছুক্ষণ চলিল। তখন গোপীনাথ বলিলেন, আকাশের যে অবস্থা, াহাতে চন্দ্রবিজ্ঞান দ্বারা হয়ত সন্দেশ প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না। কাজেই ামরা আর আশ্রমে গেলাম না। গোপীনাথের আহ্নিকের ঘরে আহ্নিক সম্পাদন রিলাম। এই প্রথম আহ্নিক; নামমাত্রই করা হইল। নূতন নূতন বলিয়াও টে, বেশীক্ষণ ঘর বন্ধ রাখিলে অন্যের অসুবিধা হইতে পারে ইহা ভাবিয়াও বটে, কয়দিন কাশীতে ছিলাম, সে কয়দিনই একরূপ নিয়মরক্ষার মত করিয়াই আহ্নিক রা হইয়াছিল। গোপীনাথের গৃহে তখন গোপীনাথ ছাড়া দীক্ষাপ্রাপ্ত আরও ইজন ছিলেন; গোপীনাথের স্ত্রী এবং পুত্র মাখন (জিতেন্দ্রনাথ) বাবাজীবন। রে কয়েকখানি আসন গুটান দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম উহারা সকলেই ঐ গৃহেই াহ্নিক করেন।

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের একটি সন্ন্যাসী বাল্যাবধি আমার পরিচিত। ঐ াশ্রমে উহার ডাকনাম উপুদা। তিনি আমাকে ঐ আশ্রমে প্রতিমা দর্শন ও সাদগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, প্রসাদগ্রহণ সম্ভব ইবে না, রাত্রিতে প্রতিমাদর্শন করিতে যাইব। বাবার আশ্রমে যাওয়া হইল । বলিয়া মেঘের ঘোরসত্ত্বেও রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে লাম।

পরদিন বিজয়া দশমী। গোপীনাথ বিকালের দিকে আশ্রমে যাইবার সময় ামাকে বলিলেন, "আপনি এখন বরং না গেলেন, প্রতিমাবিসর্জনের পর বাবাকে প্রণাম করিতে যাইতেই হইবে; তখনই যাইবেন।"

গুরুপদের জন্য ব্যাকুলতা মলিনচিত্তে সহজে জাগে না। কানে কম শুনি

বলিয়া গুরুর কাছে শিষ্যদের সকল বাক্যালাপে যোগদানও সম্ভব হয় না ; কতকটা বোকার মত বসিয়া থাকিতে হয়। সেইজন্যও যাওয়ার গরজ কম ছিল। পরে শুনিয়াছিলাম বাবা গোপীনাথকে দুইবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "অক্ষয় এল না কেন?" এখন মনে করি অক্ষয় যে কি ধুরন্ধর লোক তাহা জানিতে বাবার বাকী ছিল কি? সাত জন্মের খবর ত জানিতেন। তবু কৃপাগুণে টানিতে বিরত ছিলেন না। কৃপাই ত গুরুর গুরুত্ব ; আর কৃপার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস।

বিজয়ার প্রণাম করিতে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া গোপীনাথের সঙ্গে আশ্রমে গেলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আসনি কেন?" কি জবাব দিব? অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম "কানে কম শুনি বলিয়া এখানকার কথাবার্তা বেশী বুঝিতে পারি না। অনেকটা সেই কারণে দিনের বেলায় আসি নাই।" বাবা আর কিছু বলিলেন না।

বাবার অনুমতি লইয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। পায়ে কপালটা বেশ করিয়া ঘষিয়া লইলাম। ফিরিবার সময় ব্রহ্মরন্ধ্রেও পায়ের অঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া লইয়াছিলাম।

বাবার পরে বাবার আত্মজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাদাকে স্বতন্ত্র এক ঘরে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম গুরুপুত্রের আকৃতি গুরুদেবের মতই প্রতিভাসমন্বিত, চক্ষু দুইটি বেশ উজ্জ্বল, মুখও প্রফুল্ল। ডন-কুস্তির অভ্যাস আছে বলিয়া মাংসপেশী গুলি সুপুষ্ট।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গেও যথাযোগ্য আলিঙ্গন অভিবাদন ইত্যাদি হইল। অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে ইতিমধ্যে প্রণাম করিয়া চলিয়াও গিয়াছিলেন।

বাবা বলিলেন, "যাও মিষ্টিমুখ করগে।"

মিষ্টিমুখ করিতে গিয়া প্রথমেই পাইলাম সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা প্রস্তুত সন্দেশ। শুনিলাম কাল চন্দ্রবিজ্ঞান দ্বারা সন্দেশ করার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু অদ্য প্রাতে বাবার নিজ খেয়ালবশতঃ সূর্যবিজ্ঞান-দ্বারা সন্দেশ প্রস্তুত হইয়াছে। সন্দেশের মধ্যে বেলের মোরব্বার গন্ধ খুব স্পষ্ট পাওয়া গিয়াছিল, এবং বোধ হইয়াছিল যেন একটু আদাও আছে।

মিষ্টিমুখ করিয়া আসিয়া বাবার হাত হইতে পানপ্রসাদ পাইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলাম। আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কুঞ্জলাল ঘোষ দাদাও ছিলেন। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সন্দেশটা কি ভাবে হইল? উত্তরে তিনি বলিলেন, "বাবা যখন প্রাতে উপর হইতে নামেন তখনই একটা মাটির হাঁড়িতে (ঐ যেটাতে সন্দেশ রহিয়াছে) ফোকাস্ (focus) করিয়া রাখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন ওটাতে সন্দেশ হইতে থাকিবে। কিছুক্ষণ পরে গিয়া দেখিলাম কতকটা সন্দেশ হইয়াছে। তারপর সেটা বাড়িতে বাড়িতে

হাঁড়িটার three fourths (বার আনা) পরিমাণ হইলে বাবা বলিলেন, 'আর হইবে না।' এবারে process (প্রক্রিয়া) কিছু দেখি নাই। কিন্তু একবার পুরীতে দেখিয়াছিলাম। সেবার বাবা একটা এনামেলের বাটি নিয়া তাহাতে ফোকাস্ করেন।"

আমি। ফোকাস্ করা ব্যাপারটা কি ?

আমার প্রশ্নে দুই-একজন প্রাজ্ঞ শিষ্য হাসিলেন। বাবা বলিলেন, "এই যে কৌটাটা আছে, এটা একটা লেন্স্ (lens) মনে কর। ইহা এইভাবে সূর্যের কিরণে ধরিলে ইহার মধ্য দিয়া সূর্যকিরণ বাটিতে পড়িবে এবং কিছুকাল এইভাবে থাকিলে বাটির মধ্যে একটা বড় সর পড়িয়া যাইবে।

কুঞ্জদাদা। হাঁ, তাহাই হইয়াছিল। বাবা যখন ফোকাস্ করেন তখন মনে হইয়াছিল সাদা বাটিটাতে যেন একটা সূক্ষ্ম নীল রঙের সর পড়িয়াছে।

আমি। খালি বাটিতেই সর পড়িয়াছিল ত ?

বাবা। শোন, ও কি বলছে। বলছে—খালি বাটিতে ত ?

কুঞ্জদাদা। হাঁ, খালি বাটিতে বই কি ?

আমি। "সর" কথাটা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল—কি জানি বাটিতে বাধ করি কিছু জল ছিল।

প্রাজ্ঞেরা আবার হাসিলেন। গোপীনাথ বলিলেন, "খালি বাটিতেই হয়।"

কুঞ্জদাদা। বাটিটা একটা এনামেলের ঢাকনী দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল—অল্প-একটু সন্দেশ হইয়াছে। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেল—আধপোয়া বা তিনছটাক পরিমাণ সন্দেশ হইয়াছে। তখন বাবা বলিলেন, যতটা ফোকাস্ করা হইয়াছে তাহাতে উহার বেশী হইবে না। বেশী করিতে হইলে আবার ফোকাস্ করিতে হয়, তার দরকার কি ?"

আমি। আজকের সন্দেশে বেলের গন্ধ পাইলাম।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেও ঐ গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি আমার কথা সমর্থন করিলেন। বাবা বলিলেন, "ওতে বেল, আম, বেদানা (আরও কি একটা ফলের বোধকরি আঙ্গুরের, নাম করিয়াছিলেন) আদার রস, ছানা ও মাখন আছে।"

আমি। আম ইত্যাদির গন্ধ টের পাই নাই, তবে আদার স্বাদ একটু যেন পাইয়াছিলাম।

বাবা। এ খুব ভাল সন্দেশ। বেশ হজম হয়; কোষ্ঠ শুদ্ধ রাখে; তবে বেশী খাইলে শরীর গরম হয়।

তারপর ঐ সম্বন্ধে আর দুই চারিটি কথার পরে বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কুমারীভোজনের কথা বলিয়াছিলাম, কেহ করাইল না। অগত্যা আমাকেই করাইতে হইবে।" তারপর বিজয়ার প্রণামীরূপে শিষ্যগণ যে টাকা

দিয়াছিলেন এবং যাহা একটি রুমালে ছিল, রুমাল-সমেত সেই টাকাগুলি তুলি ধরিয়া বলিলেন, "এই দেখ তার খরচ সংগ্রহ হইয়া গেল। যার কাজ তিনি যে-কোনও ভাবে করাইয়া নেন।"

ফোকাস্ করিয়া এসেন্স তৈরীর কথা কে একজন তুলিলেন। গোপীনা প্রক্রিয়াটা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। যেদিনের কথা সেদিন তিনি সে সম উপস্থিত ছিলেন। মার্কিনদেশীয় এক সাহেব ও বিবির বিশেষ আগ্রহে বা তাহাদেরই আনীত ছিপি আঁটা একটা শিশিতে প্রথমে কতকটা নীলকাগজ এক তামার তার দিয়া জড়ান, পরে তাহা তাহাদেরই হাতের উপর রাখিয়া লে দ্বারা তদুপরি আলো ফেলিয়া আধ শিশি পরিমাণ অপূর্ব গন্ধযুক্ত আতর প্র করেন।

আমি। শিশিতে কাগজ ইত্যাদি জড়ানোরও বোধ করি প্রয়োজন ছিল না।

বাবা। ছিল, নচেৎ শিশিটা ফাটিয়া যাইত।

আমি। আমার মনে হয় আপনার ইচ্ছামাত্রেই এইসব প্রস্তুত হইতে পারে মহিম্নঃ স্তোত্রে আছে—বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ (ঈশ্বরে বুদ্ধি পরতন্ত্র নয়, তবে যে নানা বস্তুর সাহায্য নেওয়া হয় সেটা সেই স্বা বুদ্ধিরই খেলা মাত্র)।

অন্তের কথায় আমার কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। পরে বুঝিয়াছি, বাবা সব ইচ্ছাশক্তির দ্বারা করেন না, বিজ্ঞান দ্বারা করেন ; তাই আয়োজন উপকর দরকার হয়। তা' ছাড়া একটা আবরণ না দিলে সৃষ্টি হয় না ; মায়ার (অজ্ঞানে আবরণেই জগতের সৃষ্টি হয়। একটু বড় ব্যাপারে বাবা সময় সময় তুলা বা সি কাপড়ের আবরণ দিতেন, নচেৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তেজে দ্রষ্টার চক্ষু ঝল যাইবার আশঙ্কা থাকে বলিতেন।

রাত্রি নয়টায় বাবা উঠিলেন ; আমরাও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ফিরিবার পথে একায় গোপীনাথ, সতীশ (দে) দাদা ও আমি। আ বলিলাম, বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আজ দিনের বেলায় আমি নাই কেন। তোমাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

গোপী। হাঁ বাবার সবদিকে লক্ষ্য থাকে। ওঁর মনটা খুবই কোমল। ক্র বুঝিবেন ওঁর কত করুণা। আমার বাড়ীতেই ধরুন, কেমন কৃপা করিলে আমি সংবাদ দেই নাই তবু আমার স্ত্রীকে মরণের মুখ হইতে টানিয়া আনিলে সুরেনকে কি করিয়াছিলেন সতীশদার মনে আছে ত ?

সতীশদা। খুব আছে।

আমি। কি করিয়াছিলেন ?

গোপীনাথ। সুরেনের* বিসর্প রোগ (Erysipelas) হয়। অবস্থা এতদূর রাপ হয় যে, ডাক্তার জবাব দিয়া যান। আমরা আশ্রমে বসিয়া আছি, এমন ময় একজন লোক আসিয়া বাবাকে সেই সংবাদ দিল। বাবা কিছু বলিলেন । লোকটি উকিল। সে বক্তৃতা করিয়া বাবাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল— বারই ত শিষ্য, মরণকালে অন্ততঃ একবার বাবার তাহাকে দেখিতে যাওয়া চিত। বাবা বলিলেন, "আমি গিয়ে আর কি করব?" উকিলবাবুটি একটু রক্ত হইয়াই উঠিয়া গেলেন। আমারও মনে হইল, না হয় কিছুই না হইত ; কবার বাবা গিয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি হইত? বরং আত্মীয়দের মনে কটা সান্ত্বনা হইত। তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমার মনটা খুব খারাপ। (সুরেনবাবুকে মি ১০ বৎসর পূর্বে গোপীনাথের বাসায় খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত যাওয়া সা করিতে দেখিয়াছি। ঐ সময়ে আমারও তাঁহার সহিত পরিচয় হয়, তিনি শীতেই থাকিতেন ; যে সময়ের কথা হইতেছে তাহার ৬।৭ বৎসর পূর্বে তিনি কবার কলিকাতায় আমার বাসায় আসিয়া দেখা করিয়াছিলেন।) বাবা সন্ধ্যা রিতে উঠিলেন। আমি বলিলাম, "সুরেনের কি হইবে?" বাবা বলিলেন, দেখি জগদম্বার কি ইচ্ছা।" আমরা ওখান হইতে সুরেনের মামার বাসায় লাম, সে তখন সেইখানেই থাকিত। সতীশদাও সঙ্গে ছিলেন। আমি গিয়া খি সুরেন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমি তাহার মাথার কাছে একরূপ থা কোলে লইয়াই বসিলাম। শুনিলাম ডাক্তার শেষ জবাব দিয়া গিয়াছে।

সতীশদা। সুরেনের মামা শ্মশানে নেওয়ার খাটুলি কিনিবারই ব্যবস্থা রিতেছিলেন।

গোপীনাথ। কিছুক্ষণ ঐভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হইল পদ্মগন্ধ াইতেছি। আমি সতীশদাকে বলিলাম, বোধ হয় বাবা আসিয়াছেন। ওঁরা কটু দূরে ছিলেন, প্রথমে টের পান নাই। পরে সমস্ত ঘরটা পদ্মগন্ধে ভরিয়া ঠিল। তখন সকলেই টের পাইলেন। তারপর সুরেনের স্ত্রী (সুরেন কয়েকমাস- ত্র পূর্বে বিবাহ করিয়াছিল) অন্য এক ঘরে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেখানেও বা যান—সেখানেও পদ্মগন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। সুরেনের স্ত্রী মুহূর্তমধ্যে চৈতন্য- ভ করিয়া উঠিয়া বসে। এদিকে সুরেনও চক্ষু মেলিয়া বলে, "খুব আরাম বোধ ইতেছিল ; বাবা আসিয়াছিলেন কি?" আমি সুরেনকে বলিলাম, কথা বলিও , চুপ্ করিয়া শুইয়া থাক। সে শুইয়া ত রহিলই না ; উঠিয়া বসিল। তার ীরে তখন কোনও জ্বালাযন্ত্রণা নাই। তারপর সে দ্রুত ভাল হইয়া উঠিল।

গোপীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমার মার মরণের সময় বাবা পুরীতে ; মি কোনও সংবাদ দেই নাই। তিনি নিজ হইতেই আসিয়াছিলেন। নিজ

* সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এখন কানপুরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

হইতেই লিখিয়াছিলেন, আমি সমস্ত শ্মশানের পথ তোমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছি। তুমি যখন অমুকস্থানে তখন আমি তোমার আগে, তুমি যখন অমুক কাজ কর তখন আমি তোমার পিছনে ইত্যাদি।" তারপর কত সান্ত্বনা দিয়া আমাকে চিঠি দিয়াছিলেন সে-সব চিঠি আছে।

আমি। আমাকে তুমি সেই চিঠিগুলি দেখাইও।

পরদিন (১৬ই আশ্বিন) আহারান্তে গোপীনাথ সহ আশ্রমে যাই। শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ হরিদ্বার ইত্যাদি তীর্থের দিকে যাইতেছেন দেখিলাম। শ্রীশ্রীবাবাকে জপ, ক্রিয়া ইত্যাদির নিয়মসম্বন্ধে দুই-চারিটা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ঐ সকল বিষয়ে কিছু কিছু শ্রীযুক্ত গোপীনাথ হইতেও শুনিয়াছিলাম ; আবার ইহাও বিজয়দাদার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, সাধন-সম্বন্ধে সকল প্রশ্ন স্বয়ং বাবার নিকট করাই কর্ত্তব্য, অন্তের কথায় কিছু করিতে নাই এরূপ কথা বাবা বহুবার তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন। আর তাহা যুক্তিযুক্তও বটে ; কেননা শিষ্যগণের অধিকারভেদে উপদেশেরও তারতম্য হইতে পারে এবং বস্তুতঃ হইয়াও থাকে। বাবা আমাকে পূর্ব্বমুখ হইয়া জপ ও ক্রিয়া করিতে বলিয়াছিলেন। উত্তরমুখ হইয়াও করা যায় কিনা ইহা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "যায়। তবে তুমি পূর্বমুখ হইয়াই করিও।" এই সময়ে আমার পিছন হইতে কুঞ্জ- (ঘোষ) দাদা বলেন, রাত্রিতে উত্তরমুখ হইয়া বসিতে হয় (বা বসা যায়) বাবা তাঁহাকে কি বলেন মনে নাই। আমাকে দুই বেলাতেই পূর্বমুখ হইয়া বসিতে পুনরায় আদেশ দিলেন। ক্রিয়ার পরে কেবল (অর্থাৎ ক্রিয়াঙ্গভিন্ন) জপের সংখ্যা রাখা উচিত কিনা—এই প্রশ্ন আমি করাতে বাবা বলিলেন, "না রাখিলে দোষ নাই ; রাখিলে ভাল।" কুঞ্জদাদার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, জপের জন্য দ্বিতীয়বার সঙ্কল্প করা আবশ্যক নহে, তবে করিলে ফলাধিক্য হয়।

১৭ই আশ্বিন শরীরটা কিছু অসুস্থ হইয়া পড়ে, সেই জন্য আশ্রমে যাই নাই। গোপীনাথের নিকট লিখিত শ্রীশ্রীবাবার কয়েকখানি চিঠি পাইলাম। গোপীনাথ বাবার সকল চিঠিই রক্ষা করিয়াছেন। খুঁজিয়া আরও কয়েকখানি দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯শে আশ্বিন তারিখেই আমি চলিয়া আসাতে তাহা আর সম্ভব হয় নাই। জ্ঞানগঞ্জ হইতে বাবার নিকট লিখিত কয়েকখানি চিঠির নকল গোপীনাথের নিকট ছিল, তাহাও তিনি আমাকে পড়িতে দিলেন।

যে পত্র কয়খানি দেখিয়াছিলাম তাহা হইতে কতক কতক অংশ আমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এস্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইতেছে।

সন ১৩২৬ সাল ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুরী "বিশুদ্ধানন্দধাম" (এইটি পুরী আশ্রমের নাম) হইতে শ্রীশ্রীবাবা লিখিতেছেন—

"ক্রিয়া ঠিক ভাবে করিয়া যাইলে কোনও বিষয়ে অভাব ও শরীরের কোন

গ্লানি থাকিবে না। সকল বিষয়েই আনন্দ পাইবে। যে নাদধ্বনি উপলব্ধি করিয়া থাক উহার পর যে অবস্থা আসিবে সেই অবস্থায় ব্রহ্ম ও মায়ার ভেদ দর্শন হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মের নিত্যত্ব এবং মায়ার অনিত্যত্ব বেশ অনুভব করিতে পারিবে। তখন আর কোনরূপ সংশয় স্থান পাইবে না।"

সন ১৩২৯ সাল ১৫ই বৈশাখ তারিখে পুরী হইতে লিখিতেছেন—

"বৎস, এক মহাশক্তি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। মহাশক্তির শক্তির বিষয় যিনি বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দেন তিনিই সদ্‌গুরু। মানুষ কখনই ভগবান হইতে পারে না। তোমরা বালক সেইজন্য সামান্য বিষয় লইয়া উতলা হও। যে বিষয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়া পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে। জ্ঞানের সূক্ষ্মসীমায় উপনীত হইলে অদ্বৈতবাদ-ব্যতীত দ্বৈতবাদ থাকিবে না। এক অবিনাশী চৈতন্যই নিত্য। অখণ্ড চিন্ময় মহাশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিক দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গোল লাগে।......মহাশক্তিই আবার জীবভাবে আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত, সেইরূপ তোমায় আমায় কিছু প্রভেদ নাই। কার্য করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। অশান্তি থাকিবে না, থাকিতে পারে না।"

সন ১৩৩১ সাল ১৭ই ভাদ্র তারিখে পুরী হইতে লিখিত এক চিঠিতে আছে—

"মহামায়ার চিন্তাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ধ্যানী সাধকের দ্বারাই প্রকাশ। মা-চিন্তারূপ বিশুদ্ধ যোগে মাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার অধিকার জন্মে। অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয় সকলের দুষ্ট বন্ধন সকল ছিন্ন হয় এবং মর্মপ্রবিষ্ট বাসনার গ্রন্থিসকল আল্‌গা হইয়া যায়।......বাবা! যথাবিধি কার্য না করিলে মহাশক্তি মায়ের ঠিক তত্ত্ব বুঝা যায় না। ক্রিয়া অবস্থায় যোগীর বিশেষ পরীক্ষার স্থল। সন্মুখে যতই কেন পরীক্ষা প্রলোভন আসুক না, বিশ্বাসের প্রচণ্ড তেজে চুরমার হইয়া যাইবেই যাইবে। জীব-জড়িত মায়ের খেলা বড় মজার ও মধুর। জগৎময় এক মহামায়ের মহাশক্তি কার্য করিতেছে, অথচ নানা দ্রব্য ও জীববিশেষে শক্তি ভাব ক্রিয়াদির নিয়ম আলাদা; তাহাও খণ্ডন করা যায় না। অসীম ইচ্ছার নিয়ম কেমন সুন্দর! এসব দেখিয়াও মানুষ তাহার বিষয়ে অন্ধ হ'য়ে ঠিক গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া পাশববৃত্তির অধীন হইয়া কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কি লিখিতে কত কি লিখিলাম বলিয়া হয়ত তোমার বাবাকে পাগল মনে করিবে।"

মাতার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শ্রীশ্রীবাবা হইতে কয়েকখানি পত্র পান। নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি উহাদের অন্যতম। এখানিও পুরী হইতে লিখিত। তারিখ ১৩৩২ সাল ২১শে বৈশাখ।

"পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। বৎস, সমস্তই তাঁহার

ইচ্ছা। উক্ত ইচ্ছাময়ীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে সকল বিষয়ই বেশ জান যায়। উক্ত ইচ্ছাময়ীর কৃপা-ব্যতীত কোনও বিষয়েই কাহারও বুঝিবার শক্তি হয় না। পূর্বে আমার ধারণা ছিল, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সমস্ত বিষয় বেশ বুঝিতে পারে। এতদিনে আমার পুত্রের দ্বারাই বুঝিলাম সে বিষয়ে আমার ধারণ ভুল ছিল। মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে কেন? শুদ্ধ স্বভাবের ভাব ও গুণে বিষয় জানিতে চেষ্টা করে এবং অনেক জানিয়াছে, জানিয়া মায়াজনিত দুঃখ প্রলোভন হইতে নিস্তারের উপায় করিয়াছে ও করিতেছে। যাহাতে সম্পূর্ণ ত্রিতাপ জনিত তাপ হইতে নিস্তার পায়, আর না হয় এইরূপ চেষ্টাকেই সম্পাদ্য জ্ঞান বলে। ইহাও দুইভাগে বিভক্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। যাঁর দ্বারা সৃষ্টি ও লয় হয় তিনি কে, কেন এরূপ করিতেছেন ইত্যাদি জানার নাম জ্ঞান। ইহার পরাবস্থা— সৃষ্টি লয় যিনি করেন, তাঁহাকে যিনি করেছেন—ঘোররূপিণী মহাশক্তি ব্যোমাতীত তাঁর বিষয় জানার নাম বিজ্ঞান। বাবা এসব বিষয় তুমি কিছু কিছু জান বলিয়াই লিখিলাম। জগৎ মিথ্যা, এক তিনিই সত্য; তাঁর দেওয়া দ্রব্য তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অলেহ্য জগতের তীব্র তাপ অসহ্য ও কষ্টকর বলিয়া আপনার কন্যা ও পুত্রকে নিজধামে (যেখানে কুণ্ঠা নাই, সর্বদাই আনন্দ) লইয়া যান তাতে দুঃখের কি আছে? বরং তাঁকে বার বার ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত। তোমার মত জ্ঞানী ছেলে যদি প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব জানিয়াও মায়ায় অভিভূত হইয় কর্তব্যের ত্রুটি করে, তাহা হইলে সামান্য লোকদিগকে কি বলা যাইতে পারে? প্রলোভনপূর্ণ জগতে সকলই আশ্চর্য! শ্মশানভূমির ভীষণ দর্শনেও অসারকে সা ভাবে; প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া অসত্যের কতই আদর হইতেছে। তা বলি যাহা ক্রিয়া করিতেছ, আরও যাহাতে ভাল হয়, শরীর যাহাতে ভাল থাকে— শরীরকে অযথা কষ্ট দেওয়াও পাপ। সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতির সম্মুখে মায়া ও প্রলোভন কখনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। আসক্তিপূর্ণ হৃদয়েই উহার স্থান পায়। চিন্তা কি? আমি সর্বদাই তোমার নিকট যাই ও দেখি। পিত বর্তমানে পুত্রের চিন্তা কি? কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ দেখি না।......"

সন ১৩৩২ সালের ১৭ই চৈত্র তারিখে ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপু (কলিকাতা) হইতে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিত হয়—

"বৎস। সকল শক্তির মূল যে শক্তি, তিনিই প্রথম ও শেষ। সকল বিষয়ে তাঁ প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু-ই নাই। তিনি শক্তি-সঙ্কোচ করিলে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্র এবং বিচিত্র জগৎসকল, দেব-দেবী যাহা কিছু আছে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না; আর দৃষ্ট হইবে না। একমাত্র পূর্ণ-পরমানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী দ্বৈতাদ্বৈ নিত্য-অনিত্য লীলায় সুখ-দুঃখ, হা-হুতাশ, পিতা-পুত্র, সেব্য-সেবক প্রভৃতি লইয় মজার খেলা খেলিতেছেন। প্রয়োজন অপ্রয়োজন নিজেই জানেন। আর যে তাঁহার বিষয় লইয়া আলোচনা করে সেই কিছু জানে।......... বাবা।

ুক্তিতর্কে ত কিছু পাওয়া যায় না ; প্রত্যক্ষ জিনিসে আবার যুক্তিতর্ক কি ? .....মহাভাব-তত্ত্বের সারমর্ম ক্রিয়ার দ্বারা সর্বদাই হৃদয়ে গ্রহণ কর। বাহ্যিক ভাবের ভিতর টলিয়া না পড়িয়া সর্বদাই মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও। াহা হইলেই সব হইবে। ক্রিয়া যেমন করিতেছ করিয়া যাও ; আশু আশু াড়াইবার চেষ্টা করিবে। চিন্তা কি ?......সময় পাইলে আসিবার চেষ্টা করিবে, কেহ আসিতে ইচ্ছা করিলে আসিতে বলিবে।"

ইহার মধ্যে যে চিঠিখানিতে (১৪৬ পৃ:) আছে—"মানুষ কখনই ভগবান্ হইতে পারে না ; তোমরা বালক সেইজন্য সামান্য বিষয় লইয়া এত উতলা হও," াহার পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে।[১] সেই সময়ে (খ্রী: ১৯২২ সন) অর্থাৎ শ্রীযুক্ত গোপীনাথের দীক্ষার তিন-চারি বৎসর পরে কাশীতে একটি শক্তিমান্ সাধক প্রকট হন। সুপ্রসিদ্ধ যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য প্রণবানন্দ স্বামী াহার অল্পকালপূর্বে দেহরক্ষা করিলে তাঁহার শোকার্ত শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মহাপুরুষটির পরিচয় পাইয়া সান্ত্বনার্থ তাঁহার কাছে আসেন এবং তাঁহার পদেশ মত কিছু কিছু কাজ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে নানাপ্রকার অনুভূতি ত্যাদি পাইতে থাকেন। ইহাতেই তাঁহার প্রচার হয়। তিনি পূর্বে কলিকাতায় কালতি করিতেন, পরে কাশীবাসী হন ; গৃহিভাবেই থাকিতেন। নাম ছিল —শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ঠিক দীক্ষা দিতেন না, তবে ভক্তগণকে যুগল মধ্যে তাঁহার স্বমূর্তি ধ্যান করিতে বলিতেন এবং "কিশোরী" এই শব্দ দুইবার ক্ত একটি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে বলিতেন। ঐ মন্ত্রটি আমি তাঁহার উত্তরকালে ীতরাগ এক ভক্ত হইতে পাইয়াছি ; প্রকাশ করা উচিত মনে করিলাম না। শুনা ায়—কয়েক দিন ঐরূপ ধ্যান ও জপ করিলে দেবতা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বীজ মন্ত্র দিতেন। ইহার নিকট কয়েকটি শিষ্যের এবং শিষ্য ও পুত্র গণপতি বন্দ্যো- াধ্যায়ের লিখিত কয়েকখানি মূলপত্রও আমি গোপীনাথের কাছে দেখিয়াছি। াহাতে তাঁহারা যে সকল অনুভূতির কথা লিখিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। ই কয়েকখানি চিঠি খ্রী: ১৯২৪ মে-জুন মাসে লিখিত ; ঐসময়ে গোপীনাথের হিত উক্ত মহাপুরুষটির বেশ ঘনিষ্ঠভাব স্থাপিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক খ্রী: ৯২২ সনেই কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ভক্তগণ "কিশোরী ভগবান্" া শুধু "ভগবান্" বলিয়া অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ ক মানুষদেহ নয়, ব্রহ্মদেহ—ইহাও কথিত হইতেছিল। খ্রী: ১৯২২ সনে যখন াপীনাথ ইহার নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই সময়ে, এপ্রিল াসের শেষ সপ্তাহে, কোনও এক তারিখে সন্ধ্যার পরে গোপীনাথ শ্রীকিশোরী গবানের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার মূর্তির ধ্যান ও নামজপ হইতে ভক্তগণের নানা

১. দ্রষ্টব্য : 'কলিতে ঐশ্বরিক লীলা' গ্রন্থ গোপীনাথ কবিরাজ; 'ভক্তের শ্রুতি' ভূমিকাংশ মতী কুসুমকুমারী দাস।

বিস্ময়কর দর্শনাদির বিবরণ শুনিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, "ইনি অবশ্য ভগবান্ই হইবেন' একজন সাধারণমানুষের নামজপে ও মূর্তিধ্যানে কি ঐ-রকম সকল ব্যাপার হওয়া সম্ভব ? আর ইঁহার দেহও নিশ্চয়ই প্রাকৃত দেহ নহে।" গোপীনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় গুরুদেবের গাত্রগন্ধ পাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন কিশোরী ভগবানের বাড়ী (পাতালেশ্বর) হইতে ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে স্বীয় গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন সমস্ত (প্রায় এক মাইল) পথটাই সেই গন্ধ দ্বারা আমোদিত অনুভব করিয়াছিলেন। তার কয়েকদিন পরেই তিনি পুরী হইতে বাবার ঐ চিঠিখানি পান। ঐটি গোপীনাথের লিখিত কোনও পত্রের উত্তর নয়। তাঁহার জ্ঞানময় করুণাময় গুরু তাঁহার বুদ্ধিভ্রম অপনোদন জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ চিঠি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কথার অর্থ এই—এবং ইহা তিনি পরেও গোপীনাথকে ও অন্য অনেককে বহুবার বলিয়াছেন —জীব সাধনবলে যত উন্নতিই লাভ করুক, সে জীবই থাকে, ঈশ্বর হয় না। জীব সাধনবলে—যোগপ্রভাবে—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের ক্ষমতা পর্যন্তও লাভ করিতে পারে, একটা স্বতন্ত্র জগৎই সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে, তবু ঈশ্বর হইতে তাহার ন্যূনতা থাকিবেই। তত্ত্বের দিক্ দিয়া সবই একমাত্র ভগবানেরই বিলাস, একথাও তিনি সর্বদাই বলিতেন, এবং এই পত্রেও আছে, "এক মহাশক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় নাই " তবে সে এক কথা, আর ব্যক্তিবিশেষকে সাক্ষাৎ ভগবান বা ভগবতী বলিয়া মনে করা আর এক কথা।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীকিশোরী ভগবানের ভক্তগণের প্রাথমিক অনুভূতিগুলি অনেকস্থলেই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। ইহাও স্বাভাবিকই বটে। যাহা অপরের শক্তিপ্রভাবে হয়, তাহা নিজের চিরায়ত্ত রাখিতে হইলে তীব্র সংবেগ সহকৃত সাধনের প্রয়োজন। সেরূপ সাধক কয়জন আছেন ? কাজেই ক্রমে ক্রমে কিশোরী ভগবানের প্রতি লোকের আস্থা কমিতে থাকে। ত্রুটি তাঁহার নয় —তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা ও অস্থিরচিত্ত ভক্তগণের এবং দোষৈকদৃষ্টি জনসাধারণের। সে যাহা হউক, কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পূর্ব প্রতিপত্তির কথা কাশীতেও বড় একটা শুনা যাইত না। তিনি ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং কাশীতে দেহরক্ষা করেন। আমি তাঁহাকে দেখি নাই। বাঁচিয়া আছেন জানিলে অবশ্য একদিন তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতাম। ভগবান্ না হউন, শক্তিমান্ সাধক ছিলেন ত ? তাহাই কি আম-জামের মত সুলভ ?

শ্রীশ্রীবাবার লিখিত উক্ত কয়খানি চিঠি ছাড়া, তাঁহার নিকট লিখিত জ্ঞানগঞ্জের পাঁচখানি চিঠির নকলও ঐদিন আমি গোপীনাথ হইতে পাইয়াছিলাম। ঐ পাঁচখানি এবং আরও একখানি পত্র পরে বাবার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হইয়াছিল। বাবার দেহরক্ষার পরে গোপীনাথের নিকটেই আরও তিনখানি চিঠি দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে একখানি মূল চিঠি ; উহার লেফাফায়

জলন্ধরের ও বর্ধমানের ডাকঘরের ছাপ আছে। এই চিঠিগুলিতে অতি উচ্চ তত্ত্বের সঙ্গে আশ্রম সম্বন্ধে এবং শিষ্যদিগের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপার-সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। ঐসকল পত্র পাঠ করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে গোপীনাথের সহিত আলাপাদি করিয়া খুবই উপকৃত হইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীবাবার কৃপার গুরুত্ব যে কত অধিক,—তাহা যেন কতক বুঝিতে লাগিলাম। জানিলাম কেবল বাবা নহেন, আরও আরও মহাশক্তি পরমহংসগণ এবং মাতৃগণ (ভৈরবী মাতারা) অনুক্ষণ বাবার শিষ্যগণের কল্যাণসাধনে রত আছেন। বুঝিলাম বাবাকে কেন দীক্ষা দিবার পূর্বে জ্ঞানগঞ্জের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। তাহা ছাড়া ইহাও গোপীনাথের মুখে শুনিলাম, তাঁহার দীক্ষার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা বলিতেন যে, দীক্ষা প্রকৃতপক্ষে তিনি দেন না, পূজ্যপাদ জেঠাগুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস দেন। অর্থাৎ দীক্ষায় যে শক্তিপাত হয়, গোপীনাথ-প্রভৃতির দীক্ষার কালে ঐ শক্তি আসিত বাবার মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস হইতে। ঐরূপে মহাত্মা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও বলিতেন যে, দীক্ষা তিনি দেন না, তাঁহার গুরু মানস-সরোবরের পরমহংসজী দেন। (ঐ কথায় বলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত এক ভদ্রলোক—ইহারও কয়েকজন শিষ্য ছিল—না কি বলিতেন, গোস্বামী মহাশয় তাঁহার গুরু নহেন, গুরুভাই মাত্র !!,) সে যাহা হউক, গোপীনাথ বলিলেন কয়েক বৎসর পরে বাবা না কি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অতঃপর শিষ্যদের দীক্ষা তিনি নিজেই দিতে পারিবেন এইরূপ অনুমতি পাইয়াছেন। আমি এই উত্তর-যুগের শিষ্য; কিন্তু যেমন প্রথম যুগের শিষ্যদের বেলায়, সেইরূপ শেষপর্যন্ত, কেহ বাবার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি সর্বদাই বলিতেন, অনুমতির জন্য তাঁহাকে জ্ঞানগঞ্জ পত্র পাঠাইতে হইবে! তিনি স্বাধীন হইলেও আপনাকে স্বাধীন মনে করিতেন না; এটি তাঁহার অতি গভীর গুরুভক্তিরই পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণযোগ্য যে, সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ না থাকিলে দীক্ষায় পাতিত শক্তি তেমন কার্যকরী হয় না। সম্প্রদায়গুরুর মর্যাদা এইজন্যই এত অধিক। সাধনপথে নিজকে নিজে কিংবা অন্যেও অতকটা অগ্রসর মনে করিলেই দীক্ষা দিবার অধিকার জন্মে না। ঐ অধিকার স্বতঃসিদ্ধ নয়; এমন কি, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও গুরু হইবার অধিকার না থাকিতে পারে।

গোপীনাথের কাছেও শুনিলাম এবং এই পত্র কয়েকখানি হইতেও বুঝিলাম, বাবার প্রত্যেক শিষ্যের সংবাদ পূজ্যপাদ ভৃগুরাম পরমহংস ইত্যাদি রাখেন। এক পত্রে জেঠাগুরুদেব লিখিতেছেন, "তুমি যে যে সকলকে বর্তমান সময়ে শিষ্য করিয়াছ, আমি তাহাদের নিকট প্রতিদিনই যাই ও সম্যক্‌দৃষ্টিরূপে প্রতি ঘরে ঘরে বেড়াই। আমি সমস্ত দেখি, তোমার দেখিবার প্রয়োজন দেখি না।" পুনশ্চ তুমি আমি কে ভাই? তোমার সমস্ত শিষ্য আমি। যে হইবে সেও আমি;

যে যাইবে সেও আমি ; আমি তাহাদের গুরু। গুরুবাক্যটা কঠিন বাক্য ···· তোমার সমস্ত শিষ্যের বিষয়ে আমি পরীক্ষক।"

সাত

১৮ই আশ্বিন বিকালে গোপীনাথ সহ আশ্রমে যাই। এদিন কথাপ্রসঙ্গে গোপীনাথ তত্ত্বকথার অবতারণা করেন। সমস্ত ভারতীয় দর্শনে ও সমস্ত ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে গোপীনাথের অধিকার অসামান্য এবং ঐ বিষয়ে তাহার অন্তর্দৃষ্টি এরূপ যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানের আপাততঃ ভিন্ন ও পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীগুলির মধ্যেও তিনি মৌলিক ঐক্য বা সামঞ্জস্য অতি সহজেই ধরিয়া ফেলেন। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা তাঁহাকে বিভ্রান্ত করে না। সিদ্ধ মহাপুরুষগণেরও যে দর্শনশাস্ত্রগুলির বহির্ভূত স্ব স্ব সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্র পরিভাষা আছে, তাহাও তিনি জানেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনার সময় তাহা মনে রাখিয়া সতর্কভাবে তাঁহাদের কথা শুনিয়া যান। শ্রীশ্রীবাবাজীর সম্প্রদায়েও বিশিষ্ট পরিভাষা আছে ; তাহা ছাড়া মতেরও আপাত-প্রতীয়মান বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য আছে। বাবার তত্ত্বব্যাখ্যা যতক্ষণ গোপীনাথের শাস্ত্রজ্ঞান ও ধারণার সহিত বেশ সমঞ্জসভাবে চলিতে থাকে ততক্ষণ তিনি শুনিয়া যান। যখন কোনও বিষয় বুঝিতে পারেন না, তখন জিজ্ঞাসা করেন ; তাহাতেও যদি তাহা স্পষ্টীকৃত না হয়, তাহা হইলে সুযোগ মত পুনরায় তাহা উত্থাপন করেন ; এবং এইরূপে একবারে হউক বা দশবারে হউক বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করেন।

অদ্য কি একটা কথা উপলক্ষ করিয়া গোপীনাথ প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং বাবাও তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন। কথাগুলি একটু মৃদুস্বরে হইতেছিল বলিয়া সব আমি ধরিতে পারি নাই। পরে গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া সারমর্ম অবগত হই।

বাবা বলেন, কর্ম (গুরুদত্ত সাধন) করিতে করিতে চিত্তের মল কাটিয়া গিয়া জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের পরিপক্কতায় ভক্তি সঞ্জাত হয়। ভক্তির মধ্যে গোড়ার দিকে একটা উচ্ছ্বাস বা মাদকতা থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রশম হয়। তখন ভক্তি প্রেমে পরিণতি লাভ করে।

কর্ম হইতে জ্ঞান কি প্রকারে হয় ? কর্ম সঙ্ঘর্ষ-স্বরূপ। কিসের সহিত কিসের সঙ্ঘর্ষ ?—মনের সহিত মন্ত্রের, মন অধর অরণি, মন্ত্র উত্তর অরণি।* যেমন

* যজ্ঞকাষ্ঠকে শাস্ত্রে অরণি বলে। পূর্বে দুইখানি অরণি পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া যজ্ঞের অগ্নি উৎপন্ন করা হইত। ঘষিবার সময় যে কাষ্ঠখানি উপরে থাকে তাহাকে উত্তর অরণি ও যেখানি নীচে থাকে তাহাকে অধর অরণি বলে।



শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা (১৯৩৭)

রণিদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া অরণিকেই ধ্বংস করে, সেইরূপ মন ও মন্ত্রের রস্পরসঙ্ঘর্ষে যে তেজ উৎপন্ন হয় উহা মনের অশুদ্ধি ও মন্ত্রেরও বর্ণাত্মক আবরণ ভয় নষ্ট করিয়া দেয়। তখন মন হয় শুদ্ধ সত্ত্ব এবং মন্ত্র হয় চৈতন্যময়ী শক্তি। ই সময়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়। তারপরও যে সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকে তাহার ফলে ান ভক্তিতে পরিণত হয়। জ্ঞানের বিশুদ্ধিই ভক্তি। ভক্তির নির্মলতা প্রেম। ানভিন্ন প্রকৃত ভক্তি হয় না। জ্ঞানে আস্বাদন নাই, ভক্তিতে উহা আছে এবং হাই জ্ঞান হইতে ভক্তির বিশেষত্ব।

এই তত্ত্ব যে গোপীনাথ আজই প্রথম শুনিলেন তা নয়, "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' য় খণ্ডে ইহা তিনি যথাসম্ভব বিশদভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্য এই ত্ত্বান্তর্গত কোন সূক্ষ্ম রহস্য তাঁহার জিজ্ঞাস্য ছিল এবং কতদুর তাহার সমাধান ইল ইহা কানের দোষে ধরিতে পারি নাই। তা'ছাড়া আমি সবে মাত্র স্কুলে কিয়াছি, নবাগত ছাত্র যেমন শ্রেণীর এক কোণে বসিয়া পুরাতন ও বিশিষ্টতর াত্রদের আচার-আচরণ ও বোলচাল লক্ষ্য করে, আমি একরূপ তাহাই করিতে-ছিলাম। আলোচিত বিষয়ের গভীরতায় প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস ামার কতকটা ভীত ও সঙ্কুচিত চিত্তে তখনও উদিত হয় নাই।

আশ্রম হইতে গোপীনাথের সঙ্গে ঢাকার শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে দেখিতে যাই। ায়ের নাম এখন উত্তরভারতে সর্বত্র প্রসিদ্ধ এবং অনেক ভক্তের চক্ষে তিনি সাক্ষাৎ গবতী দুর্গা। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখনও তিনি ঢাকার বাহিরে বশী প্রকাশ হন নাই। মায়ের প্রকৃত নাম শ্রীমতী নির্মলা দেবী। পিত্রালয় ত্রিপুরা জেলায় বিদ্যাকুট গ্রামে। সন ১৩০৩ সালে ১৯শে বৈশাখ তারিখে তাঁহার পিতার মাতুলালয় খেওড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বিবাহ হইয়াছিল (১৩১৫ সালের ৫শে মাঘ) ঢাকা জিলায় বিক্রমপুর আটপাড়া কোলা গ্রামে। স্বামী রমণী-মোহন চক্রবর্তী প্রথমে পুলিশের মধ্যে কোনও কর্ম করিতেন, তৎপর ঢাকার বাবদিগের জমিদারিতে দুইস্থানে কার্য করিয়া পরিশেষে ঢাকা শহরে তাঁহাদেরই া-বাগ নামে একটি বাগানের রক্ষক হন। মায়ের "আনন্দময়ী" নাম একটি ক্তের দত্ত; মায়ের সম্পর্কে তাঁহার স্বামীকে "ভোলানাথ"* নামে অভিহিত রা হয়। মায়ের সম্বন্ধে এখন অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; আমার হোদর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমান্ অমূল্যকুমার দত্তগুপ্তও একখানি ানাতথ্যপূর্ণ সুপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছেন। উহার নাম "শ্রীশ্রীআনন্দময়ীপ্রসঙ্গ"; পর্যন্ত উহার দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অবশ্য আমার প্রথম দর্শনের য়েক বৎসর পরের কথা।

যে সময়ের কথা হইতেছে তাহার দুই বৎসর পূর্বে খ্রীঃ ১৯২৮ সনে আমি ঢাকায়

* ইংরাজী ১৯৩৮ সনে ভোলানাথ হরিদ্বারে দেহরক্ষা করেন, তাহার অল্প পূর্বে তিনি মা হইতেই ্যাস এবং "ত্রিগুণানন্দ" নাম প্রাপ্ত হন।

একটি সাধিকার কথা শুনিতে পাই, তিনি নাকি অধিক সময় সমাধিস্থ হইয়া নিশ্চল নিঃস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকিতেন। কৌতূহলবশে আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত একদিন তাঁহার তদানীন্তন আবাসস্থলেও গিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তখন গৃহে ছিলেন না, কোনও ভক্তের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিনিই এই আনন্দময়ী মা; নাম তখন শুনি নাই—বোধ হয় খুব প্রচারিত হয় নাই। আমি ঢাকায় অল্পদিন ছিলাম; দ্বিতীয়বার দর্শনের চেষ্টা করি নাই। আমার সহোদরের মুখেও ইঁহার কোনও কথা তখন শুনি নাই। সেও তখনও যাতায়াত আরম্ভ করে নাই। মাকে পরে আমি বহুবার দেখিয়াছি, তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ এ পুস্তকে প্রাসঙ্গিক নহে। প্রথম দিনের দর্শনে ও উপদেশে আমি উপকৃত বোধ করিয়াছিলাম বলিয়া সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দিতেছি; আশা করি অন্তেও তদ্বারা উপকৃত হইবেন।

সকলেই জানেন মায়ের মূর্তি অতি মনোহর, সাক্ষাৎ পার্বতীর মত। আমি যখন প্রথম দেখি তখন তাহাতে একটা সর্বকালীন তদ্‌গতভাব থাকিত। তাকাইয়া থাকিলেও বাহিরের কাহারও দিকে তাকাইয়া আছেন এরূপ বোধ হইত না। কেহ প্রশ্ন করিলে, একটু মৃদু হাস্ত করিয়া তাহার উত্তর দিয়াই আবার যেন ডুবিয়া যাইতেন। তখন তিনি খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলিতেন; সে ভাষা হাস্তসংবলিত প্রকাশ আমার কাছে বড়ই মধুময় লাগিতেছিল। কখনও কখনও তিনি প্রশ্নের উত্তর দিয়া শিশুর মত খিল্‌ খিল্‌ হাসি হাসিতেন।

সেদিন গুরুতত্ত্বের কথা হইতেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যদি সরলভাবে ভগবান্‌কে ডাকি, তাহাতে কি ফল হইতে পারে না? মাঝখানে আবার গুরু কেন?"

মা। গুরুর প্রয়োজন আছে; তুমি সরলভাবে তাঁকে ডাক, তাতেই তোমার গুরু পাওয়ার অবস্থা আসিবে। তিনিই গুরু আনিয়া দিবেন। গুরু না হইলে তাঁহাকে ধরা যায় না। তোমার যদি গুরুতে বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে আপাততঃ গুরু খুঁজিবার দরকার নাই। তুমি তাঁকে ডাকিয়া যাও।

আর একজন প্রশ্ন করিলেন, "গুরু ভাল মন্দ বিচার করা যায় না কি?"

মা। বিচার কিরূপে বন্ধ করিবে? বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তুমি ইচ্ছা না করিলেও বিচার আসিবে।

প্রশ্ন—এক গুরু ত্যাগ করিয়া অন্ত গুরু গ্রহণ করা যায় কি না?

মা। গুরু লোকের একই হয়। একজনকে ছাড়িয়া আর একজনকে ধরিলে পরে জ্ঞান জন্মিলে দেখা যায় তিনিই ইনি। তিনি যেটুকু কৃপা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই ইঁহাকে পাওয়া গিয়াছে। গুরু সর্বঘটে একই। যেমন উননে আগুন; কাঠ ভিন্ন ভিন্নই থাকে, যখন জ্বলে তখন আগুন একই হয়। ঐ কাঠগুলি এক একটি গুরুর মত। কাঠ ধরিলে আগুন পাওয়া যায়।

গোপীনাথ নাদ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ইহার পূর্বে একদিন নাদ কোথা হইতে উঠে সে সম্বন্ধে মায়ের সহিত তাঁহার কথা হইয়াছিল। আজ গোপীনাথ বলিলেন, "নাভি হইতে যখন প্রণ।যোগে নাদ উঠে তখন কি অবস্থা হয়?"

মা। নাদের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি—এ দেহ হইতে পৃথক হইতেছি। অথচ জ্ঞান থাকে। সে অবস্থাটা ইচ্ছাবশে আসেও না, ইচ্ছা করিয়া থামাইতেও পারি না। দেহসম্বন্ধে এতটা বিস্মৃতি আসে যে, আমি যে একজন মেয়েমানুষ তাহা ভুলিয়া যাই। দেহের খবর থাকে না। হয়ত প্রস্রাবাদির বেগ আসিয়াছে, এমন সময় ঐ অবস্থাটা আসিল। তার পরে কত ঘণ্টা সময় চলিয়া যায়, দেহের কার্য আর হয় না। ঐ অবস্থাটা চলিয়া গেলে দেখা যায়, প্রস্রাবের বেগ যতটুকু পূর্বে ছিল ততটুকুই আছে।

এই বলিয়া মা খিল্ খিল্ করিয়া তাঁহার অপূর্ব হাসি হাসিলেন।

ইহার পরে কীর্তন হইল। কীর্তনগায়ক পাটনা হাইকোর্টের উকিল আমারই পূর্বতন ছাত্র শ্রীমান্ বাবু নবদ্বীপ ঘোষ, এম্. এ., বি. এল্.। বড় মধুর গান হইল। গানের সময় শ্রীমান্ নবদ্বীপকে চিনিতে পারি নাই; বস্তুত গায়কের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাই নাই। পরদিন প্রাতে গোপীনাথের বাসায় তাহাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম।

ঐ দিনই আশ্রম হইতে সতীশ দে দাদা, বিজয় দাদা ও শ্রীমান্ নবদ্বীপের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মাকে দর্শন করিতে যাই। তৎপূর্বে মা না কি কয়েক ঘণ্টা সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিন কথাবার্তা বেশী কিছু হয় নাই। তৃতীয়বার দর্শন হয় হাবড়া শালিখায়, সঙ্গে ছিলেন বন্ধু অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত যশোদা-নন্দশোর বর্ধন। তারিখ ৪ঠা কার্তিক অর্থাৎ আমার কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনের দুদিন পরে। আমরা প্রাতঃকালে গিয়াছিলাম। মা তাঁহার এক আত্মীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন।

আমরা একতলায় একটি ছোট প্রকোষ্ঠে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মা নীচে আসিলেন, সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ এবং আর একজন গৈরিকবসনধারী বৃদ্ধ। আমরা কম্বলে বসিয়াছিলাম; মার জন্য একখানি স্বতন্ত্র আসন রাখা হইয়াছিল। মা কিন্তু আসিয়া মাটিতে বসিলেন।

আজ মায়ের বাহ্যভাব স্পষ্টতর। আমি বলিলাম, "মা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা না হইলে ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না একথা সকলেই বলে। অথচ ঐ জিনিসটির অভাব আমাদের বড়ই বেশী। বিশ্বাসের দৃঢ়তা কিসে হয়?"

মা। তাঁর দয়া হইলেই হয়।

যশোদাবাবু। সাধারণ লোকের কি কর্তব্য?

মা। তাঁকে ডাক; তিনিই বলিয়া দিবেন।

যশোদাবাবু। তাঁর চিন্তা যখন করি, তখন মনে কখনও কালীমূর্তি আসে, কখনও দুর্গামূর্তি আসে, কখনও বা কৃষ্ণমূর্তি আসে। ইহাতে কোনও বিঘ্ন বা ফলে তারতম্য হয় কি ?

মা। না। যেমন ধর এই ঘরটা। এতে আসিতে এই দরজা দিয়াও ঢুকিতে পার, ঐ দরজা দিয়াও ঢুকিতে পার।

আমি। গুরু হইলে বোধ হয় যে, একটা নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলা অভ্যাস করা যায়।

মা কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু যশোদাবাবু (ইনি তখনও অদীক্ষিত) একটি অভীষ্ট প্রশ্ন করিবার সুযোগ পাইলেন। বলিলেন, "গুরুর কোনও প্রয়োজন আছে কি ?"

মা। হাঁ; মন্ত্রচৈতন্য আছে ত ?

যশোদাবাবু। তা হ'লে আমাদের (অর্থাৎ যাহাদের গুরুকরণ হয় নাই) কি কর্ত্তব্য ?

মা। যা' করিতেছ, তা'ই করিয়া যাও।

আমি। মা, জপ ত করি, মুখে জগদম্বাকে ডাকি, কিন্তু মনে অন্য হাজার চিন্তা আসে।

মা। তা' হবেই ত। তবু তা'তেও উপকার হয়। যা'ই চিন্তা কর, তাঁর যে নাম করিতেছ, ইহাতেও তাঁর দয়া আছে।

যশোদাবাবু। শুধু শুধু (অর্থাৎ ভাব ছাড়া) যদি কেবল নাম নেই তা'তে কিছু উপকার হয় কি ?

মা। হয়। বিষ জানিয়াই খাও আর না জানিয়াই খাও, বিষের কাজ যা তা' হবেই।

যশোদাবাবু। যদি কিছু ভাব না থাকে, তবু কি নামে উপকার করিবে ?

মা। কিছু ভাব না থাকিলে নাম নেও কেন ?

আমি। খাদ্যাখাদ্যের সঙ্গে ভগবানকে ডাকার কোনও সম্বন্ধ আছে কি ?

মা। যেমন খাইতেছ, তেমনই খাইবে। কোনওটা ছাড়িতে গেলেই ছাড়া যায় না, বরং বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। সময় হইলে তিনিই ছাড়াইয়া দেন, খাওয়া থাকে না। ভগবানের স্বাদ পাইলে আর খাদ্য খাওয়াতে পূর্ব্বের মত রুচি থাকে না।

কথায় কথায় ভোলানাথ বলিলেন, ঐ দিন বিকালে প্রসিদ্ধ গায়ক ব্রজেন গাঙ্গুলী আসিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইবেন। কীর্ত্তন ঐ বাড়ীর কাছেই অপেক্ষাকৃত একটা বড় বাড়ীতে হইবে। মা বলিলেন, আরও দুইজন ভাল গায়কের আসিবার কথা আছে। শুনিয়া আনন্দ হইল। বিকালে কীর্ত্তন শুনিতে আসিব সঙ্কল্প

রিয়া ফিরিবার ইচ্ছা করিলাম। বেলা প্রায় ১০টা। মাকেও একটু ক্লান্ত খিলাম; আর বসিয়া থাকা সমীচীন মনে হইল না।

বিকাল তিনটায় আবার শালিখায় গেলাম। গিয়া দেখিলাম, একটি হলে জেন্দ্র গাঙ্গুলী-প্রভৃতি গায়কগণ সমবেত হইয়াছেন, মা সন্নিহিত একটি প্রকোষ্ঠে াছেন। দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যে দরজা আছে। মা দরজার মধ্যস্থলে স্ত্রীমণ্ডলী-ষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন।

প্রথমে দুইটি সুকণ্ঠ ও সুশিক্ষিত গায়ক গান করিলেন। পরে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী ইবার কীর্তন করিলেন। মাকে প্রথমে উপবিষ্ট অবস্থায় ভাবস্থ দেখা গেল; রে কিছুক্ষণ নিঃসংজ্ঞবৎ পড়িয়া ছিলেন। গানের শেষ দিকে মায়ের মুখ হইতে পূর্ব হাসি ঝরিতে লাগিল। তাহাতে বড়ই সুশোভন দৃশ্য হইয়াছিল।

ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর কীর্তনের সময় ভোলানাথের মধ্যেও অপূর্ব ভাব লক্ষ্য রিয়াছিলাম।

এখন শ্রীশ্রীবাবার কথায় ফিরিয়া যাওয়া যা'ক। ১৯শে আশ্বিন বিকালে শ্রীযুক্ত াপীনাথ শ্রীমান্ নবদ্বীপ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে আসেন। নবদ্বীপ ইতঃপূর্বে ার কখনও বাবাকে দর্শন করেন নাই। গোপীনাথের মুখে বাবা নবদ্বীপের রিচয় পাইয়া তাঁহাকে দুইটি গান শুনাইতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার কণ্ঠে টি গান শুনিয়া খুব প্রীতিলাভ করেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম; শ্রোতৃগণ কলেই একবাক্যে নবদ্বীপের গানের প্রশংসা করেন।

শ্রীমান্ নবদ্বীপের গান হইবার একটু পরে স্থানীয় একটি ধনিপুত্র—নাম শুনিলাম দররাম—বাবার নিকট আসিয়া বলিল যে, তাহার অনেকগুলি আসন ও মুদ্রা দ্ধ হইয়াছে। তাহার না কি ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা বায়ু গতায়াত করে। এমত অবস্থায় াহার শরীর উর্ধ্বে উঠিবার কথা; কিন্তু তাহা কেন হইতেছে না বাবার নিকট াহাই তাহার জিজ্ঞাস্য।

বাবা বলিলেন, "তোমার বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা যায় না; সেইজন্যই দেহও ঠে না।"

লোকটি বাবাকে গণেশ-মুদ্রা ইত্যাদি কয়েকটি মুদ্রা দেখাইল এবং বলিল, যে জিদে আজান হইতে থাকিলে সে গণেশ-মুদ্রা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া তে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করা হয় নাই। সে আরও লল যে, দৃষ্টিদ্বারা সে অন্যের নাড়ীর গতি বন্ধ করিতে পারে। বাবা বলিলেন, ার না, আচ্ছা পরীক্ষা হউক।" পরীক্ষা হইল, দেখা গেল যে, সত্যই সে তাহা রে না।

আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোপীনাথের সঙ্গে উক্ত বিষয়ের আলোচনা-লে শুনিলাম, মাঝে মাঝে দুই-একজন বুজরুক বাবার কাছে আসিয়া বলে,

তাহাদের এ সিদ্ধি হইয়াছে ও সিদ্ধি হইয়াছে ইত্যাদি। অনেক সময় বাব তাহাদের চক্ষুর দিকে তাকাইয়াই বলিয়া দেন যে, তাহাদের সেসব কিছুই হ নাই। যাহাদের সাহস বেশী তাহারা পরীক্ষায় ধরা পড়ে। অনেকে পরীক্ষা রাজিই হয় না। দুই একজন আবার বাবাকেও পরীক্ষা করিতে আসে গোপীনাথ একটি ঘটনার কথা বলিলেন। ইহা তিনি গুরুভ্রাতা রায় বাহাদু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বমুখে শুনিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ :—

একদিন এক সন্ন্যাসী গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আসেন। সন্ন্যাসীর নিক একটি শিবলিঙ্গ ছিল, উহা এরূপ জ্যোতির্ময় ছিল যে, কেহ উহার দিকে একদৃষ্টি বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। যোগীরা তাঁহাদের যোগসামর্থ্য অনুসা কেহ একটু বেশী সময়, কেহ অল্প সময় উহার উপরে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিতেন কোন্ যোগী কিরূপ শক্তিসম্পন্ন তাহা ঐ লিঙ্গটি দিয়া পরীক্ষা করা চলিত ; এ সন্ন্যাসীটি তাহাই করিত। সে গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মুখে বাবার কথা শুনি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে ; সেইজন্য তিনি তাহাকে নিয়া বাবার কাছে যান সন্ন্যাসী বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দে তাঁহাকে লিঙ্গটি দেখাইয়া উহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে বলে। বাবা লিঙ্গ হাতে নিয়া দেখিয়া সন্ন্যাসীকে বলেন,—"এটি কি তোমার ?"

সন্ন্যাসী। যদিও ঠিক আমার নয়, তবে এখন আমারই বলা যায়।

বাবা। যদি এটি নষ্ট হয় ?

সন্ন্যাসী। হয় ত হইবে।

তখন বাবা লিঙ্গটিকে এক স্থানে স্থাপন করাইয়া সকলকে একটু তফা দাঁড়াইতে বলিলেন। সন্ন্যাসীও বাবার কথায় একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁ দিকে তাকাইয়া রহিল। তার পর বাবা লিঙ্গটির দিকে কয়েক সেকেণ্ড দৃষ্টি নি করিবামাত্র তাহা চটাং করিয়া ফাটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী অবাক্ ; সে ঐ মহামূল্য দ্রব্যটির এইরূপ পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। উ কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে, জল আসিল। বাবা বলিলেন, "ক কেন ?"

সন্ন্যাসী। পরের এমন মূল্যবান্ জিনিষটি নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।

বাবা। (হাসিয়া) বাপু, যে ভাঙ্গিতে পারিয়াছে সে গড়িয়াও দিতে পারি এমন কর্ম আর কখনও করিও না। যাহাকে পরীক্ষা করিবে তাহার শরীরে কম থাকিলে তোমার কি অনিষ্ট না হইতে পারে ?

তারপর বাবা লিঙ্গের খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া করতলে লইয়া বায়ুতে ইত কিছুক্ষণ হস্ত সঞ্চালন করা মাত্র লিঙ্গটি পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। সন্ন্যা তাঁহার এই অসাধারণ শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিল, কিন্তু ব অনেক প্রার্থনায়ও তাহাকে শিষ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

২০শে আশ্বিন আমার কলিকাতায় ফিরিবার দিন। ঐদিন আশ্রমে বাবার ানও শিষ্য (বোধ হয় ইদানীং পরলোকগত এটর্নি ননী দত্ত) শিবপ্রতিষ্ঠা রিতেছিলেন। মধ্যাহ্নে আমার ও গোপীনাথের তথায় প্রসাদপ্রাপ্তির নিমন্ত্রণ ল। গোপীনাথের শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া যান নাই। আমিও বাড়ীর জন্য ছু কাপড় ক্রয় করিতে গিয়া বড় বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলাম; কাজেই আমারও সাদপ্রাপ্তির জন্য আশ্রমে যাওয়া সম্ভব হইল না। বাসাতেই আহার করিয়া স্ত জিনিষপত্রসহ ট্রেনের সময়ের কিছু আগে আশ্রমে গেলাম। তথায় শ্রীবাবার পদপ্রান্তে পনর-কুড়ি মিনিট কাল বসিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার নিকট দায়গ্রহণ করিলাম। বলিলাম, "বাবা, অপরাধ যথেষ্টই আছে এবং হইবে। জগুণে ক্ষমা করিয়া নিবেন!"

বাবা। বাপের কাছে আবার ছেলের অপরাধ কি রে বাপু? তবে বাপ মন ছেলের দোষ দেখলে গাল-মন্দ দেয়, তেমনি গাল-মন্দ কিন্তু খেতে হবে।

আমি। বাবা, তাতেই যেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

বাবা হাসিলেন।

ঐদিন রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় এবং গুরুপুত্র পূজনীয় াদাদা বর্ধমানে ফিরিতেছিলেন। তাঁহারা অন্য এক কামরায় ছিলেন। রায় হেব-দাদা আমাকে গাড়ীতেই বার্থের (berth-এর) উপর বসিয়া সন্ধ্যার পরদিন প্রভাতের কর্তব্য জপ সম্পাদন করিবার উপদেশ দিয়া সবিশেষ উপকারই রিয়াছিলেন, নচেৎ সন্ধ্যার জপ বাদ পড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনাই ছিল। কেননা মি এ ক্ষেত্রে তখন প্রাথমকল্পিক; পদে পদে ভুল-ত্রুটি স্বাভাবিক। ঐ দিন ীর রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ ছিল। তখনও বসিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিতে পারিলে ভাল ত; রায় সাহেব-দাদা দয়া করিয়া সেরূপ উপদেশও দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশে মি জাগিয়া থাকিতে পারি নাই; গ্রহণের স্থিতিকালে নিদ্রাভঙ্গও হয় নাই।

২৪শে আশ্বিন বাবাকে পত্রে প্রণাম জানাইয়া লিখিলাম, বাবার উপদেশ মত ানিয়মে ক্রিয়া করিয়া যাইতেছি। ত্রুটি ইত্যাদি যথেষ্টই হইতেছে; যখনই ত্রুটি ঝিতে পারি বৈষ্ণব কবির ভাষায় মনে মনে বাবাকে বলি—প্রভু,

আমার স্বভাব অপরাধ করা
তোমার, করিতে ক্ষমা;
জনমে জনমে জীবনে মরণে
এ সম্বন্ধে তোমা আমা।

আমার যাহাতে একটা গতি হয় বাবা যেন দয়া করিয়া তাহাই করেন, এই র্থনা।

২৮শে আশ্বিন তারিখে বাবার উত্তর পাইয়া ধন্য হইলাম। লিখিয়াছেন—

"......পিতা সর্বদাই পুত্রের মঙ্গল জন্য পরমমঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করে এবং তাহাতেই শুভ হয়। আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হইতে পারে, পরে সমস্ত বুঝিতে পারিবে এবং কার্য্য করিতেও সক্ষম হইবে।..."

বাবার এই প্রথম পত্র। পাইয়া যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। পরে বাবার বহু পত্র পাইয়াছি—প্রত্যেক পত্রেই স্নেহপূর্ণ আশ্বাসের কথায় শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছি; কিন্তু এই প্রথম পত্র পাইয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহার কথা এ জন্মে ভুলিবার নয়। অজস্র আনন্দ, আশ্বাস, আশা, ভরসা, অভয়ের এই উৎস আজ কয়েক বৎসর যাবৎ শুকাইয়া গিয়াছে। সে যে কত বড় একটা ক্ষতি তাহা অনুরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বুঝিবে না। যদি সাধন করিয়া তেমন উন্নত হইতে পারিতাম তাহা হইলে চিত্তের ভিতরে তাঁহার বাণী পাইতে পারিতাম, হয়ত কাণেও শুনিতে পাইতাম,—অনেকের এ অবস্থা হইয়াছে শুনিয়াছি। শেষ পর্যন্ত হয়ত বাকীর খাতায় কেবল আমারই নাম থাকিয়া যাইবে।

আট

কলিকাতায় আমার প্রত্যাবর্তনের পর চারি মাসের কিছু অধিককাল কেবল যে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য ঘটিতে পারে নাই তাহা নহে, এক রায় সাহেব (ননীলাল মুখোপাধ্যায়) ব্যতীত অপর কোনও গুরুভাইয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নাই। রায় সাহেব-দাদার আফিস (জেল ডিপো) তখন ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে হইলেও কর্মোপলক্ষে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে রাইটার্স বিল্‌ডিংসে (Inspector General of Prisons-এর আফিসে) আসিতে হইত। ঐ সময়ে স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যবশে তিনি আমাকে পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য দেখা দিয়া যাইতেন এবং শ্রীশ্রীবাবার যতটুকু সংবাদ তাঁহার জানা থাকিত তাহা আমাকে বলিতেন। দীক্ষার পর হইতে তাঁহার লীলা-কাহিনী শুনিবার জন্য প্রবল আগ্রহ মনে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কিন্তু তাহার তর্পণের কোনও উপায় ছিল না। রায় সাহেবের বাড়ী ছিল ১নং লাড্‌লক ষ্ট্রীটে, ভবানীপুরে। উহা আমার তদানীন্তন আবাসস্থল হাতীবাগান (উত্তর কলিকাতা) হইতে বহু দূরে। কাজেই তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া বাবার কথা শুনা ঘটিয়া উঠিত না। তদ্ভিন্ন শুনিয়াছিলাম, কর্মোপলক্ষে তাঁহাকে প্রায়ই মফস্বলে নানাস্থানে যাইতে হয়। কলিকাতায় অন্য কোনও গুরুভ্রাতার সহিত আমার বিশেষ পরিচয়ও ছিল না এবং কাহারও বাড়ীর বা

বাসার ঠিকানাও আমি জানিতাম না। এইজন্য খুব একটা অসুবিধা ও অতৃপ্তিই বোধ হইতেছিল।

অন্যদিকে এই সময়ে একটি দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কন্যা শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া আমার মন বড়ই চিন্তাকুল করিয়া ফেলে। সকালে ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ ধরিয়া আহ্নিক করিতাম বটে, কিন্তু মেয়েটির চিন্তা সর্বক্ষণ মন আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত। একদিন শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে শুনিতে পাইলাম, কে যেন আমাকে বাহির হইতে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "অক্ষয়, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ? এর কয়েকটা দিন ভোগ আছে, তারপর ভাল হ'য়ে যাবে।" কে যে এই কথাগুলি বলিলেন তাহা স্বপ্নেও বুঝি নাই, স্বপ্নভঙ্গেও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। সংশয়ের মধ্যে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরে বাবাকে চিঠিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিই কি দয়া করিয়া ঐ শুভ আশ্বাস আমাকে দিয়া গিয়াছেন? কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না। মেয়ের অবস্থা আজ একটু ভাল, কাল একটু খারাপ—এইভাবে চলিতে লাগিল।

আমি গীতা পড়িতাম। দীক্ষার অন্তে শ্রীশ্রীবাবাও নিজ হইতে আমাকে বলিয়াছিলেন, "ইচ্ছে হইলে আহ্নিকের পর গীতা পড়িতে পার।" গীতার উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্মের বা ভগবৎপ্রীতিকামনায় কৃত কর্মের আদর্শ আমার খুব ভাল লাগিত। আর যে ভক্তির আদর্শ উহাতে স্থাপিত হইয়াছে তাহাও শুদ্ধা ভক্তির, কামনামূলক ভক্তির নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আধুনিক কালের ধর্মসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্রেই ঐ আদর্শেরই মহত্ত্ব কীর্তিত হইয়াছে। মনু অবশ্য বলিয়াছেন, "কামাত্মতা ন প্রশস্তা"—ধর্মে কামনামূলক প্রবৃত্তি প্রশস্ত নয় বটে, কিন্তু "ন চেহাস্ত্যকামতা"—কামনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া ধর্মকার্য করাও সংসারে (প্রায়) নাই। লোকে কামনাপূর্বকই পরিশ্রমস্বীকার করিয়া বেদ অধিগত করে। বৈদিক কর্মযোগও কামনামূলক। কামনার মূলে আছে সংকল্প অর্থাৎ এই কর্মে আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে এইরূপ বুদ্ধি; সেই সংকল্প হইতেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, ব্রত ও নিয়মধর্ম সকলও সংকল্পজ। "অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কস্যচিৎ"—এ সংসারে সম্পূর্ণ কামনাহীন লোকের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। অতএব শুদ্ধভাবে কামনায় অবস্থিত হইয়া কর্ম করিলে তদ্দ্বারাই উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। মনুর এই মত অপেক্ষাকৃত realistic অর্থাৎ বাস্তবজগতের সহিত অধিক সঙ্গত; আর ধ্রুব ইত্যাদির মধ্যে দেখাও গিয়াছে কামনা হইতে প্রথমে কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও অলক্ষিতভাবেই কামনার ঊর্ধ্বে চলিয়া যাওয়া যায়। যতদিন পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করা হয় নাই ততদিন গীতার আদর্শবাদের উপরেই আমার পক্ষপাত অধিক ছিল। বন্ধুগণের সঙ্গে আলোচনাকালেও উহারই মাহাত্ম্য স্বীকার্য ছিল; অন্যবিধ ধর্ম নিকৃষ্টকল্প বলিয়া উপেক্ষণীয় মনে হইত। সেইজন্য পূর্ব হইতে আমার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা ছিল যে, ঐহিক প্রয়োজনে ভগবান্‌কে বা গুরুকে ডাকিব না; একান্ত

নিষ্কামভাবে, কর্তব্যবুদ্ধি হইতে, ভগবানের আরাধনা করিয়া যাইব। কিন্তু আমার কন্যার কঠিন ও দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া আমাকে ঐ কেতাবী আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন, টিয়া পাখী নিরাপদে দাঁড়ে বসিয়া রাধাকৃষ্ণ বুলি কপ্‌চায়; কিন্তু বিড়াল দেখিলেই তাহা ভুলিয়া গিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিতে থাকে। আমারও সেই দশা হইল। ইচ্ছা হইত কন্যার রোগমুক্তি প্রার্থনা করিয়া গুরুদেবের নিকট পত্র লিখি। কিন্তু উক্ত কারণে তাহা গর্হিত মনে হইত। তিনি রোগের চিকিৎসা ও যোগজ্যোতিষ ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছিলাম। হয়ত আমার এই অবস্থা আসিতেছে ইহা জানিয়াই তিনি অযাচিত আমাকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার নিকট ঔষধ চাহিতেও সাহস হইত না। অথচ নিষ্কামতাও রক্ষা করিতে পারিতেছিলাম না। অগত্যা মনে মনে তাঁহার ও ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম মেয়েটা যেন রক্ষা পায়। শেষ পর্যন্ত তাহাই করিয়াছি; মনের কামনা মুখে ব্যক্ত করিতে পারি নাই। অবশ্য যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে কোনও ত্রুটি করি নাই।

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির উৎসবের পরে শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতায় আসিলেন। তিন-চারি দিন পরে সে সংবাদ রায় সাহেব-দাদাই আমাকে আফিসে দিয়া যান। যে দিন সংবাদ পাইলাম সেই দিনই আফিস হইতে ৭নং কুণ্ডু রোডে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসুর বাটীতে তাঁহার শ্রীচরণদর্শনার্থ গেলাম। শ্রীযুক্ত যোগেশ দাদা কলিকাতা কর্পোরেশনের কালেক্টার ছিলেন, তখনও চাকুরীতে আছেন। শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতায় আসিলে সাধারণতঃ প্রথমে তাঁহার বাটিতেই কয়েকদিন থাকিয়া পরে ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনে যাইতেন। এই শেষোক্ত বাটীতেই দীক্ষার পূর্বে আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম।

ঐ বাটীও একজন শিষ্যের, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের। যোগেশ-দাদা ও বিধুদাদা উভয়েই এখন পরলোকে। বিধুদাদা সবিশেষ সম্পত্তিপন্ন লোক ছিলেন। তিনি ঠিকাদারী (কণ্ট্রাক্টারী) করিতেন। দীক্ষার পরে তাঁহার ব্যবসায়ের খুব উন্নতি হয় এবং তৎসঙ্গে উপচীয়মান গুরুভক্তি হইতে তিনি শ্রীশ্রীবাবার সেবায় অকাতরে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। কাশীর "বিশুদ্ধানন্দকানন" আশ্রম নির্মিত হইবার কালে তিনি নগদ ও নির্মাণ-উপকরণে দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তৎপর তিনি রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাটীটি ক্রয় ও উহার সংস্কারাদি সাধন করিয়া উহা শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাসের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। গুরুদেব ঐ স্থানে না থাকিলেও উহা তিনি অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেন না। ঐ বাটীটিতে গুরুদেবের অবস্থানকালে তাঁহার সেবার ব্যয়ও তিনি বহন করিতেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশদাদার বাটী ছিল তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন। উহাতে তিনি গুরুদেবের বাসের জন্য বহুব্যয়ে স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্মাণ ও অন্যান্য সুব্যবস্থা

করিয়াছিলেন। দ্বিতলে বড় একটি হল তাঁহার বসিবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উহার একপ্রান্তে একখানি তক্তপোষে তিনি বসিতেন। অপর প্রান্তে তাঁহার একখানি সুবৃহৎ মনোহর কৃত্রিমপুষ্পপত্রাদি-কারুকার্যমণ্ডিত প্রতিকৃতি প্রশস্ত ফ্রেমের ভিতর রক্ষিত ছিল। শুনিয়াছি প্রতিকৃতি খানি বাঁধাইবার ব্যয়ই চারিশত টাকা পড়িয়াছিল। হলের মেঝেতে একখানি বৃহৎ ও বহুমূল্য গালিচায় শিষ্য ও দর্শনার্থী অন্য ব্যক্তিগণের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। মোটের উপর এ বাটীর সকল ব্যবস্থায়ই একটা বুনিয়াদী বড়মানুষী ভাব পরিস্ফুট ছিল।

আমি আসিয়া দেখিলাম বসিবার হলটি লোকে পরিপূর্ণ। শ্রীশ্রীগুরুদেবের আলাপ হইতেছিল মুখ্যভাবে Servant পত্রিকার সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে। প্রণাম করিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া একটু দূরে বসিতে হইয়াছিল। কাজেই আলাপ আমি বিশেষ শুনিতে পাই নাই। তা' ছাড়া আমার পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীবাবা বৈকালিক ভ্রমণ জন্য উঠিয়া পড়েন। কাজেই তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনও কথা হয় নাই। কিন্তু কোনও বিষয়েই বোধ করি তাঁহার অনবধানতা ছিল না; তিনি বাহিরে যাইবার সময়, আমি দূরে দণ্ডায়মান থাকিলেও, বহুশিষ্যমধ্যে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "অক্ষয়, তুমি কাল আবার এসো।"

পরের, বিশেষতঃ বড়লোকের বাড়ী; সকলেই অপরিচিত; সঙ্কোচের সঙ্গেই গিয়াছিলাম; সঙ্কোচের সঙ্গেই নামিয়া আসিলাম। কাহারও সঙ্গে আলাপ হইল না। যাচিয়া আলাপ করা আমার স্বভাবও নহে। পরদিন আবার গেলাম। এদিনেও দেখি ঘরভরা লোক, আর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ও আছেন, এবং তাঁহার সঙ্গেই বাবার আলাপ চলিতেছে। বাবা বলিতেছেন, অন্য কাজে লোক কত সময় নষ্ট করে; দেখিতে দেখিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। আর জপ করিতে বসিয়া দশ-পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেলে মনে করে অনেক সময় এ কাজে দেওয়া গেল। একবার এইরূপ একজনকে ঘড়ি দেখাইয়া জপে বসান হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল আধঘণ্টা জপ করিয়া উঠিবে। সে যখন উঠিয়া আসিল তখন ঘড়ি দিয়া তাহাকে দেখান হইল যে, মাত্র পাঁচ মিনিট জপ করিয়াছে। চক্রবর্তী মহাশয় শুনিয়া হাসিলেন। বাবা বলিতে লাগিলেন, "তবে ইষ্টমন্ত্র অল্পক্ষণ জপেও কাজ হয়। অল্প বিষ জীবন নাশ করিতে পারে; অল্প ঔষধ মৃত্যুমুখ হইতে ফিরায়।" চক্রবর্তী মহাশয় প্রবোধসূচকভাবে মাথা নাড়িলেন। এ দিনও বাবা আমার পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরে উঠিয়া যান ও আমাকে কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া কৃতার্থ করেন।

দেখিলাম শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় বিলাসীপাড়ার জমিদার নৃপেন্দ্র রায় চৌধুরীদাদার গাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া গেলেন। পূর্ব দিনও তাহাই করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তিনি যে বাবার

শিষ্য নহেন তাহা আলাপের প্রকারেই বুঝিয়াছিলাম। তিনি মোট কতদিন আসিয়াছিলেন তাহাও শুনি নাই। আমি আর তাঁহাকে আসিতে বা যাইতে দেখি নাই—তবে আমিও ত প্রত্যহ যাইতাম না। চক্রবর্তী মহাশয় বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মে তাঁহার অনুরাগের কথা পূর্বে শুনি নাই। Servant পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ থাকিত—তাহার অন্য একটা কারণ ছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, পরে বুঝিয়াছিলাম চক্রবর্তী মহাশয় এই সময়ে ধর্মের দিকে খুব ঝুঁকিয়াছিলেন। কেননা মাস তিনেক পরে—আষাঢ় মাসে—তাঁহাকে আমি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নগ্নপদে ও অনাবৃতগাত্রে একদল কীর্তনকারীর সঙ্গে নৃত্যগীত করিতে দেখিয়াছিলাম এবং শুনিয়াছিলাম ঐ মাসটি (১৩৩৮, আষাঢ়) মলমাস ছিল বলিয়া সমস্ত মাস ধরিয়াই তিনি ঐ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় নাম বিতরণ করিয়াছিলেন।

আমি প্রায়ই অফিসের পরে বাবার কাছে যাইতাম। ঐ সময়ে বহু অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে অধিক আলাপাদি করা সম্ভব হইত না, সঙ্কোচবোধও হইত। কেবল তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হওয়া পর্যন্ত পদপ্রান্তে বসিয়া থাকিয়া চলিয়া আসিতাম।

এইভাবে ২৯শে ফাল্গুন আসিয়া পড়িল। এটি ছিল শ্রীশ্রীবাবার জন্মদিন (জন্মতিথি নহে); ঐ দিনে শিষ্যগণ তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন। এবারেও জন্মোৎসব হইল। যোগেশ দাদার গৃহেই হইল। রায় সাহেব ননীদাদা বারজন শিষ্যের নামযুক্ত একখানি মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র আমাকে আফিসে কয়েকদিন পূর্বে দিয়া বলিয়া যান, "উৎসবে অবশ্য যাবেন, সকাল সকাল যাবেন, এবং বাবার জন্য কিছু প্রণামী নিবেন।" আমি যে ঐ বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ এবং কর্তব্য বোধহীন তাহা বোধ করি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রায় সাহেব-দাদার বুঝিতে বাকী ছিল না, সেইজন্য তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমি। প্রণামী অবশ্যই কিছু নিব ; উৎসবের ব্যয় কে দেয় ?

রায় সাহেব। ওটা শিষ্যদেরই ব্যাপার—তাহাদের ব্যয়েই হয়। যার যেমন সাধ্য সে তেমনই অর্থাৎ এক টাকা দুই টাকা হইতে একশ' দুশ' টাকা পর্যন্ত দেয়।

উৎসবের দিন দেখিলাম শিষ্যদের সকলেরই খুব উৎসাহ ও আনন্দ। কলিকাতার শিষ্যেরা বোধ করি সকলেই স্ত্রীপুত্রাদি সহ আসিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের পরস্পর কথাবার্তা হইতে মনে হইল। বেলা নয়টার মধ্যেই কুমারীভোজন ও ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গেল। বহু কুমারী ভোজন করিয়াছিলেন এবং ভুক্ত ব্রাহ্মণের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প মনে হয় নাই। শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায় ভিন্ন আমার বিশেষ

আলাপী লোক কেহ উপস্থিত ছিলেন না। রায় সাহেব বোধ করি অন্যত্র কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া দেখিলাম তিনি চিনিতে পারিলেন না, এমন কি কাশীতে আমাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াও মনে করিতে পারিলেন না। মনে দুঃখ হইল। সেই জন্য দীক্ষার পূর্বে কলিকাতার আশ্রমে বাবার যে দুই একজন শিষ্যের সঙ্গে সামান্য রকমের কিঞ্চিৎ আলাপ হইয়াছিল, তাঁহাদের সঙ্গেও আর যাচিয়া কথা বলিতে উৎসাহ হইল না। ফলে আমি জনসংঘট্টের মধ্যেও একা ও নির্লিপ্ত থাকিয়া নীরবে সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

বেলা দশটায় শ্রীশ্রীবাবার ভোগের পর তাঁহাকে নূতন পট্টবস্ত্র পরাইয়া ও নূতন গরদের পাঞ্জাবী গায়ে দেওয়াইয়া শঙ্খধ্বনি সহকারে গৃহ প্রাঙ্গণে আনা হইল। বলা বাহুল্য বস্ত্রখানি ও জামাটি তাঁহার অভ্যাসমত যোগিয়া রঙ্গে ছোপান হইয়াছিল। বাবা পত্রপুষ্পে সজ্জিত বেষ্টনের মধ্যে একখানি কেদারায় বসিলেন এবং এক পাদপীঠের উপর পদদ্বয় স্থাপন করিলেন। প্রথমে কয়েকটি কুমারী গান করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া বাবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন ও প্রণাম করিলেন। ইঁহারা সকলেই বাবার শিষ্যদিগের কন্যা বলিয়া মনে হইল। তৎপর ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ একে একে বাবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া পাদস্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিলেন। অনেকের মধ্যেই একটা ভক্তি-গদ্‌গদ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যাহাতে ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের অঞ্জলিদান অগ্রে সম্পাদিত হয় তৎপ্রতি শ্রীযুক্ত যোগেশ (বসু) দাদার সতর্কতা লক্ষ্য করিয়া, পাছে একটা অপরাধ করিয়া ভৎ'সনার পাত্র হই এই ভয়ে, আমি দুর্গাকান্ত রায় মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলাম। তিনি আমার সজাতি। শিষ্যগণ অঞ্জলিদান করিয়াই ছাদে প্রসাদ পাইতে গেলেন। আমিও গেলাম এবং প্রসাদ পাইলাম। ভূরিভোজনের বাহুল্যযুক্ত আয়োজন ছিল। যোগেশ দাদা স্বয়ং পরিবেষণের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন এবং আদর-আপ্যায়ন সহকারে সকলকে আকণ্ঠ ভোজন করাইতেছিলেন।

এদিকে শিষ্যগণ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া ছাদে ভোজন করিতে গেলে শিষ্যাগণ আসিয়া একে একে একে অঞ্জলি দেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবিতা লিখিয়া তাহা কার্পেটে তুলিয়া বাঁধাইয়া আনিয়াছিলেন।

অঞ্জলিপ্রদান শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামার্থ উপরে যান ও বেলা প্রায় তিনটায় পুনরায় নীচে নামিয়া আসেন। তখন তাঁহার সমক্ষে কিছু গীত-বাদ্য হইয়াছিল।

আমি এবৎসরের উৎসবে যদিও প্রায় নির্লিপ্ত দ্রষ্টার মতই ছিলাম, এমন কি পুষ্পাঞ্জলিদান ও ভোজনও সঙ্কোচের সহিতই করিয়াছিলাম, তথাপি এই দিনের

সকল ব্যাপার আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। অধিকাংশ শিষ্যেরই সুব্যক্ত ভক্তির ভাব আমার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। ইহাদের তুলনায় নিজ হৃদয়ের শুষ্কতা আমাকে কিঞ্চিৎ ব্যথিতও করিয়াছিল। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ' —শাস্ত্রের এই উক্তি আমার অবিদিত ছিল না বটে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর-রূপে ভাবিতে তখনও শিখি নাই। সেদিন গুরুভাইদিগের ভক্তি দেখিয়া মনের ঐ অন্ধকারময় কোণটিতে যেন নূতন আলোকের প্রথম রশ্মিপাত হইল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম।

শিষ্যেরা শ্রীশ্রীগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে খরচও খুব করেন দেখিলাম। সাত-আট শত বা তাহারও বেশী লোক সেদিন পোলাও বহুবিধ উপকরণসংযোগে আকণ্ঠ ভোজন করিলেন। শতাধিক কুমারী প্রত্যেকে আট আনা করিয়া দক্ষিণা পাইলেন। আনুষঙ্গিক খরচও বহুবিধ ছিল। পরে শুনিয়াছি যে, বার জন শিষ্য প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া খ্রীঃ ১৯২০ সনে এই উৎসবের সূচনা করেন। প্রথমবারের উৎসব হয় ডিমলার রাজকুমার যামিনীবল্লভ সেনের কলিকাতার সন্নিহিত এঁড়িয়াদহ-নামক স্থানের উদ্যানবাটীতে। প্রথম হইতেই তদুপরি অন্যান্য শিষ্যেরাও কিছু কিছু চাঁদা দিতেন। পরে শুনিয়াছি, চাঁদাতে বার-তের শত টাকা উঠিত। শিষ্যেরা প্রণামী যাহা দিতেন, তাহা গুরুদেবেরই থাকিত। প্রণামীতে সাত-আট শত টাকার মত হইত শুনিয়াছি।

যোগেশদাদার বন্দোবস্ত একেবারে নিখুঁত ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কোনও কাজ ঠিকসময়ে ও ঠিকভাবে না হইবার জো ছিল না। এরূপ সংবিধানের ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই থাকে। তিনি এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু (এম. এ.) আমাকে কাশীতে দেখিয়াছিলেন, যদিও আমি সেখানে বহুজনের মধ্যে (বিশেষতঃ কেহ পরিচয় করাইয়া না দেওয়াতে) ইহাদিগকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া আমার স্মৃতি ছিল না। যতীশ বহুপূর্বেই বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেশ নিষ্ঠা ও তৎপরতাসহকারে ক্রিয়াদি করিতেছিলেন। তিনি এদিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যসহকারে নিজ পরিচয় প্রদান-পূর্বক আমার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া কুঞ্জদাদা আমাকে না চিনিবার দরুন আমার মনে যে ক্ষোভ হইয়াছিল তাহা অনেকটা ক্ষালন করেন। পরে যোগেশদাদার অমায়িকতার বহু পরিচয় পাইয়াছি। অবশ্য তিনি একটু রাশভারি লোক ছিলেন এবং শ্রীশ্রীবাবার আরাম ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সময় সময় (সম্ভবতঃ প্রয়োজনের কিঞ্চিৎ অতিরিক্তরূপেও) একটু কড়া মেজাজ দেখাইতেন। যতীশের মধ্যে কখনও কর্কশতার লেশমাত্র লক্ষ্য করি নাই। যতীশ সত্যই একটি রত্নবিশেষ। শ্রীশ্রীবাবাও তাঁহার আধারের প্রশংসা করিতেন।

জন্মোৎসবের পরে যোগেশদাদার গৃহেই বাবার অবস্থিতিকালে একদিন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া আছি ; আরও অনেক শিষ্য উপস্থিত আছেন, কিন্তু কথাবার্তা হইতেছে না। সকলেই নীরবে বসিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার মৌন স্নেহ প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ করিতেছেন। এরূপ ভাব পরে অনেক সময়েই দেখিয়াছি এবং কথা বলিয়া তাহাতে ব্যাঘাত উৎপাদন করি নাই। কিন্তু এ সময়ে আমি ইহাতে অনভিজ্ঞ। আমার মনে হইল নীরবে সময়ক্ষেপের অপেক্ষা একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা ভাল। তাই সভার নীরবতা ভঙ্গ করিলাম, "বাবা, মন্ত্র, দেবতা, এবং গুরু না কি একই ; সাধন করিতে করিতে না কি ইহা উপলব্ধি করা যায় ?"

বাবা শিরঃস্পন্দন দ্বারা অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন। উপস্থিত শিষ্যদিগের মুখের ভাব দেখিয়া যেন বোধ হইল প্রশ্নটি তাঁহাদেরও কৌতূহল উদ্দীপন করিয়াছে এবং উহার আলোচনা চলুক ইহা তাঁহাদেরও আকাঙ্ক্ষিত। কাজেই আমি সঙ্কোচত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলাম, "কিন্তু আমরা ত ঠিক বুঝিতে পারি না ইহা কি প্রকারে সত্য। মন্ত্র ত একটি বাক্যবিশেষ ; তদ্দ্বারা দেবতাকে প্রীত করা যায়, এই মাত্রই বুঝিতে পারি ; কিন্তু তাহা দেবতার সঙ্গে অভিন্ন কিরূপে হয় তাহা বুঝি না। আর বুঝি গুরু উপদেষ্টা হইয়া দেবতাকে চিনাইয়া দেন, তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্রবলে দেবদর্শনাদি হয়। কিন্তু তিনি ও দেবতা এক একথা কিপ্রকারে উৎপন্ন হয় ?"

এইখানে স্বীকার করা আবশ্যক যে, আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়সম্বন্ধে আমি যে পুস্তকাদি হইতে ও নিজে চিন্তা করিয়া একটা উত্তর ঠিক করি নাই এবং অন্যে আমাকে এই প্রশ্ন করিলে তাহাকে যা' হ'ক একটা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতাম না তাহা নহে। তবে বিষয়টি বাবার মুখ হইতে শুনি, এবং ঐরূপে আমার জ্ঞানেরও একটা যাচাই হইয়া যাক্ এইরূপ অভিসন্ধি আমার মনে ছিল।

কিন্তু বাবা আমার বাগ্‌জালে ধরা দিলেন না ; বলিলেন, "বেশ ত একদিন কুমারী খাওয়াও, প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব—মন্ত্র, দেবতা ও গুরু কি প্রকারে এক।"

কুমারীভোজনের শর্তে আমার উৎসাহ স্তিমিত হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম সমোৎসাহ কয়েকজন গুরুভ্রাতা পাইলে না হয় চাঁদা করিয়া কুমারী-ভোজন করান যাইত ; কিন্তু উপস্থিত গুরুভাইদের মধ্যে কেহ কিছু বলিলেন না। আমার সঙ্গে তখনও অনেকেরই পরিচয়ও হয় নাই। আর তত্ত্বদর্শন জন্য অর্থব্যয় সকলের সাধ্য বা অভীষ্ট নাও হইতে পারে। আমি নিজেও এ জন্য অধিক অর্থব্যয়ে উৎসাহী নহি। কাজেই আমার প্রশ্নসম্পর্কে আলোচনা ঐখানে শেষ হইয়া গেল।

পরে বহু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম—বাবা যুক্তি দিয়া তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তদ্‌ভিন্ন তিনি অধিকারী অনধিকারী বিচারও করিতেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ তাঁহাকে যেরূপ সহজে তত্ত্বকথায় প্রবৃত্ত করাইতে পারিতেন, সেরূপ আর প্রায় কোন শিষ্যই পারিতেন না। মনে হয় তিনি ভাবিতেন যুক্তি দিয়া কিছু বুঝাইতে গেলে জিজ্ঞাসুর অধিকার অনুসারে এক একটি শুদ্ধাশুদ্ধমিশ্র ধারণা বা সংস্কারের সৃষ্টি হইবে এবং ঐ সংস্কারই তাঁহাকে যথাকালে বস্তুসাক্ষাৎকারে বাধা দিবে। সেইজন্য গোপীনাথের নিকটও তিনি অকালে কোনও কোনও তথ্য ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিয়াছেন। গোপীনাথের মুখেই শুনিয়াছি দীক্ষার কিছুকাল পরে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, ক্রিয়ারম্ভ করিলেই ঘরের ভিতর দুই চারিটি ছোট ছোট পাখী ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে; ক্রিয়া বন্ধ করিলে আর তাহারা থাকে না। প্রথম প্রথম পাখীর সংখ্যা অধিক ছিল না, ক্রমে তাহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়া গেল। তখন তিনি বাবাকে বলিলেন, "এই সব পাখী কোথা হইতে আসে এবং ক্রিয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ে এগুলিকে দেখা যায় না কেন?"

বাবা—হ্যাঁ গো, ঐরকমই হয়।

ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। আর একটি কথাও বলিলেন না। গোপীনাথও তাঁহাকে বিষয়টি ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া এবং ভিতরে কোনও রহস্য আছে মনে করিয়া সেদিন আর কিছু বলিলেন না।

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই পাখীর সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। পরে মনে হইত যে শতাধিক পাখী ঘরের ভিতর উড়িতে থাকে। তখন তিনি আবার বাবাকে প্রশ্ন করিলেন, এরূপ কেন হয়? অকারণে এত পাখী কোথা হইতে আসিয়া ঘরের ভিতরে উড়িতে থাকে?

বাবা—হাঁ, ঐরূপ হয় গো। বড্ড অসুবিধা বোধ হচ্ছে কি?

গোপী—হ্যাঁ, কিছু কিছু বোধ হইতেছে বই কি।

বাবা—আচ্ছা, তা' হ'লে কয়েকটা দিন শুধু গায়ত্রী জপ করিয়া দেখ।

গোপীনাথ তাহাই করিলেন; তিন-চারি দিনের মধ্যেই পাখীর উৎপাত উপশান্ত হইয়া গেল। সে কথা তিনি বাবাকে বলিবার পূর্বেই বাবা নিজ হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও পাখীর উৎপাত হচ্ছে কি?

গোপী। না; আর ত হইতেছে না এরূপ কেন হইল?

বাবা। এইরূপ হয় গো। ওগুলি পাখীই নয়। ক্রিয়া করিয়া যাও ক্রমশঃ সব বুঝিবে।

ঐরূপে একদিন গৌরীচরণ (রায়) দাদা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত একটি প্রশ্নসম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "শুনে কি হবে? কর্ম করে যাও।"

গৌরীদাদা শ্রীশ্রীবাবার পুরাতন শিষ্য—গোপীনাথেরই সমসাময়িক। তিনিও বাবার রীতি জানিতেন। সেদিন বাবার কথার উপরে আর কিছু বলিলেন না। কিছুদিন পরে পুরী আশ্রমে বাবার সঙ্গে বাসের সুযোগে তিনি পুনরায় সেই প্রশ্ন করেন। ঐ সময়ে এক ভিক্ষার্থিনী স্ত্রীলোক একটি অল্পবয়স্ক বালক সহ আশ্রমে আসিয়াছিল। বাবা সেই বালকটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ ছেলেটাকে স্বামী-স্ত্রীসঙ্গের সুখ বুঝাইয়া দাও দেখি। তুমি যতই ব্যাখ্যা কর, ও ঠিক বুঝিবে কি? ওর বুদ্ধি অনুসারে ও একটা ধারণা করিয়া লইবে। যোগতত্ত্ব সকলও সেইরূপ জেনো—সেগুলি বুঝিবার বস্তু নয়—প্রত্যক্ষ করিবার বস্তু। কর্ম কর, সময়ে সব প্রত্যক্ষ হইবে।"

অবশ্য এ কথাও সত্য যে, শ্রীশ্রীবাবা সকলের সঙ্গে সকলপ্রকার তত্ত্বের আলোচনায় অত্যন্ত অনিচ্ছুক হইলেও, গোপীনাথাদির মত উপযুক্ত অধিকারীর নিকট মৌলিক তত্ত্ব সকল ব্যক্ত করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এমন কি, শিষ্যের অধিকার ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তৎসমুদায় বিশ্লেষণ করিয়াও বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রকারে তাঁহার মুখ হইতে যে সকল মৌলিক তত্ত্ব গোপীনাথ শ্রবণ করিয়াছিলেন সেইগুলি আংশিকভাবে তিনি "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপ্রসঙ্গ" দ্বিতীয় ভাগে নিজস্ব ভঙ্গীতে ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরের আকারে সাজাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের পাঠকগণ যেরূপ একস্থানে সংক্ষেপে শ্রীশ্রীবাবার জীবনকথা শুনিয়াছেন, সেইরূপ তৎকর্তৃক উপদিষ্ট মৌলিক তত্ত্বগুলিসম্বন্ধেও সংক্ষেপে একস্থলে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইবেন ইহা স্বাভাবিক মনে করি। সেইজন্য এই স্থানে সেই বিষয়েরই অবতারণা করা যাইতেছে।

মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও শ্রীশ্রীবাবার অনেক শাস্ত্রের বই দেখা ছিল এবং কথাপ্রসঙ্গে তাহা ব্যক্তও হইত, তথাপি তিনি কখনই কোনও শাস্ত্রের ধরা বাঁধা বুলি আওড়াইতেন না। তিনি যে তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেন, তাহা নিজের অনুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে করিতেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন, "আমরা প্রত্যক্ষবাদী; প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কিছু মানি না, কাহাকেও মানিতেও বলি না।" তাঁহার পরিভাষা অনেক স্থলেই শাস্ত্রীয় পরিভাষাসমূহ হইতে স্বতন্ত্র। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি কোনও দিন ধারাবাহিক ভাবে সকল তত্ত্ব বিবৃত করিয়া যান নাই। অপেক্ষাকৃত উত্তম অধিকারী শিষ্যদের সঙ্গে আলাপক্রমে বা তাহাদেরই নানা প্রশ্নের উত্তরে তাহার শ্রীমুখ হইতে খণ্ড খণ্ড ভাবে তত্ত্ব সকল আসিয়া পড়িত। কাজেই তাঁহার মতাবলী ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত করিতে গেলে বিবরণকারীকে নিজস্বভঙ্গীতে তাহা পরিবেষণ করিতে হয়, এবং পাঠকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রীয় পরিভাষা ধরিয়াই চলিতে হয়। এ স্থলেও তাহাই করা হইতেছে।

শাস্ত্রের একটি মামুলী বচন এই যে, মানুষ তিন প্রকারের দুঃখের অধীন। তদনুসারে ভক্ত কবিও গাহিতেছেন—"ত্রিবিধ দুঃখেতে, তারা, নিশিদিন হতেছি

সারা।” জীবের এই অবশ্যভোগ্য দুঃখের তিনটি প্রকার বা শ্রেণী হইতেছে—(১) আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহগত—যথা রোগজনিত ও কামাদিজনিত, (২) আধিভৌতিক অর্থাৎ জড়জগৎ ও ব্যাঘ্রাদি প্রাণিমণ্ডল হইতে প্রাপ্ত, এবং (৩) আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা-গ্রহপ্রভৃতি দ্বারা সংঘটিত। সাংখ্য দর্শনের একখানি গ্রন্থে আছে “দুঃখত্রয়াভিঘাতাদ্ জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ”—মানুষ ত্রিবিধ দুঃখে পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইবার ফলে অবশেষে জানিতে চায় কি করিয়া উহার অভিঘাত বা বিলোপসাধন করা যায়। যে উপায়ে দুঃখকে নিপাত করিতে হইবে তাহা অবশ্য ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া চাই অর্থাৎ তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী ও চিরস্থায়ী হওয়া আবশ্যক। এই জিজ্ঞাসা হইতেই হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি।

প্রশ্ন হইতে পারে—সংসারে কি কেবল দুঃখই আছে, সুখ নাই? ইহার উত্তরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, যাহাকে সচরাচর সুখ বলা হয়, বিবেকীর চক্ষে তাহাও দুঃখই—“দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ”। এই দুঃখভোগ করে কে? জীবই ভোগ করে ইহাই সকলেরই প্রত্যক্ষ, যদিও কোনও শাস্ত্রে অন্যরূপ মতও আছে। শ্রীশ্রীবাবা প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন, কাজেই জীবকেই দুঃখের ভোক্তা বলিয়া মানিতেন। ঐ দুঃখের নিদান অর্থাৎ মূল কারণ কি? কেহ বলেন, কর্ম; কেহ বলেন অবিদ্যা। এ বিষয়ে বাবার উক্তি এইরূপ:—জীব স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই তাহার যত বিড়ম্বনা বা দুঃখ। ইহার পরে স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে—জীবের স্বভাব কি? উত্তর—পূর্ণসত্তা, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণক্রিয়াশক্তি ও পূর্ণ-আনন্দ। এখন, সৎ চিৎ আনন্দ (অর্থাৎ অখণ্ড সত্তা, অখণ্ড জ্ঞান ও অখণ্ড আনন্দ) ব্রহ্মের স্বভাব বলিয়া বেদান্তে কথিত আছে, আর তন্ত্রশাস্ত্রে সর্বজ্ঞত্ব, সর্বকর্তৃত্ব, পূর্ণত্ব, বিভুত্বাদি গুণ ঈশ্বরের বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক কি? উত্তর—একই বটে, আবার এক নয়ও বটে। জগতে এক ভিন্ন ত দ্বিতীয় বস্তু নাই—একমেবাদ্বিতীয়ম্—কাজেই চেতন জীবের কথা কি, জড়-জগৎও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বস্তুতঃ জগৎও জড় নয়, চিন্ময়।* আবার জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে এবং পরস্পর হইতে ভিন্নও বটে। জীব তাহার জীবত্বধর্ম দিয়াই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে পৃথক্। জড়সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। জীবের

* যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (উপশম প্রঃ ২৬।১১) দেখা যায় দৈত্যরাম বলির প্রশ্নের উত্তরে শুক্রাচার্য বলিতেছেন—

চিদিহাস্তীহ চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিৎত্বং চিদহমেতে লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ।

এ জগতে কেবল চিৎ (চৈতন্য)ই আছে, চৈতন্যই ইহার মাত্রা (limit in the last analysis), চৈতন্য উপাদানেই ইহা গঠিত। তুমিও চিৎ, আমিও চিৎ, এইসকল লোক (ভুবন বা জন) যাহা কিছু দেখা যাইতেছে সবই চিৎ—ইহাই হইল তত্ত্ব সংগ্রহ (সংক্ষেপ)।

জীবত্ব নিত্য; মোক্ষে এবং প্রলয়ে ব্রহ্মে লীন হইলেও জীবের জীবত্ব যায় না, অব্যক্তভাবে, বীজরূপে থাকে; আবার সময়ে অর্থাৎ তাহার বা পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশে সৃষ্টিতে পুনরায় আবির্ভূত হয়। জীব কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না, কার্যতঃ (for all practical purposes) ঈশ্বরত্ব পাইলেও স্বভাবতঃ (in his essence) ঈশ্বর হয় না। এইরূপে অভেদেও একটি ভেদ থাকিয়া যায়। এই ভেদ অবলম্বন করিয়াই লীলাময়ী জগন্মাতার লীলা চলিতে থাকে।

জগতের মূল যে অদ্বিতীয় তত্ত্ব বাবা তাঁহাকে বলিতেন "মহাশক্তি"। বস্তুতঃ মহাশক্তি কোনও তত্ত্ব নহেন, তিনি তত্ত্বাতীত বস্তু, বোধাতীত বোধ, শব্দাতীত শব্দ। বাবা নিজের পরিভাষায় বলিতেন—"ব্যোমাতীত ব্যোম।" ইংরাজীতে বলা যায় all pervading yet transcending.

কিন্তু যেহেতু একা লীলা হয় না, আর তিনি লীলাময়ী, সেইজন্য নিজ স্বাতন্ত্র্য হইতেই—কোনও কারণের অধীনে নয়—নিজে অবিকৃত ও অবিভক্ত থাকিয়াই কার্যরূপে নিজকে ব্যক্ত ও বিভক্তবৎ করিতে থাকেন (a process of manifestation and apparent division) তন্ত্রশাস্ত্রের ভাষায় ইহাকে অবভাসন বা উন্মীলনও বলা যায়। মহাশক্তির এই উন্মীলনের (প্রকাশের) কয়েকটি স্তর আছে। আমাদের প্রয়োজনে সকল স্তরের উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। মহাশক্তির প্রথম প্রকাশ হইতেছেন শক্তিরূপা আদিমাতা। ইনি নিঃসঙ্গা বলিয়া কুমারী।* ইঁহারই প্রতীকরূপে বাবার আশ্রমসমূহে কুমারীভোজন হইত এবং এখনও হয়। ইনিই প্রথম তত্ত্ব। ইঁহার বিষয় আপাততঃ আমাদের আলোচ্য নহে। ইঁহার পরের প্রকাশ ঈশ্বরতত্ত্ব। উক্ত সমস্ত তত্ত্বই পূর্ণ—কেহই খণ্ড নহেন, সেই জন্য ঈশ্বরতত্ত্বের ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন। ঈশ্বরের যে অবস্থায় শক্তির বিকাশ নাই, কেবল সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান তাহাই ব্রহ্ম। তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্ম কোনও তত্ত্ব নহেন। বৈষ্ণবগণ ইহাকে ভগবানের অঙ্গ-জ্যোতিঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ব্রহ্মে শক্তির বিকাশ না থাকিলেও তিনি অবশ্যই পূর্ণ। তাঁহাকে পরমাত্মাও বলা হয়। ঈশ্বরতত্ত্বের নিম্নে বিদ্যাতত্ত্ব—শুদ্ধবিদ্যা—ভেদাভেদ ভাব (Experience of diversity in unity and identity)। শক্তিরূপা আদিমাতা হইতে শুদ্ধবিদ্যাপর্যন্ত মহামায়ার রাজ্য বা শুদ্ধ অধ্বা। ইহার নিম্নে মায়ার রাজ্য—অশুদ্ধ অধ্বা (limited individual experiences)। মায়া হইতেছেন তিরোধানকারিণী (forces of obscuration); ইহার ফলেই একদিকে জীব (পুরুষ) ও অন্যদিকে জড় জগতের (প্রকৃতির) প্রকাশ।

*শ্রীশ্রীচণ্ডীরহস্যে এই আদিমাতাকে "মহালক্ষ্মী" বলা হইয়াছে। মহালক্ষ্মী প্রথমে নিজ সত্তা হইতে "মহাকালী" ও "মহাবিদ্যা" এই দুই শক্তি প্রকাশ করেন; তৎপর তিন শক্তিই এক একটি মিথুন উৎপন্ন করিয়া সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন।

শিব ঈশ্বর৷ স্বাতন্ত্র্যবশে কি করিয়া জীব হন, সে বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—তিনি ছয়টি কঞ্চুক (আবরণ) দ্বারা নিজকে পরিচ্ছিন্ন করেন। তন্মধ্যে প্রথম মায়া; ইহাই মূলকঞ্চুক। অপর পাঁচটি কঞ্চুক যথা (১) কাল, (২) নিয়তি, (৩) রাগ, (৪) বিদ্যা ও (৫) কলা। উহাদের দ্বারা যিনি ছিলেন নিত্য, তিনি হন অনিত্য; যিনি ছিলেন বিভু (ব্যাপক) তিনি হন দেহবদ্ধ; যিনি ছিলেন পূর্ণ, তিনি হন সকাম (তৃষ্ণাযুক্ত); যিনি ছিলেন সর্বজ্ঞ, তিনি হন অল্পজ্ঞ, যিনি ছিলেন সর্বকর্তা, তিনি হন অল্পক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন। এই সকল কঞ্চুক দ্বারা আবৃত খর্বীকৃত শিবই জীব।

এই খর্বতাপ্রাপ্তিই বাবার ভাষায় জীবের স্বভাব হইতে বিচ্যুতি। উহা একটু বিশদভাবে বুঝাইবার জন্যই আমাকে তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্ববিভাগ সংক্ষেপে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তত্ত্বব্যাখ্যারূপে উহাতে অনেক অপূর্ণতা রহিয়া গেল, বিশেষজ্ঞগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। বাবা ধারাবাহিক ভাবে এই বিভাগ বিবৃত না করিলেও কথাপ্রসঙ্গে ইহার সার তাঁহার নিজস্ব রীতিতে ও পরিভাষায় ব্যক্ত করিতেন। সে যাহা হউক, বাবা বলিতেন জীব স্বভাব হইতে বিচ্যুত বলিয়াই তাহার এত দুঃখ। কিন্তু তাহার স্বভাবের সংস্কার তাহার মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহা তাহাকে অবিরত আপনার দিকে—মায়াতীত রাজ্যের দিকে—টানিতেছে। এইজন্যই তাহার মধ্যে নিত্য একটা অতৃপ্তি, একটা অভাববোধ লাগিয়াই আছে। সে ধন চায়, কিন্তু ধন পাইলেও তাহার তৃপ্তি হয় না; জন (স্ত্রীপুত্রাদি) চায়, কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই; যশঃ চায়, তদ্দ্বারাও কামনার শেষ হয় না; শত্রুনিপাত চায়, তাহা ঘটিলেও সে স্বস্তি পায় না। সে মায়ের কাছে অনবরতই আব্দার করিয়া বলিতে থাকে, "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" এমন কি মায়ের কৃপা তাহার মধ্যে অনেকটা বিকাশপ্রাপ্ত হইলেও সে ঐ কথা ছাড়ে না। তখন তাহার চিত্তটা কিছু শুদ্ধ হওয়ায় সে "রূপ" অর্থে বুঝে পরমাত্মবস্তু বা বিন্দু।* "জয়" অর্থে বুঝে শাস্ত্রজ্ঞান। "যশঃ" বলিতে বুঝে ব্যাপক দৃষ্টি বা ঐরূপ কিছু। "দ্বিষো জহি" (শত্রুগণকে নিপাত কর) বলিতে বুঝে কামক্রোধাদি রিপুর জয়। তাহার জ্ঞানের ও শক্তির সঙ্কীর্ণতা এবং আনন্দের খণ্ডতা বা অচিরস্থায়িতা তাহাকে ব্যথিত করে। এ সকলেরই হেতু হইতেছে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার স্বভাবদ্বারা ঊর্ধ্বাকর্ষণ। সে স্বভাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার এই বিড়ম্বনা যায় না। ইহাই তাহার পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম হইতেছে নিম্নতর পুরুষার্থ। মোক্ষ (অর্থাৎ মায়ার আবরণের অপসারণ না হইলে স্বভাবের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না, কাজেই উহাও পরম পুরুষার্থ নয়, তাহার দ্বারমাত্র।

"মোক্ষ" অর্থে অনেকে নির্বাণ বুঝেন। এই মতে জীব ব্রহ্মসত্তায় বিলীন

* শ্রীশ্রীচণ্ডীর অর্গলাস্তবের নীলকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

হইয়া যায়; তাহার আর ব্যক্তিত্ব থাকে না, যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ মহাকাশের সঙ্গে মিলিয়া যায় সেইরূপ। বাবা বলিতেন, ঘট ভাঙ্গিলেও ঘটের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। সে স্বাভ্যন্তরস্থ আকাশ সহ অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়, বাবা বলিতেন "পরমাণুরূপে থাকে"। যোগী ইচ্ছা করিলে অক্লেশে তাহাকে তদবস্থা হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, অর্থাৎ তাহার পূর্বরূপে তাহাকে প্রকটিত করিতে পারেন। প্রত্যক্ষবাদী বাবা এককালে এই তত্ত্ব একাধিকবার বহু শিষ্যকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। এক টুকরা কাগজে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কিছু লিখিয়া তাঁহার সম্মুখে বা পরোক্ষে তাহা ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেও, সেই লিপি সহিত কাগজখণ্ড তিনি পুনরায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে"র তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চমখণ্ডে শিষ্যগণের উক্তিতে পাঠক ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। বাবা এই শক্তিকে "নায়িকাসিদ্ধি" বলিতেন। সে যাহা হউক, প্রবল শক্তির কাছে দুর্বল শক্তি স্বভাবতঃ আত্মহারা হইয়া পড়ে; সেইজন্য ব্রহ্মসত্তার বা ঈশ্বরসত্তার সম্মুখীন হইলে জীবসত্তা আত্মবোধশূন্য হইয়া তাহাতে লীন হইয়া যায় ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিত্ববোধশূন্য হইলেও তাহার জীবত্ব লুপ্ত হয় না। একটা মহাসুখের অবস্থা হইলেও এই নির্বাণ যোগীর কাম্য নয়। ব্রহ্মসত্তা বা ঈশ্বরসত্তার মধ্য দিয়াই তাঁহাকে যাইতে হয়, কিন্তু পাছে সেই ব্যূহে প্রবেশ করিয়া অভিমন্যুর দশা প্রাপ্ত হইতে হয় সেই ভয়ে তিনি প্রবেশের পূর্বে নির্গমের সামর্থ্য অর্জন করিয়া যান। সেই সামর্থ্যবলে তিনি ব্রহ্মত্ব বা ঈশ্বরত্ব ভেদ করিয়া নিত্যধামে আদিজননীর ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার সকল লীলা আস্বাদন করেন। ইহাই যোগীর গতি—তাহার পরম পুরুষার্থ। আদিজননীর উর্ধ্বে যে তত্ত্বাতীত মহাশক্তি আছেন, তাহাতে প্রবেশ করিলে তথা হইতে নির্গমন নিজ শক্তিতে সাধ্য নয়; একমাত্র মহাশক্তির কৃপায়ই তাহা সম্ভব।

বাবা শক্তির দিক্ ধরিয়াই কথা বলিতেন বলিয়া তাঁহার মতে তত্ত্বাতীত বস্তুর নাম মহাশক্তি এবং প্রথম তত্ত্ব হইতেছে শক্তি, দ্বিতীয় শিব। শৈবতন্ত্র (কাশ্মীরীয়) অবশ্য মহাশক্তিকে পরমশিব, প্রথম তত্ত্বকে শিব ও দ্বিতীয়কে শক্তি বলিয়াছেন। এই প্রভেদে আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে কিছু আসিয়া যায় না।

যোগপথে আরুরুক্ষু সাধক ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে আপনাকে অর্থাৎ জীবকে ভিন্ন বলিয়াই সাধনে প্রবৃত্ত হন। দ্বৈত ভিন্ন সাধন প্রায় অসম্ভব। ক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বে পোঁছিলে তাঁহাতে অদ্বৈতবোধ উৎপন্ন হয়; তখন "আমি ব্রহ্ম" বা "আমি ঈশ্বর" এইরূপ অনুভূতি হয়। অগ্নিতাপে রক্তবর্ণ একখণ্ড লৌহের যদি কোনও অনুভূতি কল্পনা করা যায় তবে সে অনুভূতির প্রকারটি "আমি অগ্নি" এইরূপই হওয়া সম্ভব, কেননা অগ্নির প্রায় সকল ধর্মই তখন তাহাতে বর্তমান। যোগী এইরূপ অদ্বৈততত্ত্বে বদ্ধ থাকেন না। প্রথম অবস্থায় তাঁহার মায়ের সঙ্গে

"আমি আমি, তুমি তুমি" এই ভেদজ্ঞান থাকে। ইহার পরে "আমি তুমি এক এই অভেদ বোধ আসে ; সর্বশেষে যদিও "আমিই" থাকে, কিন্তু সে আমির অ "তুমি" এবং "তুমি"র অর্থও "আমি"। ইহাকে ভেদাভেদ বলা চলে।

স্বভাব হইতে বিচ্যুত জীবের স্বভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় হইতেছে কর্ম ব ক্রিয়াযোগ। বাবা "কর্ম" বলিতে সুখদুঃখ-ফলক চেষ্টা বুঝিতেন না। "ক্রিয়াযোগ শব্দও তিনি পাতঞ্জল দর্শনের পরিভাষিক অর্থে—অর্থাৎ তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান অর্থে—প্রয়োগ করিতেন না। ক্রিয়াযোগ বলিতে তিনি বুঝিতে গুরুকর্তৃক প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় তদ্দত্ত মন্ত্রের সাধন। শিষ্যের দিক্ হইতে উহ তাহার পুরুষকার (individual exertion), গুরুর—ঈশ্বরের—দিক্ হইতে তাঁহার কৃপা (grace)। শিষ্যের প্রবৃত্তির প্রগাঢ়তা উৎপাদন করিবার জন্য বাবা সর্বদা ঐ পুরুষকারের প্রশংসা করিয়া বলিতেন, "কর্মভ্যো নমঃ, কর্মভ্যো নমঃ"। কৃপাসম্বন্ধে বলিতেন, "কৃপা আছেই ত রে বাপু, ঈশ্বরের কৃপা সর্বদা সকলের উপর বর্ষিত হইতেছে, কর্ম ছাড়া তাহা কে উপলব্ধি করিতে পারে ?"

তাঁহার মতে কর্ম হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি, ভক্তির পরিপক্কতায় প্রে উৎপন্ন হয়। এ তত্ত্ব পূর্বে (৯২ পৃঃ) প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আ এ স্থলে ইহার উল্লেখ করিব না। তাঁহার মতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—ইহাদে পরস্পরের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। অর্থাৎ বৈষ্ণবদের মত জ্ঞানের না নাসিকা কুঞ্চিত করিবার কোনও কারণ নাই। জ্ঞানোদয়ের পূর্বে যে ভা তাহা পরা ভক্তি নয়। জ্ঞানের (এবং কর্মের) মূলেও ভক্তি (অপরা) আছে নচেৎ তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? শাস্ত্র হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয় তাহা শু জ্ঞান, তন্মাত্র দ্বারা পাণ্ডিত্যখ্যাতি ব্যতীত কিছুই লাভ করা যায় না। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইলে ভক্তি হয় অন্ধা বা উন্মাদিনী। তাহা দ্বারাও বেশীদূ অগ্রসর হওয়া যায় না। কর্মসম্বন্ধে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জ্ঞানের উদয়েও যোগী কর্ম শেষ হয় না ; অজ্ঞানের কর্ম হইতে জ্ঞানের কর্মে উন্নতি হয় মাত্র। ভক্তি ও প্রেমের উদয়েও কর্ম চলিতেই থাকে। বাবা বলিতেন—"যোগীর কর্মের অ নাই।" কর্ম তাহার একটা গৌরবময় অধিকার (privilege) বিশেষ। ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর—ইহাদিগকেও শাস্ত্রে ধ্যানরত দেখা যায়। মহেশ্বরকে ত বিশেষ ভাবে যোগী বা যোগিকুল গুরুই বলা হয়। কালিদাস বলিয়াছেন, "স্বয়ং বিধাত তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার", স্বয়ং কর্মফলের বিধানকর্তা হইয়া কোনও অচিন্তনীয় কারণে(মহেশ্বর) তপশ্চর্যা করিতেছিলেন।

"যোগ" শব্দের পাতঞ্জলদর্শনোক্ত অর্থ হইতেছে—চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয়বিধ সমাধি। বাবা যোগ অর্থে উহার উপরে অনেক কিছু বুঝিতেন। সমাধি (জড়সমাধি নহে, চৈতন্যসমাধি) প্রকৃত যোগে দ্বারমাত্র।

ঈশ্বরসম্বন্ধে উপরে বলিয়াছি, তিনি পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন। বস্তুতঃ তাঁহার শক্তির ও জ্ঞানের সীমা নাই। "এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞঃ"—ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ (মাণ্ডুক্য উপনিষদ্)। "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইঁহার পরা এবং বিবিধা শক্তি, স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়া শ্রুতির বিষয় (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)। বায়ুপুরাণে আছে—

সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ
স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভো র্বিধিজ্ঞাঃ
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥

বিভু মহেশ্বরের ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ বিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন, যথা সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিজ্ঞান, স্বাতন্ত্র্য, সদা লোপহীন (আংশিকক্ষয়হীন) শক্তি ও অন্তহীন শক্তি। ব্যাস (পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার) বলিয়াছেন—"স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈব ঈশ্বরঃ"—তিনি সর্বদা মুক্ত, অথচ সর্বদা ঈশ্বর অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিসম্পদ্-যুক্ত। প্রয়োজনবশতঃ শক্তিবিশেষ আশ্রয় করিয়া তিনি জগতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে অবতার বলা হয়। তখনও স্বরূপে তিনি পূর্ণশক্তিই থাকেন। অবতাররূপে তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির সমগ্র বিকাশ নাও দেখা যাইতে পারে। তাঁহার কৃপাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে "গুরু" বা "জগদ্গুরু" বলা হয়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন তিনি (জগদ্গুরু) কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ব্যাস বলিয়াছেন—তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্;—তাঁহার নিজের কোনও প্রয়োজন নাই, জীবের প্রতি অনুগ্রহ (করুণা) করাই তাঁহার প্রয়োজন।

এই জগদ্গুরু হইতেই বিশুদ্ধসত্ত্বধারাক্রমে মানুষদেহাশ্রয়ী গুরুর অবতরণ বা প্রকাশ। বাস্তবিক মানুষ মানুষমাত্ররূপে গুরু হইতে পারে না—একমাত্র ঈশ্বরই গুরু। তাঁহারই কৃপাশক্তি মানুষ গুরুদ্বারা কার্যকরী হয়। তবে যে দেহাশ্রয়ে তিনি শিষ্যকে করুণা করেন, তাহা তাঁহারই কৃপাঘন দেহ বলিয়া অবজ্ঞার বিষয় নয়। তৎপ্রতি যথোচিত ভক্তিপ্রদর্শন এবং সেই দেহ হইতে লব্ধ আদেশ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া অবিচারে সম্পাদন শিষ্যের অবশ্য-কর্তব্য।

গুরু শিষ্যের মনকে রজঃ ও তমোগুণের আধিপত্য হইতে ত্রাণ করিবার জন্য তাহাকে জপাদির জন্য যাহা দান করেন তাহাই মন্ত্র। "মন্ত্র" শব্দের অর্থ বাবা বলিতেন—যাহা মনকে ত্রাণ করে। অন্যত্র যাহা মনন দ্বারা ত্রাণ করে (মননেন হি ত্রায়তে) এইরূপ অর্থও দেখিয়াছি। শেষোক্ত মতে মন্ত্রের

ফলোৎপাদনে মননের—চিন্তার, ধ্যানের—অপেক্ষা আছে। বাবা তাহা বলিতেন না। মন্ত্রের কার্য হইতেছে শক্তিধারণ জন্য আধার প্রস্তুত করা। মন্ত্রসংস্কৃত ক্রিয়া ও জপের উহাই লক্ষ্য। "জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ"। তন্ত্রশাস্ত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে। গুরুদত্ত মন্ত্র অর্থযুক্ত বা অর্থহীন শব্দসমষ্টি (বা বাক্য) রূপে প্রদত্ত হইলেও উহা শক্তিময় বস্তু অর্থাৎ স্বভাবতঃ শক্তিই। শব্দগুলি ঐ শক্তির আবরণমাত্র; শব্দাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রকে দেবতার দেহও বলা হয়—শব্দের অভ্যন্তরস্থ বস্তু দেবতাই। এইরূপে মন্ত্র ও দেবতা এক। ধ্যানাদির জন্য গুরু দেবতার একটি রূপ বলিয়া দিলেও, দেবতা চৈতন্যময়ী শক্তিরূপা। দেবতা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মূলে সব এক ও নিরাকার। "নিরাকার" শব্দের অর্থ বাবা বলিতেন, কোনও একটা নির্দিষ্ট আকারহীন, সর্বাকার। গুরু দেবতার ঊর্ধ্বে। (এই শেষোক্ত তত্ত্বটি শিষ্যদিগের ভুল বুঝিবার আশঙ্কায় বাবা সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করিতেন না)। গুরুও শক্তিরূপ এবং একভিন্ন দুই নহেন। শিষ্যকে মায়ের পরা লীলায় পেঁীছিতে হইলে দেবতা ও গুরু এই দুই তত্ত্বই ভেদ করিয়া যাইতে হয়। সে অনেক বড় কথা—এখানে আভাসে মাত্র বলা হইল।

যোগের স্বরূপ বাবা বলিতেন সংঘর্ষ। ইহা সংক্ষেপে (৯৩ পৃঃ) পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে উহার অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

যোগ-বিভূতি যদি সত্য হয় অর্থাৎ বুজরুকিমাত্র না হয় তবে উহা তুচ্ছ নহে, ইহা ঈশ্বরের সহিত ঐক্যাত্ম্যলাভের চিহ্ন। ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার হানি নাই। অপক্ক ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা বা ধনাদির লোভে প্রদর্শিত হইলে তাহার ক্ষয় আছে। অসিদ্ধ সাধকের ঊর্ধ্বগতিতে তাহা বাধাও দিয়া থাকে। এ বিষয়েও কিঞ্চিৎ পূর্বে (৪ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থবিস্তারভয়ে শ্রীশ্রীবাবার উপদিষ্ট তত্ত্ব সকলের বিবরণের সমাপ্তি এইখানে করা হইল। শিষ্যদিগের সহিত অধিক বা নানাপ্রকার তত্ত্বালোচনায় তিনি খুব পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উপরে যে তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করা হইল তাহা প্রধানতঃ এই পুস্তকের সাধারণ পাঠকের জন্য অভিপ্রেত। তাঁহাদিগকে এই প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রের আর একটি উক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছি :

সারভূতম্ উপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্যসাধনম্।
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা॥
ইদং জ্ঞেয়ম্ ইদং জ্ঞেয়ম্ ইতি য স্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞানম্ অবাপ্নুয়াৎ॥

(যোগপথে প্রবৃত্ত ব্যক্তি) কেবল কর্মসাধনের উপযোগী জ্ঞানের উপাসনা করিবে। জ্ঞানের বহুতা (বহুতত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষা) যোগের বিঘ্ন করিয়া

থাকে। আমাকে এ তত্ত্ব জানিতে হইবে ও তত্ত্ব জানিতে হইবে, এইরূপ তৃষ্ণাবশে যে ব্যক্তি বিচরণ করে, সে সহস্র কল্পেও (প্রকৃত) জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ তত্ত্বের জন্য মাথা না ঘামাইয়া ধৈর্য ও স্থৈর্যসহকারে গুরুদত্ত ক্রিয়া ও জপ করিয়া যাওয়াই উচিত।

দশ

আফিসের ছুটির পর ভবানীপুরে যাইয়া, বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্যদিন শ্রীশ্রীবাবার দর্শনলাভ কদাচিৎ ঘটিয়া উঠিত। হয় তিনি পূর্বেই বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া যাইতেন; নচেৎ দর্শনমাত্রই ঘটিত, তিনি দশ পাঁচ মিনিট মধ্যেই বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িতেন। বৃহস্পতিবার তিনি বাহির হইতেন না। সেইজন্য সেইদিন বিকালে বহু শিষ্যই তাঁহার দর্শনার্থ আশ্রমে আসিতেন। আমিও যাইতাম এবং সূর্যাস্তপর্যন্ত তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া থাকিতাম। তদ্ব্যতীত রবিবার বিকালেও তাঁহার ভ্রমণের সময়ের ঘণ্টাখানেক পূর্বে যাইতাম। কিছুদিন এইরূপ যাইতে যাইতে ক্রমশঃ গুরুভাইদিগের সহিত অল্প অল্প পরিচয় হইতে লাগিল। আমার দীক্ষার পূর্বেই শ্রীযুক্ত বিজয় (বসু) দাদার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তিনি জোড়াবাগান অঞ্চলে থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যায় যোগেশ-দাদার গৃহ হইতে বাহির হইয়া ট্রামের পথে আসিবার কালে তাঁহাকে বলিলাম, শ্যামবাজার অঞ্চলে আমাদের গুরুভাই কেহ আছেন জানিলে বড় উপকৃত হইতাম। বিজয়দাদা উহা শুনিয়া পার্শ্বস্থ একটি ভদ্রলোককে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি আপনাদের অঞ্চলেই থাকেন, এঁর কাছে বাবার সব সংবাদ আপনি পাইবেন। ইনি আমাদের 'দাদা গুরুদেব' বলিলেই হয়।" বিজয়দাদা উকিল মানুষ, বোল-চাল দুরন্ত। সে যাহা হউক, আমি সানন্দে তৎক্ষণাৎ 'দাদা গুরুদেবে'র নাম ঠিকানা ইত্যাদি শুনিয়া নিলাম। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত (ইদানীং গুরুধামগত) জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যবসায় ওকালতী; বয়স আমারই মত; কলিকাতার বাড়ী আমার হাতীবাগানের বাসার নিকটেই নীলাম্বর মুখার্জী স্ট্রীট ছিল। কিন্তু পরিচয়ের পর 'দাদা গুরুদেব'কে যেরূপ গম্ভীরভাবে ধীরপদক্ষেপে ট্রামের রাস্তা পর্যন্ত আসিতে দেখিলাম তাহাতে এবং সে সময় মধ্যে তিনি স্বীয় গুরুত্বের গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ হইতে নামিয়া আসিয়া এ অধমের সঙ্গে একবারও বাক্যালাপ না করাতে, তাঁহার সুমহৎ সংসর্গচর্চার জন্য আমার উৎসাহ প্রায় নির্বাপিত হইয়া গেল। সেইজন্য যদিও আমি সান্ধ্যভ্রমণব্যপদেশে প্রত্যহ তাঁহার গৃহের পার্শ্ব দিয়া দেশবন্ধু পার্কে যাইতাম, তথাপি কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহার দরজার কড়া স্পর্শ করিতে বা তাঁহার বৈঠকখানায় উঁকি দিতে সাহস করি নাই!

সপ্তাহ কয়েক পরে এক সন্ধ্যায় তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীর দ্বার দিয়া যাইতে দেখিয়া নিজে ডাকিয়া এত হৃদ্যতা দেখাইয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা আমার মনের পূর্বতন সঙ্কোচ নিঃশেষে ক্ষালিত হইয়া গিয়াছিল।

জানকীদাদারা তিন ভাই—জানকীনাথ, রজনীকান্ত ও নরেন্দ্রনাথ। আরও এক ভাই ছিলেন, তখন তিনি পরলোকপ্রাপ্ত। এই ভাইয়ের পুত্র হরিহরও আমাদের গুরুভাই। তিন দাদার পত্নীরা এবং রজনীদাদার একমাত্র সন্তান (কন্যা) এবং জামাতাও শ্রীশ্রীবাবার চরণাশ্রিত। জানকীদাদা কলিকাতা পুলিশকোর্টে ওকালতী করিতেন। রজনীদাদা আলিপুর জজকোর্টের উকিল। নরেন্দ্রদাদা শিয়ালদহের পুলিশ কোর্টের মোক্তার। ভাইদের মধ্যে প্রথমে নরেন্দ্রদাদা তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহের মুখে বাবার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যান এবং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে অন্য দুই ভাইও তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া প্রত্যেকেই কৌতূহলবশে স্বতন্ত্রভাবে বাবাকে দর্শন করেন। কিছুদিন আশ্রমে যাতায়াতের পর প্রত্যেকেই বাবার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কুলগুরুর সম্মতিক্রমেই বাবার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। পরিচয় হইলে দেখিলাম, তিন ভাইই ধীর প্রকৃতির লোক, হুজুগে মাতিয়া কোনও কাজ করা ইঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। বাবার প্রতি তিন ভাইয়েরই ভক্তি ও বিশ্বাস গভীর ও আন্তরিক; তাহাতে লোকদেখানো ভাব একেবারেই নাই। জানকী-দাদা ছিলেন একটু ভাবপ্রবণ লোক, সর্বদা বাবার ভাবে মশগুল থাকিতেন। বাবার শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া তিনি যাহা দেখিতেন ও শুনিতেন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তৎসমুদয়ের বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। আমিও তাহাই করিতাম; তবে ঠিক এক ধরনে নয়। আমার ডায়েরী (যাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচিত হইতেছে) হইতে তাঁহার বিবরণের (যাহার নাম তিনি দিয়াছিলেন "মুক্তিকাহিনী") প্রভেদ এই যে, জানকীদাদার মুক্তিকাহিনী-রচনা বলিতে গেলে তাঁহার সাধনের অঙ্গবিশেষ ছিল। তিনি দৃষ্ট ও শ্রুত ঘটনা এবং উপদেশাদি ত লিখিতেনই, অধিকন্তু তিনি তাহা ভক্তির উচ্ছ্বাস দিয়া সরস এবং মধ্যে মধ্যে স্বরচিত কবিতা ও ছড়া দিয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ করিতেন। কথাবার্তায়ও জানকীদাদা খুব রসিকলোক ছিলেন, যদিও প্রথমপরিচয় দিনে তাঁহার গাম্ভীর্য দেখিয়া আমি আতঙ্কিত ও বিরক্তই হইয়াছিলাম।

রজনীদাদার গুরুভক্তিতে উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু গভীরতায় তাহা কোন অংশে ন্যূন নয়। তিনি বাবাকে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি প্রবল একটা আকর্ষণ বোধ করিলেও ভাবিলেন, কুলগুরু হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া প্রায় বিশবৎসর একটি মন্ত্রযোগে 'দেবতাবিশেষের আরাধনা—তা' যতটুকুই হউক—করা গিয়াছে; এখন যদি ইনি নূতন মন্ত্র দ্বারা নূতন দেবতার সহিত যোগ করিয়া দেন তাহা হইলে সেটা কি বাঞ্ছনীয় ও চিত্তের শান্তিকর হইবে? বহু চিন্তা করিয়াও নিজে

এই সমস্যার কোনও সমাধান করিতে না পারিয়া তিনি একদিন বাবাকে বলিলেন, আপনার সঙ্গে কখন একটু নিরিবিলি কথা বলা যায় ?" বাবা বলিলেন, "কাল ১২টার সময় এস, তখন লোক প্রায় থাকে না।" রজনীদাদা বলিলেন, "যে আজ্ঞা"। ঐ সময়ে বাবা উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য অন্য ঘরে গেলেন। এ দিকে রজনীদাদা ভাবিতে লাগিলেন, "যে আজ্ঞা ত বলিলাম, কিন্তু একটা মোকদ্দমার শুনানী চলিতেছে, ১২টায় কি করিয়া আসিব ?" এমন সময়ে বাবা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "কাল তোমার ও সময়ে আসিতে অসুবিধা হইবে কি ? তা' হ'লে এখনও বলিতে পার। ও ঘরে চল।" এই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাবা অন্য এক প্রকোষ্ঠে গেলেন। ঐ প্রকোষ্ঠে সাধারণতঃ মহিলারা বাবার সহিত কথাবার্তা বলিতেন। এদিন ঐ সময়ে কোনও মহিলা আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। বাবা চেয়ারে বসিলেন। রজনীদাদা নিকটেই মেঝেতে বসিয়া বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা কিরূপে করিবেন মুহূর্তের জন্য তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় বাবা বলিলেন, "মন্ত্রের কথা বলিবে ত ? (একটি মন্ত্র বলিয়া) এই ত তোমার মন্ত্র ? দীক্ষা নিলে এই মন্ত্রই তোমাকে দেওয়া হইবে, তবে একটু সামান্য অদল বদল করিতে হইবে।" রজনীদাদার শুধু সমস্যার সমাধানই হইল না, বিস্ময়ে চিত্ত ভরিয়া গেল। ভাবিলেন, এখনও আমাদের কোনও ভাই-এর দীক্ষা ইঁহা হইতে হয় নাই ; ইনি আমাদের কুলমন্ত্র কি প্রকারে জানিলেন ? এবং তৎক্ষণাৎ দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তারপর বাবা সাধারণতঃ যাহা বলিতেন, অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জ হইতে অনুমতি আনাইতে হইবে, তাহাই বলিলেন ; যথাসময়ে দীক্ষাও হইয়া গেল।

জানকীদাদার সমস্যা ছিল অন্যরূপ। কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণ হইলেও তিনি সাধুর বেশ দেখিলেই গদ্‌গদচিত্ত হইবার মত লোক ছিলেন না। তিনি বাবার কাছে যাইতেন এবং তাঁহার কথাবার্তা ও আচরণ সমালোচকের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন। অনেক দিন এরূপ হইয়াছে যে, তিনি ভাবিয়াছেন বাবাকে এই প্রশ্নটি করিতে হইবে, কিন্তু দেখিয়াছেন যে, সে প্রশ্ন নিবেদিত হইবার পূর্বেই বাবা উপস্থিত অন্য লোকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারই অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। তৎসত্ত্বেও তিনি পুলিশ কোর্টের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সন্দেহপ্রবণতা হইতে দীক্ষা চাহিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। বাবা একদিন তাঁহাকে বলেন, "তোমার, বাপু, এ ভাবটি খুব ভাল ; কাহাকেও সহসা বিশ্বাস করিতে নাই। সব কাজ বিচার করিয়া করা ভাল।" পরিশেষে জানকীদাদা দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার দিনও নির্দিষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু দীক্ষার পূর্বরাত্রিতে সহসা তিনি স্থির করিয়া বসিলেন—না, দীক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু একটু অলৌকিক ভাবেই অসময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং সেই অলৌকিকতাই তাঁহাকে দীক্ষার জন্য রাত্রিপ্রভাতের পূর্বেই ছুটিয়া ভবানীপুর যাইতে বাধ্য করিল।

এই তিনটি ধীরপ্রকৃতি, নিষ্ঠাবান্, গুরুভক্ত পরমার্থ-ভ্রাতার সহিত পরিচিত হওয়া আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবেরই কৃপার ফল মনে করি। ধীরে ধীরে ইঁহাদের সহিত আমার নিবিড় প্রীতিবন্ধন স্থাপিত হয়। ক্রমে এমন হইয়াছিল যে, কোনও দিন ইঁহাদের বাড়ীতে গিয়া শ্রীশ্রীবাবার কথা শুনিতে না পারিলে মন ভাল লাগিত না। ইঁহাদের সদ্ভাবসংস্কৃত সংসর্গ, বিশেষতঃ ইঁহাদের গভীর গুরুভক্তি এবং ইঁহাদের মুখ হইতে শ্রুত বাবার নানা কথার দ্বারা আমি অশেষপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি। শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণপ্রান্তে ইঁহাদের সঙ্গে একসময়ে উপস্থিত থাকিলেও, বাবার যে সকল অমৃতময়ী বাণী কাণের দোষে আমি ভাল শুনিতে পাইতাম না, তাহা ইঁহাদের মুখে শুনিতাম। ইঁহারা বাবার কথা মনোযোগসহকারে শুনিতেন, এবং (বিশেষতঃ রজনীদাদা) ঠিক বাবার ভাষায় তাহার পুনরুক্তি করিতে পারিতেন।

জানকীদাদাদের দীক্ষা হয় ১৩৩৫ সালে; আমার দীক্ষা হয় ১৩৩৭ সালে। সুতরাং যদিও ইঁহারা আমার মাত্র দুইবৎসর পূর্বে বাবার কৃপালাভ করেন, তথাপি ইঁহারা বাবার বিভূতি এবং অলৌকিক মাহাত্ম্য আমার চেয়ে অধিক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তৎসমুদয়ের কিছু কিছু বিবরণ ইঁহারা তিন জনেই "শ্রীশ্রী-বিশুদ্ধানন্দপ্রসঙ্গের" পঞ্চমখণ্ডে দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি অসাধারণ বিভূতি এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্বে অপারশক্তিশালী শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার অতি বিশিষ্ট প্রকারের অধিকারসম্পন্ন শিষ্য শ্রীযুক্ত গোপীনাথকে কুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশদান উপলক্ষে স্বীয় নাভিকমল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৩৩৬ সনের ভাদ্র মাসে কলিকাতার আশ্রমে একদিন মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবাবার কয়েকটি ভাগ্যবান্ শিষ্য তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যোগ সম্বন্ধে নানাকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চৌধুরীও ছিলেন। কথায় কথায় বাবা যে গোপীনাথকে নাভিপদ্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই কথা উঠিল এবং নৃপেন্দ্রদাদা তাহা দর্শন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং অবশ্য বাবার নির্দেশমত কুমারীভোজন করাইতেও সম্মত হইলেন। তখন বাবা একটু গঙ্গাজল আনিতে বলিলেন এবং তাহা আনীত হইলে তদ্দ্বারা নাভিকুণ্ডটি মার্জন করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিয়া উহার মুখ বিকসিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্য হইতে প্রাতঃসূর্যবৎ রক্তবর্ণ অর্ধপ্রস্ফুটিত একটি পদ্মপুষ্পসদৃশ বস্তু বাহির হইল। উপস্থিত প্রত্যেক গুরুভ্রাতা তাহা কয়েক মিনিট ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই সময়ে তাহা হইতে যে তীব্র পদ্মগন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহার অনুভূতি প্রত্যেকেরই বহুক্ষণ ছিল এবং স্মৃতি এ জন্মে লুপ্ত হইবার নয়। এই বিভূতির বিবরণ রজনী-দাদা, নরেন্দ্রদাদা, এবং তৎকালে উপস্থিত কেদারনাথ ভৌমিকদাদাও পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে দিয়াছেন।

নাভিপদ্মসম্পর্কে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের সহিত প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেব একদিন

বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্র কিছুই মিথ্যা নয়; প্রয়োজন হইলে হৃৎপদ্মও একদিন বাহির করিয়া দেখাইয়া দিব। নাভিকমলের বর্ণ যেমন বালসূর্যের স্থায় রক্তিমাভাযুক্ত, হৃদয়-কমল সে প্রকার নহে। প্রত্যেকটি কমলই বাহির করা যায়। এ সব তর্কের বা অনুমানের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ সত্য।"

১লা বৈশাখ (১৩৩৮ সাল) তারিখে প্রাতঃকালে আহ্নিক সারিয়াই ভবানীপুরে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণদর্শনার্থ যাই। বাবা তখনও যোগেশ বসু দাদার গৃহেই আছেন। আমি সঙ্গে দুইটি টাকা ও বাজার হইতে দুই পয়সার চাঁপা ফুল কিনিয়া লইয়া যাই। প্রণাম করিয়া টাকা দুইটি ও ফুলগুলি বাবার পদপ্রান্তে রাখিয়া দেই। ঐ দিন কুমারীভোজন হইয়াছিল; বাবাই করাইয়াছিলেন। একটি কুমারী বাবাকে প্রণাম করিতে আসিলে বাবা চাঁপাফুলগুলি হইতে কয়েকটি তাহাকে দেন। তারপর নিজে একটি ফুল হাতে তুলিয়া লইয়া বামহস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আঘ্রাণ করিতে থাকেন। আমি বাবার কাছে আসিয়া বরাবর তাঁহার অতিনিকটেই বসিতাম, নচেৎ তাঁহার কথা আমার শুনিবার সৌভাগ্য হইত না। এদিনও তাহাই করিয়াছিলাম এবং এই সময়ে তাঁহার হাতের দিকে বরাবর তাকাইয়াই ছিলাম, কেননা তিনি ঐরূপ করিতে থাকায় আমার মনে হইয়াছিল বোধ করি একটা খেলা দেখাইবেন। একটু পরে তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ দেখি এখন কেমন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?" ঐ সময়ে ফুলটি তাঁহার বাম মুষ্টিতে আবদ্ধ। আমি বদ্ধ মুষ্টি আঘ্রাণ করিয়া বলিলাম, চাঁপার গন্ধই ত পাইতেছি। বাবা হাসিয়া মুষ্টি খুলিলেন; দেখা গেল চাঁপাফুলটি একটি বিলাতী ফুলে পরিণত হইয়াছে। বাবার কাছে তখন ঐ জাতীয় বা চাঁপা ছাড়া অন্য কোনজাতীয় ফুলই ছিল না। ফুলের জাতি পরিবর্তিত হইয়াছে, কেবল পূর্বগন্ধটি ঠিকই আছে।

বলিলাম—"ইহাকেই কি প্রকৃতির আপূরণ বলে?" পাতঞ্জল দর্শনে আছে একজাতীয় বস্তু যখন অন্যজাতীয় বস্তুতে পরিণত হয়, তখন তাহা প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা হয়। আপূরণ শব্দের অর্থ—অবয়বের অনুপ্রবেশ। কাষ্ঠ প্রস্তরে পরিণত হয় কাষ্ঠের প্রকৃতিতে প্রস্তরের অবয়বের অনুপ্রবেশ দ্বারা। মৃত্যুর দ্বার দিয়া না গিয়াই নন্দীশ্বর নরদেহ হইতে দেবদেহ ও নহুষ ইন্দ্রদেহ হইতে সর্পদেহ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের তদানীন্তন দেহে যথাক্রমে দেবদেহ ও সর্পদেহের অবয়বের অনুপ্রবেশ দ্বারাই এই পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহাকে যোগদর্শনে জাত্যন্তর-পরিণাম বলা হইয়াছে। এই পরিণাম বা পরিবর্তন ধর্মাধর্মরূপ নিমিত্ত (নন্দীশ্বরের বেলায় ধর্ম, নহুষের বেলায় অধর্ম) অবলম্বন করিয়া হয়। যোগী যে যোগবলে একবস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিণত করেন, তাহাও অবশ্য তিনি প্রকৃতির আপূণ দ্বারাই করেন। বাবা একটি বস্তু সরাইয়া দিয়া তৎস্থলে অন্য একটি বস্তু আনয়ন করেন নাই, ইহাই আমার প্রশ্নের অন্তর্গত ভাব। কিন্তু প্রশ্নটা যে কাঁচা প্রশ্ন তাহা

বলাই বাহুল্য। প্রকৃতির আপূরণ একটা কথার কথা মাত্র। কি প্রকারে এই আপূরণটা হইল তাহা ত আর দেখিলাম না বা বুঝিলাম না। সে যাহা হউক, বাবা আমার বিদ্যাভিমানে আঘাত না দিয়া বরং অনুমোদনসূচকভাবে মস্তক ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন, জগতের কোনও জিনিষেরই প্রকৃত রূপ কি তাহা কেহ জানে না। সব রূপই সত্য, মিথ্যা কিছুই নয়—তবে আমরা যেরূপ দেখি বা ভাবি তাহা প্রকৃত রূপ নয়। তাঁহার কথার অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছিলাম—আমরা যে বস্তুর যে রূপ দেখি তাহাই তাহার সত্যরূপ বলিয়া ভাবি। তাহা ঠিক নয়, অথচ মিথ্যাও নয়। প্রকটিত রূপের অন্তরালে সকলেরই একটা সত্যরূপ আছে। বাল্যে আমার এক রূপ, কৈশোরে আর এক রূপ, যৌবনে অপর এক রূপ, বার্ধক্যেও স্বতন্ত্র এক রূপ। এই রূপগুলির কোনওটিই মিথ্যা নয়; কিন্তু কোনটি আমার সত্য বা প্রকৃত রূপ? নিশ্চয়ই আমার প্রকৃত রূপ একটা আছেই, তাহা আমার (বা আমার মত সাধারণবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই) ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর। পূর্বোক্ত চাঁপা ফুলটির চাঁপারূপ ও বিলাতী ফুলের রূপ—দুই-ই সত্য; অথচ কোনটিই তাহার প্রকৃত রূপ নহে। তাই বাবা মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "সবই সত্য রে বাপু, আবার কিছুই সত্য নয়।"

অন্য সময়ে বাবাকে বলিতে শুনিয়াছি—"সকল বস্তুর মধ্যেই সকল বস্তুর পরমাণু আছে।" যোগশাস্ত্রেও বলে—সর্বং সর্বাত্মকম্। কতকগুলি পরমাণু উদ্গত ভাবে আছে, আর সকল পরমাণু প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। উদ্গত পরমাণু-গুলির রূপই বস্তুর ব্যক্তরূপ। যোগী ইচ্ছা করিলে উদ্গত পরমাণুগুলিকে দাবাইয়া দিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ বস্তুর পরমাণুগুলি (যাহা উহাতে প্রচ্ছন্ন আছে) উদ্গত করিতে পারেন; তখন সেই বস্তু সেই রূপ ধারণ করে।

বলিয়াছি প্রকৃতির আপূরণ আমাদের কাছে একটা কথার কথা মাত্র। একটা খালি এনামেলের বাটিতে যখন 'ফোকাস' করিয়া বাটিভরা সন্দেশ প্রস্তুত হয়, তখন ঐ কথাটা আওড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিলাম বলিয়া অভিমান করিতে পারি না। এইরূপ দুর্বোধ 'খেলা'ই ত তিনি অনবরত দেখাইতেন। পাঠক এই পুস্তকেও সেরূপ অনেক খেলার কথা পাইবেন। পুরাতন শিষ্যেরা আরও কত দেখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ খুব প্রাচীন শিষ্য না হইলেও লিখিয়াছেন, "কত সময় যে কত বিষয় দেখিয়াছি ও দেখিতেছি তাহার গণনা নাই। অণিমা ও মহিমা বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে একদিন আঙ্গুল মোটা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। আধলা হইতে গিনি তৈয়ার করা, টাকা বা অন্য কোন বস্তু উড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ পরমাণুরূপে অব্যক্ত করিয়া ফেলা, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার এবং লিঙ্গদেহের পৃথক পৃথক গন্ধ আকর্ষণ করিয়া দেখান, প্রেতাকর্ষণ, শরীরাভ্যন্তরে স্ফটিকাদি ঢুকাইয়া দেওয়া ও বাহির করা, নারিকেল তৈল, পুরাতন ঘৃত, সদ্যোনির্মিত গব্যঘৃত, চাটনী,

নানা প্রকারের সন্দেশ, রসগোল্লা, চমচম, পানের উৎকৃষ্ট মশলা, জাফরান, কারবোলিক এসিড্, ফিনাইল, কুইনাইন চূর্ণ, কুইনাইন ট্যাবলেট, ধূপ, বেদানা, মহাশঙ্খবটী, চ্যবনপ্রাশ, মকরধ্বজ লৌহময়ী সূচী, বোতলের মধ্যে ভায়লেট গাছ, হীরক, সুবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শতশত প্রকারের বস্তুর নির্মাণব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি; জীবের মধ্যে মাছি, চামচিকা-প্রভৃতি জীবজন্তু তৈয়ার করিতে দেখিয়াছি। সকল বিষয় লিখিয়া বর্ণনা করা চলে না।"

বাবার মধ্যে যোগের সহিত বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে এই অভাবনীয় সৃষ্টি মুহূর্তমধ্যে সম্ভাবিত হইত। ইহার প্রণালী বুঝিবার চেষ্টা নিষ্ফল, ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বাতুলতা-মাত্র। বাবার বিচিত্রপ্রকারের সৃষ্টির বহু বিবরণ "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ" পাঁচখণ্ডে কৌতূহলী পাঠক দেখিতে পাইবেন। তাঁহার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুর রূপ সব সময়ে সাময়িকমাত্র ছিল না। একবার একটা জবা গাছকেই চিরদিনের মত গোলাপ গাছে পরিণত করিয়াছিলেন। অবশ্য সাময়িক পরিণামেরও (যথা,—আধলাকে গিনিতে পরিণত করিয়া তাহাকে পুনরায় আধলাতে পরিণত করা) বিবরণ ঐ পুস্তকে একাধিক স্থানে আছে।

আমি বাবার হাত হইতে বিলাতী ফুলে পরিণত চাঁপাটি আনিয়া বাটীতে সকলকে দেখাইয়াছিলাম এবং বাবার প্রসাদ বলিয়া উহা আমার রুগ্ণা কন্যাটির মস্তকে স্পর্শ করাইয়া একটি কৌটায় রাখিয়া দিয়াছিলাম। উহাতে চাঁপাফুলের গন্ধ বহুদিন ছিল।

এই বৈশাখ মাসেই একদিন বিকালে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণদর্শন করিতে গিয়া অবগত হইলাম, ঐ দিন বায়ুবিজ্ঞান দ্বারা সন্দেশ প্রস্তুত হইয়াছিল। কি প্রকারে উহা হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, একটি এলুমিনিয়ামের কৌটা (যাহাতে বাবা সচরাচর বড় এলাচির গুঁড়া রাখিতেন) শ্রীযুক্ত কেদার ভৌমিক দাদার গরদের চাদর দিয়া ঢাকিয়া শ্রীযুক্ত সুরেশ সিংহ (রায় বাহাদুর) দাদা হাতে করিয়া রাখেন। তারপর বাবা বড় একটি জার্মান সিলভারের কৌটাতে (যেটিতে শিষ্যদিগকে প্রসাদ দিবার জন্য সাজা পান থাকিত) পাঁচ সাত সেকেণ্ড পর পর তিনটি আঘাত করিয়া সুরেশদাদাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোনও পরিবর্তন টের পাইতেছেন কি না। সুরেশদাদা বলেন, হাঁ একটু ভার বোধ হইতেছে। তার একটু পার কৌটা খুলিয়া দেখা গেল এক কৌটা সন্দেশ হইয়াছে। বাবা বলেন, "দশরথ দিগ্বিজয় করিয়া যমালয়ের নিকট দিয়া গমনকালে যম তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া এইরূপ সন্দেশ দ্বারা জলযোগ করাইয়াছিলেন।" সন্দেশ অতি সুস্বাদু ও সুগন্ধি হইয়াছিল। আমি যখন আশ্রমে পৌঁছি তখন উহা নিঃশেষ হইয়াছে। কৌটা ঝাড়িয়া আমাকে কতটুকু দেওয়া হইয়াছিল, আমি উহা পাইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে গালে দিয়াছিলাম।

আরও একদিন ঐ প্রকারে সন্দেশ হয়। সেদিন শ্রীযুক্ত যোগেশ দাদা আমাকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলেন। ঐ দিনও সন্দেশ সকাল বেলায় হয়, আমি বিকালে গিয়াছিলাম। সূর্য-বিজ্ঞানের ন্যায় বায়ু-বিজ্ঞানও আমার ধারণার অতীত। শুনিয়াছিলাম, সূর্য-বিজ্ঞানে সূর্যরশ্মির উপাদানভূত রশ্মিগুলির সংযোগবিয়োগ দ্বারা বস্তু নির্মিত হয়। রশ্মিগুলি ইথারের (Ether) বিশেষ বিশেষ রকমের স্পন্দনের রূপমাত্র বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। বিভিন্নপ্রকার স্পন্দনের যোগাযোগ-কৌশল দ্বারা বাবা নূতন নূতন সৃষ্টি করেন এইরূপ বুঝিয়া লইয়াছিলাম। বায়ুবিজ্ঞানের ব্যাপারে মনে হইয়াছিল হস্তস্থিত কোনও বস্তুতে (বা চেয়ারে বা তক্তপোষে) আঘাত করিয়া যে শক্তিময় শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়, তাহাই দূরস্থ পাত্রে আবরণের অন্তরালে সন্দেশাদির মূর্তি গ্রহণ করে। কিরূপে করে তাহা অবশ্য বুঝিতাম না ; এমন কি নিজের কল্পিত ব্যাখ্যাটাও একটা Obscurantism (রহস্যকল্পনামাত্র) বলিয়াই মনে হইত। তবে ব্যাপারটা যে শক্তিরই রূপান্তর (transmutation) ভিন্ন কিছু নয় ইহা বোধ করি সত্য।

ঐ মাসেই বাবা একদিন সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা বেল ফুল হইতে তিনটি স্ফটিক তৈয়ার করিয়া একটি যোগেশদাদার এবং আর একটি কেদার ভৌমিক দাদার বাহুতে ঢুকাইয়া দেন। আর একটি অন্য কেহ নিয়া যান। ইহারা প্রত্যেকে পঁচিশটি করিয়া পঁচাত্তরটি কুমারী ভোজন করান। স্ফটিক বাহুতে ঢুকিবার পর ঐ স্থলে কয়েক সেকেণ্ড একটু চর্মের আরক্তিমা ও স্ফীতি দেখা গিয়াছিল, তারপর আর কিছু বুঝা যায় নাই। তবে বাবা বলিয়াছিলেন, "আছাড় খাইলে স্ফটিক হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। স্ফটিক দেহে থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও হঠাৎ কোনও গুরুতর ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।"

বৈশাখ মাসেই কোনও এক তারিখে শ্রীশ্রীবাবা পুরী চলিয়া যান এবং সেখানে স্নানযাত্রা পর্যন্ত থাকেন। তাঁহার পুরী যাওয়ার পূর্বে একদিন জানকীদাদাদের বাসায় কেদার ভৌমিক দাদার মুখে শুনিতে পাই, শ্রীযুক্ত গোপীনাথের স্ত্রী পুনর্বার অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়াতে গোপীনাথ বাবাকে একখানি টেলিগ্রাম করিয়া তাহা জানাইয়াছেন। পরদিন আমি বাবার নিকটে গিয়া তাঁহার তক্তপোষের উপর একখানি টেলিগ্রামের খাম দেখিয়া তাহা খুলিয়া দেখিলাম উহা গোপীনাথেরই টেলিগ্রাম। গোপীনাথ লিখিয়াছেন, Wife ill, condition getting hopeless. উত্তর দেওয়ার জন্য অগ্রিম ফি দেওয়া ছিল, কিন্তু দেখা গেল উত্তর দিবার ফর্মখানি ব্যবহার করা হয় নাই। টেলিগ্রামখানি কয়েকদিন পূর্বে আসিয়াছে। এদিন গোপীনাথের আত্মীয় শ্রীযুক্ত (এখন পরলোকগত) মাখন ভট্টাচার্যদাদা বাবার কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখেই শুনিতে পাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিয়াছেন যে, গোপীনাথের স্ত্রী পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন।

সেইজন্য আমি বাবাকে সে বিষয়ে আর প্রশ্ন করি নাই। বাবা পুরীতে চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে কাশীতে গোপীনাথের বাসারই মহেশ পাণ্ডে নামক একটি ১৭।১৮ বৎসর বয়সের পশ্চিমা বালক (সে তখন কলিকাতায় আসিয়াছিল) আমার বাসায় আসিয়া আমাকে জানায় যে, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কলিকাতা হইয়া পুরীতে বাবার কাছে গিয়াছেন। আমি মহেশকে গোপীনাথের স্ত্রীর তৎকালীন অবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—"বাবা নিজে গিয়ে মাইজীর মুখে ঔষধ দিয়ে এসেছেন। মাইজী' বাবাকে দেখেছিলেন। গোপীবাবুজীও দেখেছিলেন। একদিন গোপীবাবু ও আমরা খেতেছিলাম—গোপীবাবু হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে যেন কিছুর দিকে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন বাবা এসেছিলেন।"

অনেকদিন পরে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পুরী হইতে ফিরিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি তাঁহাকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি যাহা বলেন, তাহা যেমন অলৌকিক, তেমনই গোপীনাথের প্রতি বাবার অসীম ভালবাসার পরিচায়ক। আমি ভাবিলাম গোপীনাথ ধন্য, তাহার সাধনভজনে অনুরাগ ধন্য এবং সাধনভজন সার্থক।

গোপীনাথ যখন এইসকল বৃত্তান্ত বলেন, তখন সেখানে আমার সহোদর শ্রীমান্ অমূল্য এবং বন্ধু শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র ও প্রতিবেশী যশোদাকিশোর বর্ধন উপস্থিত ছিলেন। গোপীনাথ বলিলেন, "বাবাকে টেলিগ্রাফ করার পর যেরূপ শুনিয়াছেন ঐরূপই আমার স্ত্রী মুখের মধ্যে ঔষধ পাইয়াছিলেন, তাহাতে একটু উপকারও হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরে রোগ আবার বাড়িয়া যায়; অনবরত রক্তবমন ও রক্তভেদের ফলে রোগী সংজ্ঞাশূন্য হয় এবং হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। মুখও বিকৃত হয়। তখন কেবল প্রাণটা দেহত্যাগ করে নাই, নচেৎ মৃতই বলা যাইত। নিরুপায় হইয়া ডাঃ শোভারামের পরামর্শে বাবাকে আবার টেলিগ্রাফ করি। এবার বাবা জবাব দেন, Efforts being made. জবাবটি হারে যায়। রোগী ঐ ভাবে কিছুকাল থাকিয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা পাইতে থাকে। যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে তখন তার মুখে শুনা গেল যে, বাবা এবং আর একজন মহাপুরুষ সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। ঐ মহাপুরুষের গায়ের বর্ণ তামার মত, সর্বশরীরে বড় বড় লোম—জ্যোতির্ময় মূর্তি। তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিছু বলেন নাই। বাবা আমার স্ত্রীর মস্তক স্পর্শ করিয়া বলেন, 'ভয় কি মা? একটু ভোগ আছে; ভাল হ'য়ে যাবে।' তারপর তাঁহারা চলিয়া যান। আমি পুরীতে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঐ মহাপুরুষ পরমহংস ভৃগুরাম স্বামী। বাবা বলিলেন, 'আরও একজন ছিলেন, বৌমা তাঁকে দেখে নাই। তিনি উমা ভৈরবী মা।' তারপর হইতেই আমার স্ত্রীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠিতেছে; এখন অনেকটা সুস্থ। বাবা চিঠিতেও

লিখিয়াছিলেন, মুখেও বলিলেন আমার স্ত্রীকে কোনও একটা ঠাণ্ডা যায়গায় নিয়া রাখিতে। আমি কাশী গিয়াই হরিদ্বার বা মুসৌরী যাইবার ব্যবস্থা করিব।

আমি। মহেশ বলিয়াছিল, তুমিও নাকি বাবাকে দেখিয়াছিলে? তখন নাকি তোমরা খাইতে বসিয়াছিলে?

গোপীনাথ। হাঁ, সে আর একদিন। তখন আমার স্ত্রী কতকটা সুস্থ গরমের জন্য তাহাকে তেতলার ঘর হইতে একতলায় একটি ঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। আমরা কয়েকজন তেতলায় খাইতে বসিয়াছিলাম, কোঠার মধ্যে না ছাদের খোলা অংশে। হঠাৎ দেখিলাম বাবা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। খাইতেছিলাম হাত এঁটো কি আর করিব? মনে মনে প্রণাম করিলাম। আমার বোধ হইয়াছিল তিনি দোতলা হইতে সিঁড়ি দিয়া তেতলায় উঠিয়া আসিলেন। আমার সম্মুখে একটু থামিয়া তেতলার ছাদে চলিয়া যান। একটু পরেই আমার ছেলে মাখন নীচ (একতলা) হইতে উপরে আসিয়া আমাকে বলে, 'বাবা, গুরুদেব এসেছিলেন কি?' আমি বলিলাম, কিরূপে জানিলে যে তিনি এসেছিলেন? সে বলিল মা তাঁকে দেখেছেন; তিনি যেন জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া মার দিকে তাকাইয়া উপরে চলিয়া আসিলেন। আমিও ঘরে ছিলাম, কিন্তু আমি দেখি নাই।'

গোপীনাথের মুখে উক্ত বিবরণ শুনিয়া আমি বলিলাম, বাবার কি দয়া! উনিই জেঠাগুরুদেব পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীকে ও উমা ভৈরবী মাকে আনিয়াছিলেন। পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীকে আর কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি?

গোপীনাথ। তিনি সকলের খবরই রাখেন। কিন্তু প্রায় কাহাকেও দেখা দেন না। তবে এই সেদিন এখানে বিধুদা' তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, সে খবর শুনিয়াছেনত?

আমি। কই, না। কি হইয়াছিল?

গোপীনাথ। কি আশ্চর্য! বাবা যে হঠাৎ একদিন আশ্রম ছাড়িয়া যোগেশদা'র বাড়ীতে আসেন সে কথা জানেন ত?

আমি। একদিন আশ্রমে বাবার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া শুনিতে পাই যে বাবা যোগেশদা'র বাড়ীতে গিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে কোনও রহস্য আছে এ কথা ত মনে হয় নাই, সেইজন্য কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।

গোপী। বেশ ত! বাবা একদিন সকালবেলায় নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়াই বলিলেন, 'এ আশ্রমে আমার থাকা হবে না'! শুধু ঐ কথাই বলিলেন না, তখনই তাঁহার ব্যবহার্য সকল জিনিসপত্র নিয়া যোগেশদা'র বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বিধুদা' ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা? কি ত্রুটি হইয়াছে? আমার কি অপরাধ হইয়াছে যে, আপনি ওবাড়ীটা ছাড়িয়া আসিলেন?" বাবা বলিলেন, "তোমার কোনও অপরাধ নাই। দাদা গুরুদে

আদেশ করিয়াছেন, 'এখানে তোমার থাকা চলিবে না', তাই চলিয়া আসিলাম।" বাবা ঐ ভাবে চলিয়া আসাতে বিধুদা'র মনটা বড়ই খারাপ হইল ; সেদিন তিনি কিছুই খাইলেন না, অতিশয় বিমর্ষভাবে সমস্ত দিন কাটাইলেন। ভোর রাত্রিতে তাঁহার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে এক মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। ঐ যেমন বলিয়াছি, উজ্জ্বল মূর্তি, তামার মত বর্ণ, আর সমস্ত শরীরে লোম। তিনি বিধুদা'কে বলিলেন, "বিধু, তুমি মনে কোনও খেদ রাখিও না। এ বাড়ীতে বিশুর[১] ক্রিয়া ভাল হইতেছিল না। তাহার ক্রিয়ার ঘরে পায়খানা হইতে গন্ধ যাইত। তুমি বরং এক কাজ কর। ঐ যে দিকে খোলা ছাদ আছে উহারই পার্শ্বে একখানি কোঠা তৈরী কর, সেইখানিতে বিশু থাকিবে।" এই কথার পর বিধুদা'কে পুনরায় দুই একটি সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া আশীর্বাদ করিবার জন্য মহাপুরুষ যেই বিধুদা'র মাথায় হাত দিলেন, অমনি বিধুদা' আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও সমস্ত ঘরটি অপূর্বগন্ধে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বিধুদা' নিদ্রা হইতে উঠিয়াই ছুটিয়া বাবাকে গিয়া সব কথা বলাতে বাবা বলিলেন, "হাঁ, দাদা গুরুদেব তোমাকে দেখা দিয়া আমাকে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন।"

আমি। একদিন বিধুদা' বাবাকে যাহা বলিতেছিলেন তাহা হইতে আমি এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, আশ্রমে একটা ভাঙ্গাচুরা চলিতেছে। ভাবিয়াছিলাম বোধ হয় মেরামত হইতেছে। কানে সব কথা শুনি না বলিয়া এবং সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারি না বলিয়া অনেক খবরই আমার অগোচরে থাকে।

গোপী। আপনাকে বোধ হয় বলিয়াছি আরও একদিন সন্ধ্যায় ভৃগুরাম পরমহংসকে আমার পূজার ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

আমি। হাঁ ; বৌমা এক মহাপুরুষকে দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন, এইরূপ তুমি বলিয়াছিলে। কিন্তু মহাপুরুষটি যে ভৃগুরাম পরমহংস তাহা ত তুমি বল নাই।

গোপী। আমিও জানিতাম না। এইবার আমার স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি যে, বাবার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁহাকেই পূর্বে সন্ধ্যায় পূজার ঘরে দেখা গিয়াছিল।

গোপীনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ : একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার স্ত্রী পূজার প্রকোষ্ঠে ধূপদীপ দিতে গিয়া হস্তস্থিত প্রদীপের আলোকে দেখেন এক উন্নতকায় পুরুষ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে আসন করিয়া ধ্যানরতভাবে বসিয়া আছেন। উহাতে তিনি ভয়ে বা অন্যকারণে (যথা প্রবল শক্তির তরঙ্গসংঘাতে)

১. গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস।

মূর্ছিত হইয়া যান। তাঁহার হঠাৎ পতনের শব্দ পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ হইতে পাইয়া গোপীনাথ-প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। তাঁহারা কেহ কোনও পুরুষমূর্তি গৃহমধ্যে বা গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখেন নাই।

শ্রীশ্রীগুরুদেব ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুরী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত জানকীদাদাদিগের মুখে পূর্বেই সংবাদ পাইয়া আমি ঐদিন প্রাতে হাবড়া স্টেশনে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। জানকীদাদারা এবং আরও অনেক শিষ্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাবা ট্রেন হইতে অবতরণ করিলে সকল শিষ্যই জুতা ছাড়িয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; পাদস্পর্শ নিষিদ্ধ বলিয়া তাহা কেহ করিলেন না। বাবা সকলকে কুশলপ্রশ্ন করিয়া প্ল্যাট-ফর্মের অন্যপার্শ্বে রাস্তায় কাহারও (বোধ করি নৃপেন্দ্র চৌধুরীদাদার) মোটরে উঠিলেন এবং একটি ব্যাগ ও একটি পোঁটলা উঠিল কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেন। ঐ দুইটি বস্তুর জন্য তাঁহার চিন্তা দেখিয়া আমি ভাবিলাম উহাতে এমন কি মূল্যবান বস্তু থাকিতে পারে যাহার জন্য তাঁহার নিজের অনুসন্ধান প্রয়োজন? যাহা হউক, শ্রীশ্রীবাবার পরিচারক পরমেশ্বর দুইটি বস্তুই তাঁহার গাড়ীতে উঠাইয়া দিলে মোটর স্টেশন ছাড়িয়া গেল। ব্যাগটি দেখিয়াছিলাম ব্যাঘ্রচর্মনির্মিত। পরে শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি উহাতে তাঁহার যোগক্রিয়ার সরঞ্জাম ও বিজ্ঞানচর্চার লেন্স্ ইত্যাদি থাকিত। আর পোঁটলাটিতে শিষ্যগণের জন্য আনীত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ ছিল। বিকালে যোগেশদাদার বাটিতে বাবাকে পুনরায় প্রণাম করিতে গিয়া প্রসাদের কিয়দংশ পাইবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল। আমি উহা গৃহে আনিয়া বাটীর সকলকে, বিশেষতঃ রুগ্ণা মেয়েটিকে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম।

মেয়েটির ব্যারামের এ দিকে কোনও উন্নতিই দেখা যাইতেছিল না। শ্রীশ্রীবাবা উহার জন্য কিছু করুন একথা তাঁহাকে মুখে বলিতে বা পত্রে লিখিয়া প্রার্থনা করিতে সাহস হয় নাই। এদিকে প্রার্থনার জন্য প্রাণে আকুতিও প্রবল। অবশেষে একদিন বাবা বেড়াইতে যাইবার জন্য সিঁড়ি দিয়া দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিবার সময় আমি সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলাম, 'বাবা, মেয়েটির জন্য বড় ভয় হইতেছে; তার দিকে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।' বাবা তাহার ব্যারামের কথা পূর্বেই জানিতেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা।" ইহার পর তিনি দয়া করিয়া মধ্যে মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, মেয়ে কেমন আছে! আমার স্ত্রী এই সময়মধ্যে কয়েকদিন আসিয়া বাবাকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং প্রথম দর্শনাবধি খুব মুগ্ধ ও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। একদিন তিনি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বাবা, মেয়েটা বাঁচবে?' তদুত্তরে বাবা বলেন, "ও সব বলাতে আমার গুরুর নিষেধ আছে।"

শ্রীশ্রীবাবা যখন বৈশাখমাসে পুরীগমন করেন, তখন আমার ইচ্ছা হইয়াছিল

তাঁহার সঙ্গে গিয়া কয়েকদিন তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে কাটাইয়া আসি। কিন্তু আরতির (আমার মেয়েটির নাম) অসুখের জন্যই সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করি নাই। এবার (সন ১৩৩৮ সাল) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের "নব কলেবর" উপলক্ষে, শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে রথযাত্রাদর্শনের ইচ্ছা অনেকেরই মনে প্রবল হওয়ায় তাঁহার পুনরায় পুরীগমনের আয়োজন হইল। এই সময়ে আরতির অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ। কিন্তু আমার স্ত্রী বলিলেন, "চিকিৎসা ত চলিতেছে, তুমি এখানে কয়েকদিন না থাকিলে বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া ত মনে হয় না।" রায়সাহেব ননীদাদা, আমাকে বরাবরই খুব প্রীতির চক্ষে দেখেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গেও এ বিষয়ে আলাপ করিলাম। তিনিও পুরী যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবাকে সব কথা বলুন না কেন?" তাঁহারই পরামর্শে অবশেষে বাবাকে বলিলাম, "বাবা মেয়েটার রোগ ত চলিতেছে। আমি থাকিয়াই বা কি করিতেছি? বাবা রক্ষা করিলেই তার রক্ষা। আমি বাবার সঙ্গে পুরী যাব কী?"

বাবা যেন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একটু বিমনা হইয়া বলিলেন, "তা যেতে পার।"

অতএব ২৮শে আষাঢ় তারিখে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে পুরীযাত্রা করিলাম। তাঁহারই প্রকোষ্ঠে (Compartmentএ) আমার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ট্রেনে আমার নিদ্রা খুবই কম হয়। এদিন বাবা সঙ্গে আছেন বলিয়া একটু সঙ্কোচও বোধ করিতেছিলাম। গাড়ীটি ছিল প্রথমশ্রেণীর গাড়ী, তাহাতে দ্বিতীয়শ্রেণীর লেবেল আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রায় সাহেবদাদা ও দুর্গাকান্তদাদাও ঐ প্রকোষ্ঠে ছিলেন। নীচে দুইটি বার্থ ও উপরে দুইটি বার্থ। বাবার মাথার উপরে থাকা চলিবে না বলিয়া আমি মেজেতে বিছানা পাতিয়াছিলাম। গভীর রাত্রিতে বাবা সুইচ টিপিয়া শিয়রের দিকে একটি আংশিকরূপে আবৃত আলোক জ্বালিয়া মুখ ধুইতে গেলেন, পরে আসিয়া সেই ব্যাঘ্রচর্মের ব্যাগটি খুলিয়া বিভূতি দিয়া কপালে একটি অদৃশ্যপ্রায় তিলক করিলেন। তারপর কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাজল লইয়া হাত ধুইয়া এবং আচমন করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শয্যায় মটকার চাদর ছিল, তাহার উপরেই আসন করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ জপ চলিল। তাঁহার জপে বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া আমি শয্যা তুলিয়া আসন পাতিয়া জপ করিতে সঙ্কোচ-বোধ করিতেছিলাম। দুর্গাকান্তদাদা ঘুমাইয়াই ছিলেন। রায় সাহেবদাদাও তাহাই; তবে ভোরের দিকে উঠিয়া তিনি সংক্ষেপে জপ সারিয়া লইয়াছিলেন। অনেকক্ষণ জপের পর বাবা একখানি ছোট পুস্তকের (অনুমান করিলাম গীতা বা চণ্ডীর*) কিয়দংশ সেই মাথার কাছের আলোকেই উপুড় হইয়া পাঠ করিলেন।

* পরে বাবা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন তিনি গীতা পাঠ করেন না, চণ্ডীই পাঠ করেন।

বোধ করি আমাদের অসুবিধা হইবে মনে করিয়া উপরের আলো জ্বালিলেন না। আহ্নিক করিবার সময় এবং তাহার পরেও তীব্র একটি সুগন্ধে সমস্ত প্রকোষ্ঠটি পূর্ণ ছিল।

প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্বে কটক ষ্টেশনে ট্রেন থামিলে তথাকার বহু উড়িয়া ও বাঙ্গালী শিষ্য ও শিষ্যা আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের সকলের ভক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। শেষ রাত্রিতে সহর হইতে বহুদূরে ষ্টেশনে আসিয়া এতটি স্ত্রীপুরুষের সাক্ষাৎকার বাস্তবিকই প্রাণের গভীর আকর্ষণের পরিচায়ক। বলা বাহুল্য, বাবা ইহাদিগকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন এবং সস্নেহে সকলকে কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং প্রত্যেককে পানপ্রসাদ দিলেন। এক বড় কৌটাভরা পানের খিলি ইত্যাদি তাঁহার সঙ্গেই ছিল।

উড়িয়া শিষ্যদিগের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম এক খর্বাকৃতি কৃশকায় বৃদ্ধকে। ইনি বাবার জন্য কয়েকপ্রকার বাষ্পগর্ভ পানীয় (aerated water) আনিয়া আমাদিগের গাড়ীতে দিলেন, এবং বলিলেন সবই তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও কথায় এবং কাজে ইহার অসাধারণ তৎপরতা আমার লক্ষ্য হইয়াছিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে ইহার নাই শুনিয়াছিলাম রায় বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র। ইনি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন; তখন (সরকারী চাকুরীর অবসানে) কটক মিউনিসিপ্যালিটির ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেরও চেয়ারম্যান। পরে তিনি 'দেওয়ান বাহাদুর' উপাধিও পান।

আর একটি প্রৌঢ়বয়স্ক, উন্নতকায়, এবং অপেক্ষাকৃত ধীর গম্ভীর ও বুদ্ধিমান আকৃতির শিষ্যও আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত (এখন রায় বাহাদুর) চিন্তামণি আচার্য, এম. এ., বি. এল., তখন কটকের সরকারী উকিল ও কটক কলেজের আইনের অধ্যাপক। ইনি এবং শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রদাদা এবং কটকের আরও কতিপয় শিষ্য রথের দিন পুরীতেও গিয়াছিলেন।

বহুপূর্বে (খ্রীঃ ১৯১৫ সনে) আমি একবার পুরী গিয়াছিলাম ও তথায় সপরিবারে দুইমাসের অধিককাল ছিলাম, কিন্তু রথযাত্রাদর্শন হয় নাই। এবারে হইল; গুরুসঙ্গেই হইল। কোনও গুরুভাইয়ের সঙ্গে রথের দড়ি ধরিয়া কিছুক্ষণ টানও দিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীবাবা রাস্তার (বড় দাণ্ডার) ধারে এক বৃক্ষতলে চেয়ারে বসিয়াছিলেন। নিকটে বহু শিষ্য ও শিষ্যা এবং আরও অনেক লোক ছিল।

পুরীতে একদিন বিকালে আমার অনুপস্থিতিতে শ্রীশ্রীবাবা নিজের খেয়াল বশেই শ্রীযুক্ত যোগেশ বসুদাদার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শ্রীযুক্ত অতুল দাদার পুত্র অরুণ বসুকে (ইহারা উভয়েই হাইকোর্টের উকিল) কতকটুকু তুলার মধ্যে ভ্রমরের মত একটি প্রাণী সৃষ্টি করিয়া দেখান। শুনিলাম প্রথমে ক্ষুদ্র একটু শিশিরকণার মত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, পরে উহাই বড় হইতে হইতে নানা অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া উড়িয়া চলিয়া যায়। এই সময়ে অরুণ দাদা এবং আর দুই একটি শিষ্য ব্যতীত সকলেই

নানা প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিলেন; কেবল ইঁহারাই বাবার কাছে ছিলেন বলিয়া বাবা প্রীত হইয়া ইঁহাদিগকে উক্ত খেলা দেখান। আর একদিন একটি বেল ফুলের কলি হইতে স্ফটিক প্রস্তুত করিয়া বিশ্বেশ্বর দত্ত (ডাক নাম "সোনা"—বাবা বলিতেন "সনাতন") তাঁহার হাতে ঢুকাইয়া দেন। ইহার জন্য সোনা তাঁহাকে কুমারী-ভোজন করাইতে হইবে এই কথা ছিল। বৈশাখমাসে যখন বাবা পুরীতে যান তখন তত্রত্য এক শিষ্যের, সুরেন্দ্র চক্রবর্তী দাদার একটি কুমারী কন্যার হাতের জন্য কতকটুকু তুলার মধ্যে লেন্স দ্বারা একটি সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছিলেন। মেয়েটির হাতে ঐ বালা আমি দেখিয়াছি। এই সময়মধ্যে ঐ মেয়েটির বিবাহ হইয়াছিল; গরীবের মেয়ে গরীবের ঘরেই পড়িয়াছিল; সেইজন্য তাহার এক-হাতে ঐ একটি বালা ছাড়া অন্য স্বর্ণালঙ্কার দেখি নাই।[১] বালাটির গড়ন, পালিশ ইত্যাদি সব অতি সুন্দর, তবে হাতে একটু বড় হইয়াছিল।

পুরীতে ছয়দিন ছিলাম। প্রতিদিনই বাবার গায়ে অপূর্ব গন্ধ পাইয়াছি। তাঁহাকে সর্বদাই প্রসন্নচিত্ত দেখিতাম। কত হাসি ঠাট্টার কথাও বলিতেন। তাঁহার স্নেহ এবং সকল গুরুভ্রাতার ভালবাসায় কয়েকটি দিন আমি প্রায় স্বর্গ-বাসতুল্য সুখে কাটাইয়াছি। রায় সাহেব ননীবাবু ও কটকের ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়ার অতুল ঘোষদাদার সহিত এইবার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়। অতুলদাদার সরলতা ও অমায়িকতাও আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

পুরীতে আমার অবস্থানকাল মধ্যে প্রত্যহই আশ্রমে কুমারীভোজন ও তিনদিন কুমারীদিগকে বস্ত্রদান করা হয়। কুমারীভোজনে কুমারী মাতাদিগের সংখ্যা প্রতিদিন পঁচিশ বা ত্রিশটির মত হইত। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী ও উড়িয়া দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যাই ছিলেন। পুরীতে উপস্থিত শিষ্যেরা সকলেই এই উপলক্ষে কিছু কিছু চাঁদা দিয়াছিলেন।

পুরীর আশ্রমটি শ্রীশ্রীবাবার এক শিষ্যের দান। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, কিন্তু ওকালতী করিতেন না, অন্য ব্যবসায় করিতেন এবং এখনও করেন। প্রথম বারের বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতে থাকে। সেই সময়ে তিনি যোগেশদাদার এক আত্মীয় হইতে পুরীতে একখানি একতলা বাড়ী ক্রয় করেন। বাড়ীখানি আর্মষ্ট্রং রোডের উপরে, সমুদ্র হইতে অল্প একটু দূরে অবস্থিত, কিন্তু সমুদ্র ও ঐ বাড়ীর মধ্যে অন্য বাড়ী বেশী না থাকায় সমুদ্রের হাওয়ায় সর্বদা পরিষেবিত। সমুদ্রের গর্জন এখান হইতে বেশী শুনা যায় না বলিয়া শ্রীশ্রীবাবার ক্রিয়া-ইত্যাদিতে ব্যাঘাত হইত না।

---

১. আমি পুরী হইতে চলিয়া আসিবার পরে ঐরূপ আর একটি বালাও বাবা সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বালাটি নির্মাণ করিবার সময় প্রথম নির্মিত বালাটি একটু ছোট করিয়া পুনর্নির্মাণ করিয়া দেন। এবার দুইটিই পাঁচ-সাত মিনিট সময়মধ্যে একসঙ্গে নির্মিত হয়। বিজয় বসু-দাদা নির্মাণের সময় পুরীতে ছিলেন। তাঁহার মুখেই সমস্ত বিবরণ আমি শুনিয়াছিলাম।

ক্ষেত্রদাদা বাড়ীখানি কিনিয়া উহারই হাতার মধ্যে অপর একখানি ত্রিতল বাড়ী নির্মাণ করেন। ত্রিতলে একটি মাত্র কোঠা ; একতলে তিন ও দ্বিতলে চারিখানি কোঠা আছে। বাবা ত্রিতলের প্রকোষ্ঠে থাকিতেন এবং সাধারণতঃ দ্বিতলে বারান্দায় বসিতেন। অন্য সকল প্রকোষ্ঠে শিষ্যেরা থাকিতেন। শিষ্যারা কেহ গেলে পুরাতন একতলা বাড়ীটিতে তাঁহাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। এই গৃহ নির্মিত হইবার কিছুকাল পরে ক্ষেত্রদাদার আর্থিক অবস্থা হঠাৎ সঙ্কটাপন্ন এবং তাঁহার সর্বস্ব পাওনাদারের হাতে যাইবার উপক্রম হয়। তাঁহার পূর্ব হইতে ইচ্ছা ছিল ঐ ত্রিতল গৃহ ও তৎসংলগ্ন কতকখানি জমি তিনি আশ্রম করিবার জন্য বাবাকে উৎসর্গ করিবেন। কিন্তু এখন তাহা করিলে পাওনাদারদের হস্ত হইতে তাহা নিরাপদ হইবে না বিবেচনায় তিনি সমস্ত বাড়ীটা বিধুদাদাকে কবলা করিয়া দিলেন, এবং বিধুদাদা ক্ষেত্রদাদা বাটীর যে অংশ শ্রীশ্রীবাবাকে উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ঐ অংশটি দানপত্রদ্বারা বাবাকে উৎসর্গ করিলেন। দলিলে যে মূল্যই লিখিত থাকুক, বিধুদাদা যাহা দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের জন্য রক্ষিত অংশেরই যোগ্য এইরূপ শুনিয়াছি। সুতরাং এই আশ্রমটি প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রদাদারই দান। আশ্রমের নাম— "বিশুদ্ধানন্দধাম"।

পুরী হইতে আমার ফিরিয়া আসিবার পরেও শ্রীশ্রীবাবা কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। আমি পুরী যাইবার সময় আরতিকে যে অবস্থায় রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া তদপেক্ষা একটু ভালই দেখি। কিন্তু তাহার পরই তাহার জীবনদীপ দ্রুত নির্বাণোন্মুখ হইতে থাকে। তাহার শেষ কয়েকদিনের কষ্ট তাহার ত বটেই, আমাদেরও অসহ্য হইয়াছিল। ১০দিন পরে ১৯শে শ্রাবণ তারিখে ভোর বেলায় সে সর্বকষ্টহারিণী জগন্মাতার কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। ১৩২৬ সালের ১১ই আষাঢ় তাহার জন্ম হয়, সুতরাং তাহার বয়স সবে মাত্র ১২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার স্বাস্থ্য কয়েকবৎসর পূর্ব হইতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এমন সরল শুদ্ধ মন, মৃদু মনোহর স্বভাব কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার সংস্কারও খুব ভাল ছিল। তাহার মৃত্যুদিনেও যে অশ্রু আমার হৃৎপিণ্ডের কোন নিগূঢ় কক্ষে বরফের চেয়েও কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া আবদ্ধ ছিল, বাহিরে বিন্দুপ্রমাণ দেখা দেয় নাই, তের বৎসর পরে আজ এই বিবরণ লিখিবার সময় জানি না কিরূপে তাহা দ্রব হইয়া চক্ষুর পথে বাহির হইয়া কপোল ভাসাইয়া দিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যখন তাহার শরীরে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক, তখন আমি তাহার শিয়রে বসিয়া দুই একটি স্তব পাঠ করিলে সে যেন সে সময়ের জন্য সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া তাহা শুনিত। আমারও উহা ভিন্ন তাহার ক্লেশলাঘব করিবার অন্য উপায় ছিল না। শ্রেষ্ঠ এলোপ্যাথ, শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথ, অভিজ্ঞ কবিরাজ, দীকার স্নানজল, বটুকেশ্বরের স্নানজল, ৺কালীমাতার ও ৺তারকেশ্বরের নির্মাল্য, ৺জগন্নাথের সেবার কর্পূর ও তুলসীপত্র ও প্রসাদ, গৃহে চণ্ডীপাঠ, গ্রহপূজা—কিছুই তাহাকে রক্ষা করি

নাই। বাবা তাহার অবস্থা নিজে জিজ্ঞাসা করিয়া বহুবার আমার মুখে শুনিয়াছেন, কিন্তু কিছুই বলেন নাই। প্রতিমাবিসর্জনের তিনদিন পরে ভবানীপুরে রূপ-নারায়ণ নন্দন লেনের আশ্রমে গিয়া যখন আমি মেয়ের মহাপ্রয়াণের কথা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করি, তখন তিনি শুধু বলেন, "আমি জানি।" অবশ্য নিজ হইতেই জানিয়াছিলেন। জানকীদাদার সহিত তখনও ঘনিষ্ঠতা হয় নাই; তাঁহারা কিংবা অন্য কোনও গুরুভ্রাতা তখন পর্যন্ত এই সংবাদ পান নাই। আমার হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন, বোধ করি সেইজন্য শুধু "আমি জানি" ইহা ছাড়া এ বিষয়ে আর কোনও কথা বা কোনও সান্ত্বনাবাক্য বলা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। বাবা উঠিয়া গেলে একজন গুরুভাই বলিলেন, আপনি যে ভাবে বাবার কাছে মেয়ের মরণের কথা বলিতে পারিলেন, তাহাতে বুঝা যায় এটা তাঁহারই দয়া। তিনিই আপনাকে স্থির রাখিয়াছেন। হবে বা! আমার কিন্তু মনে হইয়াছিল পাষাণকে কঠিন রাখিতে হিমের প্রয়োজন হয় না; তাপে তাহা উত্তপ্ত হয় মাত্র, গলে না। সে যাহা হউক কয়েক দিন পরে আমার স্ত্রী তাঁহার কাছে গেলে তিনি তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনার কথা বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—(আমি মর্মমাত্র লিখিতেছি) "সে তোমার ছিল, ইহা কেন ভাব? এখন তোমাকে দেখিলে সে চিনিতেও পারিবে না[১]। তাহার উচ্চগতি হইয়াছে। তাহার চারিটি দুষ্টগ্রহ প্রবল হইয়াছিল, তাই কোনও প্রতীকারে ফল হয় নাই। তাহাকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় ছিল না। আমি চারিদিন তোমাদের বাড়ীতে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি।" বলা আবশ্যক শ্রীশ্রীবাবা স্থূলদেহে কোনও দিনই আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই।

আমার স্ত্রী। চারিদিন গিয়াছেন? আমরা টের পাই নাই!

বাবা। পেয়েছ। ভেবে দেখ একদিন বিকালে তোমার মেয়ে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। তুমি খাবার হাতে করে সেই ঘরে ঢুকেছিলে। আমি তখন সেইখানে।

আমার স্ত্রীর এ কথাটা বাবার সঙ্গে আলাপের সময় ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। কেননা ঐ দিন আমার স্ত্রী ও আরতি উভয়েই দ্বিতলের উল্লিখিত ঐ ঘরটিতে একটি তীব্র সুগন্ধ পায় এবং আমার স্ত্রী জানালাতেও হঠাৎ যেন একখানা গেরুয়া রঙের চাদর বা জামা সরিয়া গেল এইরূপ দেখিয়া বাবা আসিয়াছেন মনে করিয়া হাত তুলিয়া প্রণামও করিয়াছিলেন, এবং ঐ কথা ঐদিন আমাকেও বলিয়াছিলেন। সুগন্ধটি জানালার দিক হইতেই আসিতেছে (জানালাটি রাস্তার ধারে, বাহিরে বারান্দা ইত্যাদি ছিল না) ইহাও স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল।

১. কথিত আছে, পুত্রশোকাতুর অর্জুন গুরু শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে চন্দ্রলোকে গিয়া অভিমন্যুর সম্মুখীন হইলে অভিমন্যু পিতৃরূপে অর্জুনকে কোনও সম্মান বা আদর দেখান নাই, বরং এরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন যেন তিনি তাঁহাকে চিনিতেই পারেন না।

বাবা বলিতে লাগিলেন, "আর একদিন মনে করে দেখ নীচে তুমি খাবার ঘরে ছেলেদের খাবার দিচ্ছিলে।"

এই দিনের কোনও কথা আমি স্ত্রী হইতে পূর্বে শুনি নাই। বাবা বলিলে আমার স্ত্রীর মনে পড়িল—একদিন বিকালে ছেলেদিগকে মুড়ি, দধি, আম ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হইতেছিল, এমন সময় আমার মধ্যমপুত্র কনক বলে, "কে যেন খুব ভাল এসেন্স কাপড়ে লাগাইয়া গলি দিয়া গেল, এখন পর্যন্ত সে গন্ধ আছে। তোমাদের গুরুদেব আসিলেও না সুগন্ধ পাওয়া যায়?"

তাহার মা। গুরুদেব ত এখন পুরীতে।

তাহার বোধ করি ধারণা ছিল যে, পুরী এতদূর যে সেখান হইতে কাহারও এভাবে আসা সম্ভব নয়। সে যাহা হউক ছেলেদের খাবার দেওয়া শেষ হইলে আমার স্ত্রী উপরে যাওয়ামাত্রই আরতি বলে, "মা, সেই দিনের মত সুন্দর গন্ধ আজও ঐ (জানালার) দিক হইতে আসিতেছিল।" এ কথায়ও আমার স্ত্রীর মনে কোনও দাগ পড়ে নাই; কাজেই আমি আর এদিনের খবর পূর্বে শুনি নাই। আজ বাবা স্মরণ করাইয়া দিলে আমার স্ত্রীর সব কথাই স্পষ্ট মনে পড়ে।

অন্য দুইদিন বাবা কখন আসিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজ হইতে বলেন নাই, আমার স্ত্রীরও তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন আছে মনে হয় নাই।

আমার স্ত্রী অবশ্য কন্যাশোকে আমার তুলনায় অনেক অধিক কাতর হইয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে আবার তিনি শ্রীশ্রীবাবার কাছে গেলে বাবা বলেন, "পূজায় কাশী চল, সেখানে গেলে একটু শান্তি পাইবে।"

আরতি ব্যারামের সময় আমার ও তাহার মায়ের নিকট চাহিয়া চাহিয়া প্রায় দুই চারিটা পয়সা নিত; এবং তাহা জমাইয়া সাত টাকা কয়েক আনা একটা কৌটাতে রাখিয়া দিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে আমার তৃতীয় পুত্র স্বপ্নে দেখে, আরতি আসিয়া যেন তাহাকে বলিতেছে, "সেজদা আমার টাকাগুলি তোমার কাছে রেখে দিও।" আমার ঐ পুত্র টাকার খবর কিছু জানিত না। সে আমার স্ত্রীকে স্বপ্নের বিবরণ বলিলে, আমরা স্থির করিলাম টাকা কয়টি দিয়া কুমারীভোজন করাইলে হয়ত আরতির তৃপ্তি হইবে। আরতি শিশু ছিল, ঐ কয়টা টাকা বা আর কোনও জিনিসের প্রতি আসক্তি তাহাকে আবার যেন এই দুঃখময় মর্ত্যলোকে টানিয়া না আনে এইজন্য আমরা সেগুলি সম্বন্ধে কোনও একটা সুব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইলাম। প্রথমে তাহার হাতের সোনার চুড়ি গুলি (যাহা তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল) বিক্রয় করিয়া মূল্য চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে দিলাম। সঞ্চিত সাতটি টাকা আমার স্ত্রী আশ্রমে কুমারীভোজনের জন্য শ্রীশ্রী বাবাকে দিতে চাহিলে তিনি বলেন, "ঐ টাকা দিয়া কয়েকটি কুমারী নিজেদের বাড়ীতেই খাওয়াইও; তাহাতে গৃহের দোষও কাটিয়া যাইবে।"

বহুদিন—প্রায় দশ বৎসর—পরে আশৈশব স্বভাবতঃ দিব্যদৃষ্টিসম্প

(clairvoyant) শ্রীযুক্তা (ইদানীং পরলোকগতা) মৃণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় হইলে আমি আরতি তখন কি অবস্থায় আছে তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। ইনি হাইকোর্টের উকিল ৺বঙ্কিমচন্দ্র সেনের পত্নী এবং অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনের মাতা। ইঁহার শক্তির কথা শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের লিখিত পরলোকের কথায় প্রথম পাঠ করি। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই ইঁহার সহিত আমারপরিচয় ঘটিয়াছিল এবং ইঁহার স্বমুখ হইতে ইঁহার শক্তির ও পরলোকের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আমি শুনিতে পাই। সে যাহা হউক, আরতির কথা ইঁহাকে বলাতে তিনি পরদিন (ইনি সাধারণতঃ রাত্রিতেই আত্মাদের দর্শন পাইতেন) আমাকে জানান—"আপনার মেয়ে ষষ্ঠ স্বর্গে আছে (স্বর্গ সাতটি স্তরে বিভক্ত বলিয়া ইনি বলিতেন ; সপ্তম হইতেছে উচ্চতম স্তর) এবং তাহার শরীরের দীপ্তি খুব উজ্জ্বল হইয়াছে। সে বলিল, আমি খুব ভাল আছি, আমার জন্ম মা ও বাবাকে ভাবিতে মানা করিবেন।"

শুধু কর্মক্ষয়ের জন্য অনেকের জন্ম হয়। আরতি বোধ করি কর্মক্ষয় করিতেই আসিয়াছিল। এ জন্মে কোনও কর্ম সে সঞ্চয় করে নাই। কাজেই তাহার বিশিষ্ট রকমের ঊর্ধ্বগতি অসম্ভাবিত নহে। শ্রীশ্রীবাবাও ত বলিয়াছেন, তাহার সদ্‌গতি হইয়াছে। তাই মাননীয়া মৃণ্ময়ী দেবীর কথা অসম্ভব মনে হয় নাই ; যদিও অবশ্য এ সকল কথার মূল্য বুদ্ধি দ্বারা বা অন্যপ্রকারে পরিমাপ করিবার যোগ্যতা আমার নাই।

সুবিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস Uncle Tom's Cabin-এর রচয়িত্রী Mrs. H. B Stowe ঐ পুস্তকে বর্ণিতা একটি সৎস্বভাবা ধর্মপ্রাণা স্বল্পায়ুঃ বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, There is no death to such as thou, dear Eva, neither darkness nor shadow of death, only such a bright fading as when the morning star fades in the golden dawn. Thine is the victory without the battle—the crown without the conflict. "প্রিয় এভা তোমার মত যারা তাদের বাস্তবিক মরণ হয় না, মৃত্যুর অন্ধকার বা ছায়াও তাদের জন্য নাই। আছে শুধু জ্যোতিতে বিলীন হইয়া যাওয়া—যেমন প্রভাতী তারা স্বর্ণকান্তি প্রভাতে অদৃশ্য হইয়া যায় সেইরূপ। বিনা সংগ্রামে বিজয় গৌরব,বিনা দ্বন্দ্বে রাজমুকুট তোমারই।"

এগার

পূর্ব বৎসর কাশীতে আমার দীক্ষার প্রসঙ্গেই আমার স্ত্রীর দীক্ষার প্রার্থনা শ্রীশ্রীবাবাকে জানাইয়াছিলাম। তৎপর কলিকাতায় আমার স্ত্রী ও আমি উভয়েই বাবার শ্রীচরণে সেই প্রার্থনা একাধিকবার নিবেদন করি। প্রত্যেকবারই বাবা দীক্ষা দিবেন এইরূপ সদয় অঙ্গীকার করিলেও দীক্ষার দিন নির্ধারণ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। সম্মুখে আমার কন্যাবিয়োগরূপ একটি দুর্ঘটনা আছে তাহা দেখিয়াই বোধ করি ঐরূপ করিয়াছিলেন। আর এটা একটা পরীক্ষাও ত বটে: আমার স্ত্রী শোকাবেগে এইরূপও ভাবিতে পারিতেন, ইনি শক্তিমান্ যোগী হইয়াও আমার মেয়েটিকে রক্ষা করিবার জন্য কিছুই করিলেন না; কি হইবে দীক্ষা নিয়া? প্রকৃতপক্ষে শোকের আঘাতে আমার স্ত্রীর দীক্ষার জন্য আগ্রহ বর্ধিতই হয়, এবং কন্যার মৃত্যুর পর বাবার মুখে সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া তাঁহার স্নেহ ও দয়ায় তিনি মুগ্ধ হন। পূর্বেই বলিয়াছি এই সময়ে বাবা একদিন তাহাকে বলেন, "পূজায় কাশী চল, সেখানে গেলে শান্তি পাবে।" দীক্ষার কথায় বলেন "দীক্ষা সেখানেই দিব।" বাবার আদেশ শিরোধার্য করিয়া আমি পূজা ও বড়দিন এই দুই অবকাশের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য ছুটির দরখাস্ত করি এবং তাহা প্রাপ্ত হই। এই সময়ে একদিন কুমারীভোজন-প্রসঙ্গে বাবা বলিয়াছিলেন, জ্ঞানগঞ্জেও বহু কুমারী আছে।

আমি। ওখানে এত কুমারী কোথা হইতে আসে?

বাবা। ওদেশের লোকেরা অনেকেই একটি ছেলেকে সাধু ও একটি মেয়েকে ব্রহ্মচারিণী করিয়া দেয়। আশ্রমে ইহারা যোগ, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি শিক্ষা করে। কুমারী অনেক আছে—তিন চার হাজার হইবে, এই কুমারীদের ও ভৈরবীমাদের সেবার জন্য মাস মাস আমি সেখানে পাঁচশ' করিয়া টাকা পাঠাই। ইহার মধ্যে আড়াই শ' টাকা আমি নিজে দেই, আর আড়াই শ' টাকা কয়েকজন শিষ্য দেয়।

যেদিন এই কথা হইয়াছিল, ঐদিন বাবার কাছে তিনখানি বানারসী শাড়ীও দেখিয়াছিলাম। বাবা বলিয়াছিলেন ঐ তিনখানি শাড়ীও কুমারীসেবার জন্য জ্ঞানগঞ্জ পাঠান হইবে।

জ্ঞানগঞ্জে কিছু পাঠানোর ব্যবস্থাসম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়াছিলাম: জলন্ধরে জ্ঞানগঞ্জের একজন সাধু আছেন, পত্র, পার্শেল, মণি অর্ডার সব তাঁহার কাছে পাঠান হয়। বাবা জ্ঞানগঞ্জ হইতে যে সকল পত্র পাইতেন তাহার উপরে জলন্ধর পোষ্টাফিসের মোহর শিষ্যেরা দেখিয়াছেন। বাবার দেহরক্ষার পরে গোপীনাথ-রক্ষিত জ্ঞানগঞ্জের একখানি মূল চিঠিতে আমিও লেপাফার ডাকটিকিটের উপর জলন্ধরের মোহর দেখিয়াছি।

পূর্বে যে ব্যবস্থার কথা বলা হইল তাহাই ছিল সাধারণ ব্যবস্থা। অসাধারণ ব্যবস্থাও ছিল ; পরে ক্রমশঃ তাহা উল্লিখিত হইবে।

মহালয়ার দিন প্রাতে আহ্নিক ও তর্পণ সমাপন করিয়া বাবার চরণ দর্শন করিতে যাই এবং দুইটি টাকা প্রণামীর সঙ্গে, জ্ঞানগঞ্জের কুমারী ও ভৈরবীমাতাদের জন্য কুড়িটি টাকা ও মণি অর্ডার কমিশন বাবদ চারি আনা দেই। এদিন বাবা যোগেশদাদার গৃহে ছিলেন, তথায় কুমারীভোজন হইয়াছিল, আমি গিয়াই কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাই। ইহার কিছু পরেই বাবার ভোগ হয়। ভোগান্তে বাবা বসিবার ঘরে আসিয়া পান খাইতে খাইতে শিষ্যদিগের দেওয়া কতকগুলি ফুল হইতে দুইটি গোলাপ বাছিয়া বাহির করিয়া বলেন, "এটি পুরুষজাতীয় গোলাপ, এইটি স্ত্রীজাতীয় গোলাপ।" তারপর নিজেরই খেয়াল বশে দুইটি ফুল হইতে কিছু পরাগ লইয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্ত বায়ুতে সঞ্চালন করিয়া অর্ধমিনিটকাল মধ্যে তাহা একটি গোলাপের কলিতে পরিণত করেন। এটা বায়ুবিজ্ঞানের একটি খেলা হইল, এইরূপ শুনিলাম। বাবা বৈজ্ঞানিক demonstrationকে সাধারণতঃ খেলাই বলিতেন। তারপর তিনি বলিলেন, যদি কুমারী খাওয়াও তাহা হইলে এই কলি হইতে খুব বড় একটা গোলাপ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি।

আমি। যদি দশটি কুমারীভোজন করাইলে হয় তবে আমি রাজি আছি।

বাবা বলিলেন, দশটিতে হইবে না। কাজেই কলিটি কলিই রহিয়া গেল।

এই দিন বাবা চারিপ্রকার দীক্ষার কথা বলেন,

১. মন্ত্রবিচারপূর্বক দীক্ষা, ২. কর্তব্যোপদেশমূলক দীক্ষা ৩. বীজ উদ্ধারপূর্বক দীক্ষা ৪. দেবতাপ্রদর্শন দ্বারা দীক্ষা।

বাবা বলিলেন, আমাদের যে দীক্ষা হইয়াছে তাহা প্রথম প্রকারের দীক্ষা। দীক্ষার পূর্ব রাত্রিতে বাবা শিষ্যের তিন বা ততোধিক জন্মের সাধনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া মন্ত্রনির্ণয় করিতেন, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাবা বলিলেন, "বিচারে দোষ থাকিলে তাহা এইরূপে ধরা পড়ে—দীক্ষার আয়োজন মধ্যে কুমারীর জন্য যে বস্ত্র ও ঘৃত দিতে হয়, মন্ত্র নির্ণয় করিবার পর ঐ কাপড়ের উপর ঘৃতের বাটিটি রাখিয়া তদুপরি মন্ত্রোচ্চারণ করিলে ঘৃত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে। বিচারে দোষ থাকিলে ঐ সময়ে বস্ত্রে আগুন ধরিয়া যায়। বাবা বলিলেন, সেপর্যন্ত তাঁহার তিনবার কি চারিবার ঐভাবে মন্ত্রবিচারের ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। অবশ্য সেপর্যন্ত দীক্ষা দিয়াছেন ঐ সংখ্যার বহুশত গুণ শিষ্যকে।

২৯শে আশ্বিন তারিখে বাটীস্থ সকলকে এবং ঢাকা হইতে আগত আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ অমূল্য, ভ্রাতৃবধূ-প্রভৃতিকে এবং মাণিকগঞ্জ (পাটগ্রাম) হইতে আগত আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কাশী রওনা হইলাম। বাবাও, ঐদিন ঐ ট্রেনেই কাশী যাইতেছিলেন, ষ্টেশনে দেখা হইল। ট্রেনটি ছিল একটি পূজা

স্পেশাল, পরদিন সকাল ৯টায় কাশী পেঁছি। পথে প্রভাতে কোনও একটা ষ্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য গাড়ী থামিলে আমি এবং সেই ট্রেনে বাবার অন্য যে সকল শিষ্য-শিষ্যারা কাশী যাইতেছিলেন সকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় গিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিয়াছিলাম।

আমার জন্য শ্রীযুক্ত গোপীনাথ তাঁহার বড়দেও পল্লীতে স্থিত বাসার নিকটে হাউজ কাটারায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী আমার প্রতি তাঁহার চিরন্তন পরমাত্মীয়তাবোধ হইতে আমাদের আশু প্রয়োজনীয় বহু জিনিস কিনিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। কাশীতে পেঁছিয়া মধ্যাহ্নভোজন গোপীনাথের গৃহেই হয়। তৎপর নূতনস্থানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থায় বিব্রত হইয়া পড়ি। সেদিন আশ্রমে যাওয়া হয় নাই। পরদিন (১লা কার্তিক) সপ্তমী পূজা। সেদিন প্রাতেও গৃহস্থালীর কাজ (বাজার করা ইত্যাদি) লইয়াই ছিলাম। পথে বিলাসীপাড়ার নৃপেন্দ্র চৌধুরী দাদাকে মোটরে আশ্রমের দিকে যাইতে দেখিলেও আমারও যাওয়া যে একান্ত কর্তব্য বা প্রত্যাশিত ছিল তাহা বুঝি নাই। বিকালে যখন বাবাকে প্রণাম করিতে গেলাম, তখন প্রথমেই বাবা বলিলেন, "প্রসাদ পেতে এলে না কেন?" কি বলিব? কোনও উত্তর ছিল না। উপস্থিত গুরুভাইরাও নানা কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিলেন। আমি নীরব; প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থালীর ঝঞ্ঝাট ছাড়া, আমার কর্তব্যবোধেরও অভাব ছিল, অযাচিত যাইয়া প্রসাদ পাইতে মনে সঙ্কোচও ছিল। সব অকপটে স্বীকার করা অপেক্ষা মৌনই উত্তম কল্প মনে করিলাম। অন্তর্দর্শীর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না; বলিলেন, "কাল ও পরশু দুদিনই এখানে প্রসাদ পাবে; বৌমাকেও নিয়ে এস।" একবার নয়, একাধিকবার ঐকথা বলিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় প্রকৃত কারণ তাঁহার অবিদিত ছিল না।

এই বৎসর ধরিয়া পাঁচবৎসর কাশী আশ্রমে দুর্গাপূজা হইতেছিল। বাবার এক ভক্তিমান্ শিষ্য শ্রীযুক্ত জীবনধন গাঙ্গুলি বাবার অনুমতিক্রমে খ্রী: ১৯২৭ সনে চারিবৎসরের সঙ্কল্প করিয়া আশ্রমে পূজা আরম্ভ করেন। কর্মকর্তাদের সুবিবেচনার অভাবে প্রথম বৎসরে জীবনধনদাদার ব্যয় খুব অধিক (শুনিয়াছি বার-তেরশত টাকার মত) হয়। পূজার সহিত অসংশ্লিষ্ট বা অতি দূরভাবে অনেক সংশ্লিষ্ট ব্যয়ও পূজার ব্যয় বলিয়া তাঁহার স্কন্ধে চাপান হইয়াছিল। ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া শ্রীশ্রীবাবা নিয়ম করেন যে, যে শিষ্য পূজা করিবে তাহাকে তজ্জন্য মাত্র চারিশত টাকা দিতে হইবে। প্রথম বৎসরে মৃন্ময়ী মূর্তিতে পূজা হয়, এবং মূর্তির জন্যই প্রায় একশত টাকা খরচ হইয়াছিল। এইজন্য কোনও কোনও শিষ্য প্রস্তাব করেন যে, আশ্রমে একখানি ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। পূজার পর বাবা কলিকাতায় আসিলে কেহ কেহ উৎসাহবশে কাঁসারীপাড়ায় কারুগণের গৃহে অনুসন্ধান করিতে করিতে একখানি প্রতিমা

দেখিতে পান এবং সংবাদ পাইয়া যোগেশদাদা প্রতিমাখানি আনিয়া বাবাকে দেখান। প্রতিমার সকল কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বাবা প্রতিমা দেখিয়া বলিলেন, "মা যখন এসেছেন তখন আর ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।" অবশ্য কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য "মা"কে কারুগৃহে একবার যাইতে হইল। কিন্তু মূল্য-নির্ধারণ ও বায়না তৎপূর্বে হইয়া গেল। মূল্য ছয়শত পঁচিশ টাকা শিষ্যগণ চাঁদা করিয়া তুলিয়া দিলেন। প্রতিমার শ্রী বড়ই মনোরম। প্রতিমাটি অষ্টধাতুতে নির্মিত এবং আকারে বৃহৎ না হইলেও খুব গুরুভার। পাদপীঠটি পিতলের এবং উহারই ওজন পঁচিশ সের। প্রতিমা যখন বাবাকে প্রথম দেখান হয় তখন উহা কাষ্ঠের পাদপীঠে আরূঢ় ছিল বলিয়া একস্থান হইতে অন্যত্র নিয়া যাওয়া অপেক্ষা-কৃত সুসাধ্য ছিল।

প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার নিত্যসেবার জন্যও ব্যবস্থা দরকার। বলিয়াছি বাবা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যে শিষ্য পূজা করিবেন তিনি মাত্র চারিশত টাকা দিবেন। তিনি আরও আদেশ দিয়াছিলেন যে, ঐ চারিশত টাকা হইতে দুইশত টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়া নিত্য পূজার জন্য ধীরে ধীরে একটি ফণ্ড (fund) গঠিত হইবে। সেই ফণ্ড না হওয়া পর্যন্ত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ইত্যাদি কয়েকজন শিষ্য প্রতিমার নিত্যসেবার জন্য মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিতে স্বীকৃত হন।* পরে যাঁহারা শিষ্য হন তাঁহারাও কেহ কেহ চাঁদা দিতে থাকেন। এইরূপে নিত্যসেবার কার্য চলিয়া যাইতেছিল। জীবনধন দাদার প্রদত্ত চারিশত টাকা হইতে দুইশত টাকা ফণ্ডের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইলেও তদ্বারা বার্ষিক পূজা নির্বাহে বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল না। কেননা তখন বহু শিষ্য পূজার সময় কাশী যাইতেন, সকলেই কুমারীভোজন এবং কুমারীদের বস্ত্র বাবদ সাধ্যমত টাকা দিতেন। এইরূপে পূজাটি একজনের টাকায় হইলেও আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রায় অন্য শিষ্যগণের প্রদত্ত টাকায়ই হইয়া যাইত। জীবনধনদাদার পরে শ্রীযুক্ত যোগেশদাদা চারিবৎসরের সঙ্কল্প করিয়া পূজা করিতে থাকেন। যে বৎসরের (খ্রী. ১৯৩১) কথা হইতেছিল ইহা যোগেশদাদার পূজার প্রথম বর্ষ। যোগেশদাদা স্থায়ী ফণ্ডের জন্য চারিবৎসরে দেয় আটশত টাকা স্থলে প্রথম বৎসরেই একহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ শ্রীশ্রীবাবাকে দেন। আর পূজার জন্য দুইশত টাকা করিয়া আশ্রমের কর্মকর্তাদিগের হস্তে না দিয়া নিজহস্তে ব্যয় করিতে থাকেন। তাঁহার

---

* কেদারনাথ ভৌমিক দাদা দেবীর স্থায়ী ফণ্ডের (fund) জন্য ক্রমে এগারশত টাকা দিয়াছিলেন। আরও কতিপয় শিষ্য ঐ ফণ্ডের জন্য টাকা দিয়াছিলেন। এইরূপে কয়েক হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেহরক্ষার পূর্বে শ্রীশ্রীবাবা ফণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত টাকাগুলি স্বতন্ত্র করিয়া যথারীতি ফণ্ড গঠন করিয়া না যাওয়ায় ঐ ফণ্ড আর হইতে পারে নাই। শ্রীশ্রীগোপালের নিত্য সেবার জন্য কোনও ফণ্ড নাই। শ্রীশ্রীবাবার মর্মরমূর্তির (যাহার বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে) জন্যও কোনও ফণ্ড হয় নাই। এই শেষোক্ত দুই উদ্দেশ্যে কোন অর্থও সংগৃহীত হয় নাই। ইহাদের এবং দেবীরও সেবাপূজা অব্যাহত রাখিতে হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও উপযুক্তরূপ ফণ্ড হওয়া দরকার।

পূজার আয়োজনে একটু আড়ম্বর বেশী ছিল বলিয়া তাঁহার ব্যয় দুইশত টাকা অপেক্ষা অধিক হইত। জন্মোৎসবের ন্যায় পূজা উপলক্ষেও আমি যোগেশদাদার সুযোগ্য পুত্র যতীশের সৌজন্যের বহু পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি তখনও শিষ্যগণের মধ্যে খুব জুনিয়ার—প্রায় কনিষ্ঠ বলিলেই চলে। গুরুভাইগণের সঙ্গে মেলামেশা অতি অল্পই হইয়াছিল, বাবা অষ্টমী ও নবমীতে আশ্রমে সস্ত্রীক প্রসাদ পাইতে বলিয়াছিলেন। আমি দুইদিনই সস্ত্রীকই গিয়াছিলাম; কিন্তু দুই দিনই যতীশদাদা অনুযোগ করিয়াছিলেন, "আপনি ছেলেমেয়েদিগকে কেন সঙ্গে আনেন না?"

অষ্টমীপূজার দিন কুমারীভোজন জন্য পনরটি টাকা রায়সাহেব দাদার হস্তে দেই। লজ্জাবশতঃ বাবাকে তাহা বলি নাই। ইহা নাকি বিধিসঙ্গত হয় নাই। ইহার পর যখন পূজাদি উপলক্ষে টাকা দিয়াছি তাহা বাবার নিকটই দিয়াছি; তিনি অবশ্য উহা তৎক্ষণাৎ রায়সাহেব দাদার হস্তে দিতেন।

এবারেও তিনদিন কুমারীভোজন হয়; মহাষ্টমীর দিন কুমারীরা বস্ত্র পান। রায় সাহেবদাদাই বঙ্গলক্ষ্মী মিল হইতে অর্ডার দিয়া বাসন্তী রঙে রঞ্জিত শাড়ী নিয়াছিলেন।

মহাষ্টমীপূজার দিন যোগেশদাদার চৈতন্য হয় অন্য বৎসরের ন্যায় কলিকাতা হইতে কুমারীযাতাদের দক্ষিণার জন্য রূপার সিকি যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া আনা হয় নাই। যাহা সঙ্গে ছিল বা কাশীতে সংগ্রহ করা গিয়াছিল তাহা দুইদিনে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণারূপে নিকেলের চুয়ানি বা আনি দুয়ানি দিয়া চারি আনা পূর্ণ করিয়া না দিয়া কুমারীদিগকে এক একটি রূপার সিকি দেওয়াই বাবার রীতি ছিল। সেইজন্য অষ্টমী পূজার দিন বিকালে যোগেশদাদা বাবাকে জানান, "বাবা, ভুল হইয়া গিয়াছে, কলিকাতা হইতে যথেষ্ট সংখ্যায় সিকি আনা হয় নাই। এখানেও উহা সংগ্রহ করা কঠিন। দণ্ড যা' দিতে হয় দিব, এখন যে ব্যবস্থা করিতে হয় করুন।"

বাবা। আচ্ছা দণ্ডের অর্দ্ধেক তোমরা দিও; অর্দ্ধেক আমি দিব। কাল সকালে সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা সিকি তৈয়ার করিয়া দিব।

পরদিন প্রাতে আশ্রমে গিয়া শ্রীযুক্ত জানকীদাদার মুখে শুনিলাম, সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা সিকি প্রস্তুত হইবে। আমি কৌতূহলবশে বাবার বসিবার ঘরেই বসিয়া রহিলাম। কিন্তু প্রক্রিয়া দেখা আমার অদৃষ্টে ছিল না। কিছুক্ষণ পরে বাবা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন; তাঁহার হাতে এক টুকরা নীল কাগজ মধ্যে চল্লিশ টাকার অর্থাৎ ১৬০টি সিকি।* সবগুলি একেবারে নূতন, যেন সেই মুহূর্ত্তে

* পরে শ্রীযুক্ত কেদার ভৌমিকদাদার মুখে শুনিয়াছি, সিকি তাঁহার সম্মুখে লেন্স্ দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছিল। কোনও নূতন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয় নাই।

টাকশালের যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটিতে ১৯২৯ সনের ছাপ। এটা ১৯৩১ সন। মনে পড়ে শুনিয়াছিলাম, ১৯২৯ সনের একটা সিকিকে আদর্শ করিয়া এই সিকিগুলি প্রস্তত হইয়াছিল। সিকিগুলিতে অপূর্ব গন্ধ। বাবা বলিলেন, "বিজ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ উপাদানে উৎপন্ন হওয়ায় ঐ সুগন্ধ হইয়াছে—উহা কিছুক্ষণ থাকিবে।"

ভাবিলাম, এই সব অলৌকিক ব্যাপার চক্ষে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া যোগীর করায়ত্ত; তাহাকে দিয়া যোগী সব করাইতে পারেন। আর মায়া যাঁর অধীন তিনিই ত ঈশ্বর; সুতরাং যোগীই ঈশ্বর, ঈশ্বরই যোগী। আমরা সাক্ষাৎ ঈশ্বরেরই আশ্রিত, কিন্তু তাহা যুক্তিমাত্র দ্বারা না বুঝিয়া, অনুভূতি দ্বারা বুঝিব কি? মনের লোহা স্পর্শমণির সংযোগে ধীরে ধীরে সোনা হইতেছে ইহা বুঝিব কি? কতদিনে বুঝিব? মনের ময়লা কতদিনে কাটিবে? কিসে কাটিবে? কর্মে? একবৎসর যাবৎ দীক্ষা হইয়াছে, কতটুকু কর্ম করিতে পারিয়াছি? আর সে কোন্ দরের কর্ম?

কুমারীভোজন হইয়া গেল। কুমারীরা সকলেই নূতন সিকি দক্ষিণা পাইয়া ভারী খুসী! বাবারও মুখভরা হাসি! যোগেশদাদা পরমানন্দে নিজের ত্রুটি এবং পরমশক্তিশালী গুরুকর্তৃক অলৌকিকভাবে উহার সংশোধনের বিবরণ বর্ণন করিয়া আগন্তুকমাত্রকে বিস্মিত করিতেছিলেন! রায়সাহেব দাদা মৃদুহাসির আলোকে গোঁফদাড়ির ঘন অরণ্য কিঞ্চিৎ আলোকিত করিয়া বলিলেন, "সবে ত সূচনা; আরও কত দেখিবেন, চিন্তা কি?" মনে মনে বলিলাম, দেখিতে ত তত চাই না, চাই লোহা সোণা হইতে। পরশমণির পরশ ত লাগিয়াছে, কিন্তু লোহা ত সোণার রঙ্ ধরিবার কোনও লক্ষণ দেখাইতেছে না।

এবারে কাশীতে শ্রীযুক্ত প্রিয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদার সহিত পরিচয় হয়। জানকীদাদাদের সঙ্গে ইহার খুব ঘনিষ্ঠতা; ক্রমে ইহারই স্বগুণে আমার সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। বাবার পুরাতন শিষ্য; পোষ্টাফিসে কাজ করিতেন; ইনস্পেক্টর হইয়া অবসর লইয়াছেন; কাশীতেই আছেন। পুত্র নাই—বহু কন্যা। দুইটি তখনও অবিবাহিত। ইহারা এবং প্রিয় দাদার একটি কুমারী দৌহিত্রী বাবার বড় প্রিয়; সর্বদা আশ্রমে আসেন ও বাবার কাছে বসিয়া কৌতুক-কথা শুনেন। একদিন বিকালে আশ্রমে গিয়া শুনিতে পাইলাম, ঐদিন দ্বিপ্রহরে ঐ কুমারীদিগের মধ্যে একটি (বয়স ৯ বা ১০ বৎসর) বাবাকে বলেন, "কাল রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছি যেন আপনাকে কোলে নিয়েছি।" শুনিয়া বাবা খুব হাসেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বলেন, "চল্, উপরে চল্।" সেই কুমারীটি এবং তাহার বড় কুমারী ভগিনীটি (বয়স ২।৩ বৎসর বেশী হইবে) সহ উপরে যাইতে যাইতে সিঁড়িতে বাবা ছোটটিকে বলেন, "নে দেখি আমাকে কোলে তুলে।" মেয়েটি বাবাকে ধরিয়া দেখে শোলার মত হাল্কা, এবং হাসিতে হাসিতে কোলে তুলিয়া

নেয়, তারপর অন্য কুমারীটির কোলেও বাবা উঠেন ; কিন্তু তখনই ধীরে ধীরে তিনি নিজের লঘিমা প্রতিসংহার করিতে থাকিলে ঐ বালিকাটি বেশীক্ষণ তাঁহাকে কোলে রাখিতে পারে নাই। তারপর বাবা উপরে চলিয়া যান, বালিকাদ্বয় ছুটিয়া নীচে আসিয়া সমবেত শিষ্যদের সমক্ষে তাহাদের পিতার নিকট সকল কথা প্রকাশ করে।

আমি বাসায় আসিয়া এই বিবরণ আমার স্ত্রীকে বলি। পরদিন আমার স্ত্রী আশ্রমে গিয়া সেই দুইটি বালিকাকে দেখিতে পান এবং তাহাদের মুখ হইতে ঐ বিবরণ পুনরায় শুনেন। বোধ করি এই বৎসর কি ইহার পর বৎসর বাবা প্রিয় দাদার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, "পূজোয় এদের জন্য পোষাকী কাপড় কিনতে পেরেছ ত?" দিদি বলেন, "কাপড় কেনা হয়েছে, অনেকগুলি কাপড় কিনতে হয় ত? বেশী ভাল কাপড় কি করিয়া কেনা হইবে?" ইহা শুনিয়া বাবা কুমারী দুইটিকে বলেন, "বল্ তোরা কি কাপড় চাস্।" মেয়েরা বালিকাসুলভ অনেক রকম সখের কথাই বলিল, পরে বাবা ইহাদিগকে দুইখানি ছাপান গরদের শাড়ী দেন। উক্ত কথাবার্তাগুলি সবই আমার স্ত্রীর সমক্ষে হইয়াছিল।

এই বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পূজার ছুটিতে সস্ত্রীক কাশী গিয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রীযুক্ত গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে তাঁর বাসায় যান। (গোপীনাথ তখন কাশীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ)। সকলেই জানেন ডক্টর দাশগুপ্ত ভারতীয় ও য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় দর্শনের একখানি ইতিহাস লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তা' ছাড়া যোগশাস্ত্রসম্বন্ধেও তিনি ইংরাজীতে দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। গোপীনাথও ভারতীয় দর্শনে প্রায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ; যোগশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার অসামান্য। এরূপ পণ্ডিতদ্বয়ের পরস্পর সংলাপে যোগশাস্ত্রের কথা বোধ করি স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িয়াছিল। তখন শাস্ত্রোক্ত কোনও কোনও যোগবিভূতিপ্রসঙ্গে ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, ঐ ব্যাপারগুলি সব বুঝা যায় না। তাহাতে সরলচিত্ত গোপীনাথ স্বয়ং সেগুলি যেরূপ বঝিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে বলেন। শুনিয়া ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, "আপনি ত বিষয়টা কতকটা নূতন আলোকে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু এইরূপ বিভূতিসম্পন্ন যোগী বাস্তবিক কোথাও আছে কি?" তদুত্তরে গোপীনাথ বলেন, "আছে বই কি? এই কাশীতেই আমার গুরুদেব আছেন যাঁহার আরও কত আশ্চর্যকর বিভূতি আছে।" তখন ডক্টর দাশগুপ্ত শ্রীযুক্ত গোপীনাথকে বলেন, "তা'হলে একদিন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।" গোপীনাথ স্বীকৃত হন ; পরদিন বিকালে তাঁহারা বাবার কাছে আসিবেন স্থির হয়।

এই সংবাদ সেইদিনই আমরা (আমি ও আমার ভ্রাতা) পাই। আমার ভ্রাতা বলিল, "বাবা নিশ্চয়ই সুরেন্দ্র দাশগুপ্তকে কিছু বিভূতি দেখাইবেন ; আমরা পূর্ব হইতেই আশ্রমে গিয়া থাকিব।" তাহাই করিলাম।

দাশগুপ্ত মহাশয় যথাসময়ে আসিলেন ; সঙ্গে ছিলেন তাঁহার অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কলিকাতা রিপন কলেজের (শুনিয়াছি ইংরাজি সাহিত্যের) এক অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (উদ্ভিদ্‌বিদ্যার) এক অধ্যাপক এবং শ্রীযুক্ত গোপীনাথ। ডক্টর দাশগুপ্তের সহিত বহুপূর্ব হইতেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এবং তাঁহার ন্যায় আমিও তর্কভূষণ মহাশয়ের ছাত্র, কিন্তু আশ্রমে ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি মনে মনে সঙ্কোচবোধ করিতেছিলাম। সেইজন্য আমি ইঁহাদের দৃষ্টি পরিহার করিয়া একটু অন্তরালে বসিয়াছিলাম ; আমার ভাই বিভূতিদর্শনের লোভে ইঁহাদের খুব কাছে বসিয়াছিল।

পূজনীয় তর্কভূষণ মহাশয় কাশীতেই থাকিতেন, বহুবার শ্রীশ্রীবাবার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তিও ছিল, এমন কি দীক্ষাও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক শেষপর্যন্ত বাবা হইতে তাঁহার দীক্ষা নেওয়া হয় নাই। সে যাহা হউক তর্কভূষণ মহাশয় ব্যতীত আর সকলের পরিচয় দিতে গিয়া গোপীনাথ বলিলেন, "ইনি (দাশগুপ্ত) যোগশাস্ত্রসম্বন্ধেও ইংরাজী ভাষায় দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।" বাবা মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া যেন গুণগ্রাহিতাই ব্যক্ত করিলেন।

ডক্টর দাশগুপ্ত বোধ করি বিনয় প্রকাশের জন্যই কিংবা বিভূতিদর্শনের ইচ্ছা হইতে বলিলেন, "যোগশাস্ত্রের সব ত বুঝা যায় না—"

আরও কিছু বোধ করি বলিতেন, বাবা ঐ পর্যন্ত শুনিয়াই বলিলেন, "তুমি যা লিখেছ, সেটুকু বুঝেছ ত ?"

দাশগুপ্ত। তা-ই কি বলা যায় ? আর লিখেই বা কি হ'ল ?

বাবা। হ'ল না কেন ? যা' চেয়েছ তা' ত যথেষ্টই পাচ্ছ। অর্থও আসছে, নামও হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারও আসছে।

সাধুরা মনরাখা কথা জানেন না ; আবশ্যক বোধ করিলে কঠোর সত্য অম্লান-বদনে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলেন। জিজ্ঞাসু বা শ্রোতা অনুকূল মনোবৃত্তি নিয়া তাহা গ্রহণ করিলে তাহার কল্যাণই হয়। ডক্টর দাশগুপ্ত কি মনে করিলেন তাহা বলিতে পারি না, তবে বিভূতিদর্শনের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট প্রকাশ করিতে বোধ করি একটু সঙ্কোচ বোধ করিলেন।

পূজনীয় তর্কভূষণ মহাশয় বাবার সঙ্গে দুই চারিটি কথার পর বলিলেন, "আমার কিছু আপনাকে ক'রে দিতে হবে।"

বাবা। এসো দেখা যাবে।

তর্কভূষণ। কতদিন মধ্যে কিছু কিছু বুঝা যায় ?

বাবা। তিন বৎসর।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দেখিলেন ডক্টর দাশগুপ্তের বিভূতিদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই

থাকিয়া যায়। তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "ইনি (দাশগুপ্ত) কিছু দেখিতে চান।"

শ্রীশ্রীবাবা হাত নাড়িয়া স্পষ্ট অসম্মতি জানাইলেন। কাজেই গোপীনাথকে নীরব হইতে হইল, দাশগুপ্তের মুখও যেন ঈষৎ ম্লান হইল। বলিতে ভুলিয়াছি তর্কভূষণ মহাশয়-প্রভৃতি সহ দাশগুপ্তের আগমনের পূর্ব হইতেই কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা বিচারপতি শ্রীযুক্ত (পরে স্যার্) মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া বাবার কাছে বসিয়া ছিলেন। দাশগুপ্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিছু দেখেছেন কি?" তিনি বলিলেন, "অনেক রকম দেখেছি।" বাবা ঈষৎ হাসিলেন। দাশগুপ্তের মুখ যেন আরও ম্লান হইল।

ইহার পর কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ডক্টর দাশগুপ্তের সঙ্গী অধ্যাপকদ্বয় বেশ বিনয়নম্রভাবে সব শুনিতেছিলেন। কথা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকিলে ইঁহারা উভয়ে বাবার সঙ্গে মৃদুস্বরে দুই চারিটি কথা বলিলেন যাহা আমার এবং বোধ করি উপস্থিত আরও অনেকেরই কর্ণগোচর হয় নাই। বাবা বোধ করি ইঁহাদের বিনয়পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট হইয়া এবং কিঞ্চিৎ দর্শনের জন্য সাতিশয় আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার তক্তপোষের একটি পায়ায় ঝুলান অনেকদিনের শুষ্ক একটি গাঁদাফুলের মালা হইতে কয়েকটা ফুল ছিঁড়িয়া অধ্যাপকদ্বয়ের হস্তে দিলেন, পরে তাঁহাদেরই একজনের হাত হইতে উহার কিয়দংশ নিজ দক্ষিণহস্তের তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা তুলিয়া লইয়া ঐ হস্ত কয়েক সেকেণ্ড বায়ুতে আন্দোলিত করিয়া উহা সুশুভ্র কর্পূরে পরিণত করিয়া দিলেন। বাবার কাছে যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই একটু একটু ভাগ পাইলেন। আমার ভাইও পাইয়াছিল, সে উহা আমাদের বাসায় নিয়া আসে। ঐ কর্পূরের গন্ধ ও স্বাদ বাজারে প্রাপ্য কর্পূরের গন্ধ ও স্বাদ হইতে বহুগুণ উৎকৃষ্ট।

এই সময়ে প্রায় সন্ধ্যা হওয়ায়, "দুই-তিনদিন পরে আবার আসিব" বলিয়া ডক্টর দাশগুপ্ত সঙ্গিগণ সহ চলিয়া আসেন। কিন্তু পরদিনই হউক বা তাহার পরদিন স্ত্রী ও দুইটি কন্যাসহ পুনরায় বাবার দর্শনে যান। এ দিনও গোপীনাথের সঙ্গেই তাঁহারা গিয়াছিলেন। পূর্বে সংবাদ না পাওয়াতে বিশেষ আগ্রহসত্ত্বেও আমার ভ্রাতা বা আমি ঐ সময়ে আশ্রমে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। ডক্টর দাশগুপ্ত চলিয়া আসিবার পর আমরা আমাদের অভ্যাসমত আশ্রমে যাই। গিয়া শুনিলাম, দাশগুপ্তের স্ত্রী ও বড় কন্যাটি বারান্দা হইতে বাবাকে দর্শন করেন, ছোট কন্যাটি শিশু বলিয়া পিতার সহিত হলের মধ্যেই বসিয়াছিলেন। বাবা শিশুদের সঙ্গে সচরাচর যেরূপ কৌতুকপূর্ণ আলাপ করিতেন, এই বালিকাটির সহিতও সেইরূপ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বালিকাটি বাবার নিকট একটা কিছু জিনিষ চায় (বোধ করি উহার মা উহাকে ঐরূপ চাহিতে শিখাইয়া আনিয়াছিলেন)। তদুত্তরে বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, তোকে সন্দেশ খাইয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া পার্শ্বস্থ মসলার

কৌটাটি খালি করিয়া নিকটে উপবিষ্ট শিষ্য রজনী বন্দ্যোপাধ্যায় দাদাও গরদের চাদরখানি চাহিয়া লইয়া তদ্দারা সেই কৌটাটি ঢাকিয়া ডক্টর দাশগুপ্তের মেয়ের হাতে দেন এবং নিজের তক্তপোষে স্বহস্ত দ্বারা তিনটি আঘাত করিয়া দাশগুপ্তকে কৌটা খুলিয়া দেখিতে বলেন। কৌটা খোলা হইলে দেখা গেল, কৌটা ভরা অতি সুঘ্রাণ সন্দেশ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

আমার হাইড্রোসিল (Hydrocele—কোষে জল সঞ্চয়) ব্যাধি ছিল। কিন্তু আমি অস্ত্রপ্রয়োগে বিশেষতঃ ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ বড় ভীরু, তাই দশ-এগারবৎসর ঐ ব্যাধি বহন করিতেছিলাম। কিন্তু ইদানীং উহা বিশেষ অসুবিধাজনক এবং সময় সময় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই এইবার কাশীতে ইচ্ছা হইল শ্রীশ্রীবাবা অনুমতি দিলে অস্ত্রোপচার করাইব। কিন্তু যখনই বাবার নিকট গিয়াছি তখনই তাঁহাকে বহুলোকে পরিবৃত দেখিয়া ব্যারামের বিষয় উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছি। একদিন ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে বিকালে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দেখি শ্রীশ্রীবাবা ঠাকুর মন্দিরের পশ্চাতে বাগানে একাকী দাঁড়াইয়া কোন একটা গাছ বা আর কিছু যেন মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিকটে কোনও লোক নাই। আমি অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলাম এবং সুযোগ বুঝিয়া আমার উক্ত অভিপ্রায় নিবেদন করিলাম। বাবা বলিলেন, "অপারেশন করাতে পার" এবং তৎপর আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বসিবার হলে গেলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরে গিয়া দেখি, ঘরটি লোকে পূর্ণ। আমার মনে হইল, আমার অভিপ্রায় ও সঙ্কোচ নিজ হইতে অবগত হইয়া আমাকে নির্জনে বক্তব্য নিবেদন করিবার সুযোগ দিবার জন্যই তিনি ঐদিন ঐসময়ে একাকী দাঁড়াইয়া ছিলেন। কেননা সাধারণতঃ তাঁহাকে ঐসময়ে ঐস্থানে প্রায় দেখা যাইত না। আশ্রমমধ্যে ভ্রমণব্যপদেশেও যান নাই, কেননা তাহা হইলে এতগুলি লোক হলের মধ্যে বসিয়া থাকিত না।

কাশীতে এবার আমরা মোট ছাব্বিশ দিন ছিলাম। আমার ছুটি থাকিলেও আমার ভ্রাতার ছুটি ছিল না—সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ; কলেজ খুলিবার পূর্বে তাহাকে ঢাকায় ফিরিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ছেলেমেয়েদেরও বিদ্যালয়ের ছুটি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল এইং শ্রীশ্রীবাবা অনুমতি দেওয়াতে আমার ছুটির মধ্যেই হাইড্রোসিল অপারেশন করাইব এই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম ; এই সকল কারণে যদিও কাশীতে আমরা সকলেই খুব আনন্দেই ছিলাম এবং বাবার স্নেহের পরিচয় পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিতেছিলাম, আমার স্ত্রীও কন্যার শোক অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, তথাপি আমাদের আর বেশীদিন তথায় থাকা হইল না।

বাবা আমার স্ত্রীর দীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করিয়াছিলেন আমাদের কলিকাতায় পুনর্যাত্রার দিন। ভোরে তাহার দীক্ষা হয়, বিকালে সাড়ে চারিটায় আমরা কাশী ত্যাগ করি। ষ্টেশনে আসিবার পথে ভাড়া করা বাস্ হইতে

নামিয়া আমরা সকলে বাবাকে প্রণাম করিয়া আসি। বাবা স্নেহদৃষ্টিতে সকলকে আপ্যায়িত করেন এবং ঘরে লোক ছিল বলিয়া স্বয়ং বাহিরে আসিয়া আমার স্ত্রীকে পানপ্রসাদ দেন ও তাঁর প্রণাম গ্রহণ করেন।

দুইদিন পরে আদালত খুলিবে; ষ্টেশনে আসিয়া দেখি গহন লোকারণ্য। আমরা ছেলেমেয়ে সহ সংখ্যায় বার-তের জন। গাড়ীতে ঢুকিতে পারিব এবং পারিলেও সকলে বসিবার স্থান পাইব এ ভরসা মোটেই হইতেছিল না। গাড়ী (বেনারস এক্সপ্রেস্ ট্রেন) যথাসময়ে প্লাটফর্মে ঢুকিলে সব লোক ছুটাছুটি ও ঠেলাঠেলি করিয়া তাহাতে উঠিতে লাগিল। আমরাও কিছু ছুটাছুটি করিলাম কিন্তু ইতিমধ্যেই সব কামরায় ভিড় জমিয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখি সকলের পিছনের গাড়ীর শেষ প্রকোষ্ঠটি (compartment) একবারে খালি। কেহ উহা রিজার্ভ করিয়াছে এরূপ কোনও নিদর্শন নাই দেখিয়া সদলবলে আমরা তাহাতে ঢুকিয়া পড়িলাম। পরে বহু যাত্রী সেদিকে আসিয়াছে, প্রকোষ্ঠের ভিতরে উঁকিও দিয়াছে, কেহই—কি কারণে বলিতে পারি না—তাহাতে ঢোকে নাই। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ট্রেন ছাড়িল; শেষপর্যন্ত একটি রেল কর্মচারী এবং মোগলসরাই ষ্টেশনে আর একটি ভদ্রলোক ভিন্ন সেই বৃহৎ প্রকোষ্ঠে কোন ষ্টেশনেই অন্য লোক ঢোকে নাই। পথে এক ষ্টেশনে রেল কর্মচারীটি নামিয়া গিয়াছিলেন। আমার স্ত্রী গাড়ীতে ঢুকিয়া প্লাটফর্মের বিপরীত দিকে বসিয়াছিলেন, তিনি সেখানে সর্বক্ষণ বাবার গাত্রগন্ধ পাইতেছিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিলে তিনি তাহা বলেন। তখন আমাদের কাহারও সন্দেহ রহিল না, এরূপ ভিড়ের দিনে একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে এত আরামে আসা একমাত্র বাবার কৃপায়ই সম্ভব হইয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর শ্রীযুক্ত রজনীদাদার মুখে শুনিতে পাই তিনিও দীক্ষার বৎসর পূজার ছুটিতে পত্নী, ভগিনী ও বৃদ্ধা মাতা সহ পশ্চিমে তীর্থদর্শন করিতে গিয়া একদিন মথুরা ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় যাত্রীর ভিড় দেখিয়া তাঁহারা আতঙ্কিত হন, কিন্তু ট্রেন আসিয়া পড়িলে দেখিলেন যদিও প্রত্যেক গাড়ীতেই ভীষণ ভীড়, তথাপি তাঁহার সম্মুখে একটি তৃতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠ একেবারে খালি। তিনি ঐটিতে মাতা প্রভৃতি সহ স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেন; পরেও উহাতে আদৌ ভীড় হয় নাই। সেদিন তাঁহার স্ত্রীও গাড়ীতে বসিয়া বাবার গাত্রগন্ধ পাইয়াছিলেন।*

সদ্‌গুরু যে সত্যই শিষ্যদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং আবশ্যকমত কৌশলে তাহাদের উপকার করেন এই সকল ঘটনা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সদ্‌গুরু পূর্ণ, কাজেই সর্বব্যাপী; শিষ্যের প্রয়োজন মত যেখানে সেখানে তাঁহার সত্তা ফুটিয়া উঠিয়া প্রয়োজনসাধন করে। তজ্জন্য তাঁহার একস্থান হইতে অন্যস্থানে

* এই বিবরণটি রজনীদাদা পরে "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ" পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন।

ছুটিতে হয় না। যোগশাস্ত্রোক্ত 'নির্মাণচিত্ত' অবলম্বনে একই সময়ে বহুস্থানে তাঁহার আবির্ভাব হইতে পারে এবং ঐরূপেও তিনি বহু প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন। এসব কথা পড়াশুনা ছিল, এখন ক্রমে তাহার সত্যতা অনুভব করিতে লাগিলাম। গুরুর সহিত সর্বদা চিত্তের সংযোগ রক্ষা করিতে পারিলে কাহারও কোনও বিপদে দিশাহারা হইবার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সেরূপ সংযোগ এখন পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিতেছি কই ?

আমার ভ্রাতা শ্রীমান অমূল্য শ্রীশ্রীবাবাকে প্রথম দর্শনের দিন হইতেই তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে। সেই জন্য আমি ভাবিতেছিলাম যে, সেও তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিবে। কিন্তু এবার কাশীতে গিয়া আমার মনোভাব তাহার নিকট ব্যক্ত করিবার পূর্বেই শুনিতে পাইলাম যে সে বহুবৎসর পূর্বে কৈশোরেই আমাদের বাটীস্থ সকলের অজ্ঞাতসারে কতিপয় সমবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়া গোরক্ষপুর গিয়া যোগিরাজ ৺গম্ভীরনাথ বাবাজী হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিল। গুরু তাহাকে সাধনাবিষয়ে কোনও কড়া নিয়ম না দেওয়াতে তাহার দীক্ষার কথা বাটীতে প্রকাশ পায় নাই। আমাদের ঢাকার বাসায় তাহার প্রকোষ্ঠে বাবা গম্ভীরনাথের একখানি ছবিমাত্র ছিল। ঐ বাসায় আরও বহু মহাপুরুষের ছবি ছিল। সেই জন্য অমূল্যের ঘরে ঐ ছবিখানি কাহারও কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয় নাই। যোগিরাজ গম্ভীরনাথও একজন সদ্‌গুরুই ছিলেন, সুতরাং অমূল্যের আর গুরুকরণের প্রয়োজন ছিল না ; সে আমাকে ধর্মপত্নীর জন্য বাবার নিকট দীক্ষাপ্রার্থনা করিতে বলে। আমার দিদিরও কুলগুরু হইতে দীক্ষা হইয়াছিল, এবং তিনি বহু বৎসর যাবৎ অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে পূজা সন্ধ্যা করিতেছিলেন। এবার বাবাকে দেখিয়া তাঁহারও খুব ভক্তি হয়, এবং পুনরায় দীক্ষা নিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি কাশীতে থাকা কালেই এই দুইজনের জন্য বাবার চরণে দীক্ষাপ্রার্থনা করি ; উত্তরে তিনি বলেন, "সেখানে (জ্ঞানগঞ্জে) লিখিয়া দিব এবং অনুমতি আসিলে জানাইব।"

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই অপারেশনের ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হই এবং ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটি কেবিন পাইয়া তথায় ভর্তি হই। হাসপাতালে যাইবার পূর্বে শ্রীশ্রীবাবাকে একখানি পত্র লিখিয়া যাই। ২৪শে অগ্রহায়ণ আমার অস্ত্রোপচার হয়। ক্লোরোফর্ম না করিয়া কোকেন সহযোগে (local anaesthesia দ্বারা) অস্ত্র করা হইয়াছিল। আমার স্বভাব বিবেচনা করিয়া ইহা আমার কাছে খুবই আশ্চর্যের বিষয় মনে হইয়াছে যে, অস্ত্রোপচারের পূর্বে ও অস্ত্রোপচারকালেও আমার মনে মুহূর্তের জন্যও ঈষৎমাত্র ভয়ও হয় নাই। আমি যে কয়দিন হাসপাতালে ছিলাম সে কয়দিনমধ্যে আমার কেবিন-সংলগ্ন সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে (surgical ward) কয়েকটি রোগীর মৃত্যু হয়। ইহাতেও আমার

মনে বিন্দুমাত্রও ভয় হয় নাই। ২৬শে অগ্রহায়ণ বিছানায় শুইয়া শুইয়াই পত্রদ্বারা শ্রীশ্রীবাবাকে জানাই যে অস্ত্রোপচার নির্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে এবং তদবধি শয্যায় শুইয়া আছি; গ্লানি আছে কিন্তু তাঁহারই কৃপায় সহ্য করিতে পারিতেছি। বাবা পত্র পাইয়াই উত্তর দেন, "কোনও চিন্তা করিও না, ধীরে ধীরে ভাল হইয়া যাইবে। মানস জপ করিও তাহাতে বিশেষ ফল পাইবে।" বাবার পত্র পাইয়া মনে খুব আনন্দ হয় এবং গ্লানির মধ্যেও আরাম বোধ হইতে থাকে। অপারেশনের দিন বাসায় আমার স্ত্রী বাবার ছবির দিকে তাকাইয়া মনে মনে তাঁহাকে ডাকিতে থাকে। ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার মনে হইয়াছিল, যে ছবিখানি যেন মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল ও তাহাতে বাবার শ্রীমুখ হাস্যময় হইয়া উঠিল, এমন কি তাঁহার দন্তহীন মাড়ি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেল। ছবিতে অবশ্য হাসিও নাই, মুখও ঈষন্মাত্রও বিবৃত নহে। দয়াল গুরু এমন করিয়াই ব্যাকুল প্রাণে অভয় সঞ্চার করিয়াছিলেন। গোপীনাথ সত্যই বলিয়াছিলেন, "ক্রমশঃ বুঝিবেন উঁর কত করুণা!" তিনি কতবারই করুণাবশে কত প্রকারে সাড়া দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন; কেবল মোহনিদ্রাস্থ আমরা—আমি—জাগিয়াও জাগি নাই; কেবল হয়ত মুহূর্তের জন্য চক্ষু মেলিয়া পাশ ফিরিয়া গাঢ়তর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

দশদিন হাসপাতালে থাকিয়া বাসায় ফিরিয়া আসি। আসিবার দিন সেলাইয়ের স্থলে ভাসা ভাসা (superficial) ঘা দেখা যায়, আমারই একটু ত্রুটিতে (জলস্পর্শ হওয়ায়) উহা হইয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন, উহাতে ভয়ের কিছু নাই। তথাপি সারিতে সময় লাগিয়াছিল। বাবা যে লিখিয়াছেন, ধীরে ধীরে ভাল হইয়া যাইবে, ঠিক তাহাই হয়।

রায়সাহেব ননীদাদা এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পূজার সময় হইতে শ্রীশ্রীবাবার কাছে কাশীর আশ্রমে ছিলেন। এই সময়মধ্যে তিনি উপর্যুপরি কয়েকটি গুরুতর শোক প্রাপ্ত হন। আর, মুখে স্নায়ুশূল রোগেও মধ্যে মধ্যে খুব ভুগিতেছিলেন। মাঘ মাসে এই রোগটি এত প্রবল হয় যে, তাঁহার পক্ষে কথা বলা একেবারে অসম্ভব হয়। ঠিক এই অবস্থায় তিনি তাঁহার পূর্বতন উপরওয়ালা (Inspector General of Prisons) হইতে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ পান। রায় সাহেবদাদা কলিকাতা আসিয়াছেন এবং আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার অলৌকিক শক্তিবলে স্বয়ং উপকৃত হইয়া সেই সংবাদ পত্রদ্বারা শ্রীযুক্ত কেদার ভৌমিকদাদাকে ডাকিয়া নিয়া তাঁহাকে সব বলিয়াছেন—এই খবর আমি শ্রীযুক্ত জানকীদাদা হইতে পাইয়া রায়সাহেব দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ১নং লাভলক্ ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীতে যাই এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রাপ্ত হই।

ননীদাদা কলিকাতা আসিয়া নির্দিষ্ট দিনে আহারাদি করিয়া এবং আফিসের

পোষাক পরিয়া বাহির হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কথা একেবারেই বলিতে পারেন না বলিয়া একখানি শ্লেট ও পেন্সিল সাথে লইয়া যাইবারও উদ্যোগ করিয়াছেন (বাড়ীতেও ঐ প্রকারেই তিনি স্বীয় স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন চালাইয়া লইতেছিলেন), বাড়ী হইতে বাহির হইবেন এমন সময় তাঁহার স্ত্রী—আমাদের "রায়সাহেব দিদি"—দূর হইতে ডাকিয়া তাঁহাকে কিছু বলেন। রায়সাহেব দাদা কথাটি ঠিক শুনিতে না পাইয়া হঠাৎ বলিলেন, "হ্যাঁগো' কি বলছ?" এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিলেন তাঁহার স্নায়ুশূল এবং তজ্জনিত বাক্য উচ্চারণের অক্ষমতা আর নাই! তারপর তিনি অফিসে গেলেন এবং শ্লেটের সাহায্যব্যতিরেকেই সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া আসিলেন।

আমি যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই তখন রায়সাহেব সুস্থ বা সুস্থপ্রায় —কথা বলাতে বিশেষ কোনও ক্লেশ ছিল না। তাহার তিন দিন পরে তিনি কাশী রওনা হন, তৎপূর্বেই পুনরায় রোগক্লেশ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়া তিনি শ্রীযুক্ত কেদার ভৌমিকদাদাকে এই মর্মে পত্র দিয়াছিলেন: "আমি কাশীতে ফিরিয়া আসিলে বাবা বলিয়াছেন, 'তোমাকে সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইবে বলিয়া কয়েকটা দিনের জন্য রোগভোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলাম। তোমার ভোগ আরও কয়েকদিন আছে।'" আরও লিখিয়াছেন, "অসুস্থ শরীর নিয়াও স্ত্রীপুত্রপরিবারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে বাবার শ্রীচরণপার্শ্বে আসিতে পারিয়াছি, ইহাতেই নিজেকে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছি।" ধন্য বই কি!

"রায়সাহেবদিদি" এই অদ্ভুত এবং নিতান্ত ব্যাকরণদুষ্ট পদটির উপরে বোধ করি একটু টীকা দরকার। যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই বাবার শিষ্য এবং শিষ্যা সে স্থলে আশ্রমে কেহ কোনও গুরুভাইয়ের স্ত্রীর উল্লেখ করিতে হইলে ঐরূপ পদপ্রয়োগ করিতেন অর্থাৎ স্বামীর নামের সহিত "দিদি" লাগাইয়া দিতেন এবং তাহা ব্যাকরণদুষ্ট হইলেও গুরুভাইদের কাছে শিষ্টপ্রয়োগ, এমন কি রসাত্মক বাক্য বলিয়া একেবারে খাঁটি কাব্য রূপেই আদৃত হইত। এইরূপে আমাদের গুরুভগিনী প্রকাশদাদার স্ত্রী হইতেছেন প্রকাশদিদি, কেদারদাদার স্ত্রী কেদারদিদি, কালাচাঁদদাদার স্ত্রী কালাচাঁদদিদি, রায়সাহেবদাদার স্ত্রী রায়সাহেবদিদি। স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি মেয়েমহলেও এই রীতিই প্রচলিত।

এইখানে আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের গুরুভাইদের মধ্যে রায়সাহেব উপাধিগ্রস্ত আরও অনেকে ছিলেন এবং পরে আরও অনেকে হইয়াছেন, তথাপি আশ্রমে রায়সাহেব বলিতে বরাবর শ্রীযুক্ত ননীলাল মুখোপাধ্যায়দাদাকেই বুঝাইত। এই পুস্তকের পাঠকেরাও তাহাই বুঝিবেন।

রায়সাহেবদাদা কাশী যাওয়ার পর শ্রীশ্রীবাবার একখানি পত্র পাই। দয়াময় তাহাতে লিখিয়াছিলেন' "অনেকদিন তোমার পত্র পাই নাই। শ্রীমতী বধূমাতা

বালকবালিকারা সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। ক্রিয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, তাহা হইলে সকল বিষয়ে আনন্দ পাইবে। চিন্তা করিবে না।" আমি পত্র না লিখিলেও বাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে ঐ উপদেশপূর্ণ পত্রখানি লিখেন। "ক্রিয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য" রাখিবার উপদেশের বিশেষ প্রয়োজনই ছিল। অস্ত্রোপচারের পর মাসাধিককাল আসন করিয়া বসা সম্ভব ছিল না বলিয়া ঐ সময়ে ক্রিয়া করাই যায় নাই, কোনও প্রকারে জপমাত্র করা হইত। তৎপরও কিছুদিন মানসিক চঞ্চলতার দরুন ক্রিয়াতে শৈথিল্য চলিতেছিল।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত জানকীদাদাদের সঙ্গে আমার ভাবটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে আরও দুইটি পারমার্থিক ভ্রাতার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রথম শ্রীযুক্ত ডাঃ নলিনীমোহন রায়, ইনি কলিকাতা পুলিশ মর্গের (Police Morgue) একজন কর্মচারী, এখন অবসরপ্রাপ্ত; অতি সরলচিত্ত, অমায়িক ও ধীরপ্রকৃতি। ইনি জাতিতে কায়স্থ, এবং শ্রীযুক্ত রজনীদাদার বাল্যবন্ধু; কুলগুরু হইতে দীক্ষিত হওয়ার পর বাবার কৃপালাভ করিয়াছেন। ইঁহার দীক্ষা আমার পরে হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি বাবার পুরাতন শিষ্য, পূর্বে (৫৮ পৃঃ) একবার নাম করা হইয়াছে। ইনিও সরলপ্রকৃতি, এবং আমার প্রতি অতিশয় সদয়। জানকীদাদাদের গৃহেই ইঁহাদের সঙ্গে প্রায় মেলামেশা হইত; অবশ্য বাবা এখানে থাকিলে আশ্রমেও রবিবার প্রাতে ও বৃহস্পতিবার বিকালে দেখা হইত। জানকীদাদাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার পর রবিবারে প্রাতেই আশ্রমে যাইতাম, কেননা তাঁহারাও ঐদিন ঐ সময়ে যাইতেন। ফিরিবার সময় ট্রামে আনন্দ করিতে করিতে ফিরিতাম।

একদিন (১২ই ফাল্গুন ১৩৩৮) রবিবার বিকালে জানকীদাদাদের বাসায় গিয়া শরৎদাদা, নলিনীদাদা, বিজয় বসুদাদা এবং আরও একটি গুরুভাই ডাঃ ফণী মজুমদারদাদাকে পাইলাম। আমাদের অনুরোধে জানকীদাদা তাঁহার "মুক্তি-কাহিনী" হইতে কোনও কোনও অংশ পড়িয়া শুনাইলেন। একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন "আজ বিজয়দাদা বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া বাবাতে ইষ্টমূর্তি দর্শন করেন।" বিজয়দাদা শুনিলেন এবং ঐ উক্তি সমর্থন করিলেন। ধন্য বিজয়দাদা! আর একস্থানে জানকীদাদা লিখিয়াছিলেন, "বাবা আজ বলিলেন সকালে বিকালে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া ক্রিয়া করিলেই চিত্তের ময়লা কাটিয়া যায়।" ভাবিলাম, উপদেশটি শুনিতে তত কঠিন মনে হয় না; কিন্তু করিতে গেলে দেখা যায় অন্য কার্যের তাগিদ এত অধিক থাকে, অথবা নিজেরই ভিতরের প্রতিকূল শক্তি এমন প্রবল হয় যে, ধৈর্য ও প্রসন্নতাসহকারে প্রতিবেলায় "অন্ততঃ আধ ঘণ্টা" ক্রিয়া করাও যেন সহজ হয় না। আমি অবশ্য আমার কথাই বলিতেছি। সকলের এরূপ নাও হইতে পারে।

শ্রীশ্রীবাবা কিংবা শ্রীযুক্ত গোপীনাথের মুখে পূর্বে শুনি নাই, কিন্তু এই দিন "মুক্তিকাহিনী"[১] পাঠ উপলক্ষেই শুনিলাম, কয়েকটি ব্রতনিয়ম আমাদের পালনীয়। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম এবং অবশ্য পালনীয় হইতেছে শিবরাত্রিব্রত। ঐ দিন নির্জল উপবাস ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ (অবশ্য সাধ্য হইলেই) কর্তব্য। আশ্রমে ঐদিন বাবা কাহাকেও পানপ্রসাদও দেন না। রাত্রিতে স্বয়ং অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীচেই থাকেন; তারপর ক্রিয়াতে বসেন। অন্য সময়ে আশ্রমে রাত্রি ৯টার পর কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে, এমন কি সশব্দে দ্বার খুলিতে ও বন্ধ করিতেও পারেন না; করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত হন। শিবরাত্রিতে আশ্রমে নীচে শিষ্যেরা বসিয়া গান করিলে বা জোরে কথাবার্তা বলিয়া বা অন্যপ্রকারে বাবার ক্রিয়ার ব্যাঘাত করিলেও তিনি বিরক্ত হন না। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে তিনি ঠাকুরঘরে গিয়া শিবপূজা করেন, এবং পরদিন যে পর্যন্ত কুমারীভোজন না হয় সে পর্যন্ত জল গ্রহণ করেন না। কুমারী মাতাদের প্রসাদদ্বারাই তাঁহার পারণারম্ভ হয়। তৎপর শিষ্যগণ প্রসাদাদির দ্বারা পারণ করেন।

জন্মাষ্টমী ও মহাষ্টমী ব্রতও পালনীয়। কিন্তু ঐ দুই দিনের উপবাস নির্জল নহে। দ্বিপ্রহরে (কুমারী মাতাদের ভোজনান্তে) রুটি, লুচি, তরকারি ইত্যাদি ভোজন করা যায়; একবেলার অধিক আহার সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। একাদশীর নিয়মও ঐরূপ, তবে উহা সকলের অবশ্যপালনীয় নহে। অম্বুবাচীও পালনীয়। অগ্নিপক্ব সকল দ্রব্য (চিনি গুড় এমন কি কোনও কোনও মসলা, খয়ের চূণ পর্যন্ত) বর্জনীয়। তবে এ ব্রতও একাদশীর ন্যায় অবশ্যপালনীয় নহে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবর্ণের বিধবারা অম্বুবাচীর পূর্বে পাক-করা লুচি ইত্যাদি অম্বুবাচীদিনে ভোজন গর্হিত মনে করেন না; কিন্তু বাবা সে আচারের বিরোধী ছিলেন। আমাদের অঞ্চলের (পূর্ববঙ্গের) বিধবাদিগকে আমরা বাবার অনুমোদিত আচারই চিরকাল পালন করিয়া আসিতে দেখিয়াছি।

এবার জন্মোৎসব উপলক্ষে গাইবার জন্য জানকীদাদা একটি কীর্তন রচনা করিয়াছিলেন, গুরুভাই ৺ইন্দু মুখোপাধ্যায়দাদা (ইনি জানকীদাদাদের পাড়াতেই থাকিতেন, সেদিন সন্ধ্যার দিকে তথায় আসিয়াছিলেন) সেইটি গাহিলেন। জানকীদাদা খোল বাজাইতে পারেন; শুনিলাম খোলসহ শিবরাত্রিতে আশ্রমে যাইতে তিনি বাবা কর্তৃক আহূত হইয়াছেন। গানটি সেখানে গাহিয়া বাবাকে শুনাইবেন মনে করিয়াছেন।

কঠোরকর্মা যোগী হইলেও বাবার অন্তঃকরণটি স্বভাবতঃ অত্যন্ত সরস ছিল। যিনি পূর্ণ, তাঁহাতে অপূর্ণতা কি প্রকারে থাকিবে? তিনি নিজেও অনেক হাসির গল্প বলিতেন এবং অন্যে বলিলে প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন। একদিন রূপনারায়ণ

১. প্রকাশদাদার ভাবসমৃদ্ধ ডায়েরী।

নন্দন লেনের আশ্রমে বাবার সমক্ষে আমাদের বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবপ্রভুদের কোনও কোনও বিষয়ে অযৌক্তিক গোঁড়ামির প্রসঙ্গ হইতেছিল। উঁহাদের কেহ কেহ কালীনাম দুর্গানাম মুখে আনেন না, শক্তিপ্রতিমার দিকে তাকান না, বিল্বপত্র শব্দটিও উচ্চারণ করেন না; ছাগবলির স্মারক বলিয়া তরকারী 'কাটা' বা 'কোটা' না বলিয়া তরকারী 'বানান' বলেন। এ বিষয়ে এক শিষ্য কিরূপ হাস্যকর ভাষায় এক বেলগাছ তলায় আততায়ীর হস্তে তাহার বৈষ্ণব গুরুর খুনের সংবাদ তাহার গুরুর আত্মীয়গণের নিকট বিবৃত করিয়াছিল তাহা আবৃত্তি করিয়া আমাদের এক রসিক গুরুভাই সকলকে হাসাইলেন; বাবাও খুব হাসিলেন। গল্পটা কল্পিত বলিয়াই অবশ্য তাহাতে হাস্যরসের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বৈষ্ণবদিগের ভাবকালির (কৃত্রিম ভাবপ্রবণতার) দৃষ্টান্তরূপে আর এক গুরুভাই বলিলেন, এক বৈষ্ণব একদিন এক গ্রামে আসিয়া ঐ গ্রামের নাম শুনিয়াই 'আহা এই মৃত্তিকায় খোল হয়'—এই বলিয়াই ভাবস্থ হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। এই কথাটি শুনিয়াও বাবা এবং উপস্থিত শিষ্যগণের অনেকে হাসিলেন। এই সময়ে আমারও একটা হাসির গল্প মনে পড়িল। আমরা কৈশোরে সমবয়স্কদের মধ্যে ঐ গল্প বলিয়া কৌতুক করিতাম। বাবা হাস্যরস উপভোগ করিতেছেন দেখিয়া আমি বলিলাম, গল্প আছে একবার এক গোস্বামী প্রভু আকাশে শকুন উড়িতে দেখিয়াই "দশা" (মূর্ছা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দশা কাটিয়া যাইবার পর ভাবমুগ্ধ ভক্তগণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুপাদ বলিলেন, আহা তোমরা কি বুঝিতেছ না যে, শকুন যখন উড়িতেছে তখন নিশ্চয়ই কোথাও গরু মরিয়াছে! আহা, উহার চামড়াতে শ্রীখোল হইয়া কীর্তনে তাহা বাজিলে কি আনন্দই না হইবে! এই বলিয়া 'কি মধুর, কি মধুর' বলিতে বলিতে ভাবাবেশে তিনি পুনরায় দশাপ্রাপ্ত হইলেন। গল্পটি উপস্থিত সকলের কাছেই নূতন, বাবার কাছেও। তিনি "একটা গল্প বটে" এই বলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি অনেকদিন পর্যন্ত কাশীতে, পুরীতে, বর্ধমানে আমার নাম উল্লেখ করিয়া বহুবার বহুলোকের কাছে ঐ গল্পটি বলিয়া নিজেও হাসিয়াছেন এবং শ্রোতাদিগকেও হাসাইয়াছেন। বলা আবশ্যক শ্রীশ্রীবাবাকে বৈষ্ণব ধর্মমতে বা কোনও ধর্মমতেই কোনও দিন অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই, যদিও তিনি যোগপথকেই প্রকৃষ্ট সাধনপথ মনে করিতেন এবং মুখেও বলিতেন। তিনি অনেক শিষ্যকে তাহাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন, এবং অবশ্য তৎসঙ্গে যোগক্রিয়াও দিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবমন্ত্র পাইলে যে কালী দুর্গা নাম রসনাগ্রে আনিতে হইবে না এরূপ গোঁড়ামির প্রশ্রয় তিনি দিতেন না। সে শ্রেণীর গোঁড়াদের সম্পর্কে তিনি বলিতেন, "ইহারা কি দুর্ভাগা,—দুর্গা নামটিও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না!"

সম্মুখে শিবরাত্রি। জানকীদাদাদের বাসায় কথা হইতেছিল। আমি

তৎপূর্বে কয়েকবার শিবরাত্রিতে উপবাস করিয়াছি বটে, কিন্তু বাড়ীতে পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরেই চারি প্রহরের জন্য চারিটি শিবপূজা সমাপন করিয়া গেলে ফলাদি প্রসাদ গ্রহণ করিতাম। দীক্ষার পরেও এক বৎসর তাহাই করিয়াছি; কেননা তখনও জানিতাম না যে, শিবরাত্রি উপলক্ষে নির্জল উপবাসই আমাদের কর্তব্য। এবার তাহা শুনিয়া কৌতুক করিয়া জানকীদাদা রজনীদাদা প্রভৃতিকে বলিলাম, "উপবাস ত করিতেই হইবে; শেষটায় রাত্রি কাটিলে হয়। একবার একটি লোক শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছিল—নির্জল উপবাস। দিনটা যদি কোনও রকমে কাটিল, রাত্রি আর কাটিতে চায় না। তখন তাহার পেটের যে অবস্থা তাহাকে ঠিক ক্ষুধা বলা চলে না; রীতিমত অগ্নিকাণ্ড। কখন প্রভাত হইবে, কখন প্রভাত হইবে এই ভাবনা। সবাই জানে কাক ডাকিলেই রাত্রি প্রভাত হয়; কিন্তু এদিন কাকও বোধ করি ডাকিতে ভুলিয়া গেল। বাড়ীতে একটা বাঁশঝাড়ে কাকের বাসা আছে মনে করিয়া ব্রতীটি আর থাকিতে না পারিয়া সেই ঝাড়ের কাছে গেল এবং কাককে ডাকিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিল; কিন্তু কাকের সাড়া নাই। ইহাতে কাহার না রাগ হয়? সে রাগ করিয়া বাঁশঝাড় ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে বলিল 'শালা কাক, সেই ডাকাই ডাকবি, কেবল আমার প্রাণ থাকতে ডাকবি না।'" উপস্থিত গুরুভাইগণ পূর্বে এ গল্পটি শোনেন নাই বলিয়া খুব হাসিলেন। জানকীদাদারা তিন ভাই এবং নলিনী রায়দাদাও শিবরাত্রি উপলক্ষে কাশী যাইবেন। আমি রজনীদাদাকে বলিলাম, 'বাবা হাসির গল্প শুনিতে ভালবাসেন, গল্পটি তাঁহাকে শুনাইবেন।'

জানকীদাদার হস্তে শিবরাত্রি উপলক্ষে বাবাকে একখানি পত্রও দিলাম। শিবরাত্রি ভগবানের একটা অহৈতুকী কৃপালীলার স্মারক। যে ব্যাধ কৃপা পাইয়াছিল সে ঘোর পাষণ্ড। ঐ জন্মের ত নাই, পূর্বজন্মেরও তাহার কোনও সুকৃতির উল্লেখ ব্রতকথায় নাই। শিবলিঙ্গের মাথায় যে তাহার হস্তপৃষ্ট বিল্বপত্র পড়িয়াছিল, তাহা তাহার স্বেচ্ছাকৃত কার্য নয়, বস্তুতঃ বৃক্ষতলে যে লিঙ্গ আছেন, তাহাও সে অবগত ছিল না। তবুও সে কৃপা পাইল। এই কথাই আমি একটু ফেনাইয়া সেইপত্রে বাবাকে নিবেদন করিয়াছিলাম। অবশ্য কৃপাপ্রার্থনা করিতে ভুলি নাই। কর্মের প্রয়োজনও অস্বীকার করি নাই। তিনি কৃপা করিয়া কর্ম না করাইয়া নিলে, এই দুষ্প্রবৃত্তিকলুষ চিত্তে কর্মে অনুরক্তি আসিতে পারে না এই কথা লিখিয়াছিলাম।

জানকীদাদা কাশীতে পৌঁছিয়া আমার চিঠিখানি বাবার হাতে দেন। একঘর লোক উপস্থিত; তাহাদের সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিয়া চিঠিখানি বাবা আগাগোড়া মনযোগসহকারে পাঠ করেন। নলিনীদাদার মুখে পরে শুনিতে পাই, কৃপাসম্বন্ধে বাবার মুখ হইতে কিছু আশ্বাসবাক্য বাহির করা যাইতে পারে কি না, সেই চেষ্টায় জানকীদাদা ওকালতী চালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা, অক্ষয়দাদা কেমন

চিঠি লিখেছেন।' বাবা চিঠিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "বেশ চিঠি! কাগজও ভাল, খামটিও বেশ!" জানকীদাদার ওকালতী বুদ্ধি কাজে লাগিল না!

২১শে ফাল্গুন শিবরাত্রি ছিল। জানকীদাদারা ২৩শে ফাল্গুন ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীশ্রীবাবা ২৫শে ফাল্গুন তারিখে কলিকাতায় পৌঁছেন। জানকীদাদাদের মুখে শুনিয়াছিলাম শিবরাত্রিতে প্রায় কুড়িটি শিষ্য বাহির হইতে কাশীতে গিয়াছিলেন, কাশীস্থ শিষ্যেরাও অনেকে আশ্রমে আসিয়া রাত্রিজাগরণ করিয়াছিলেন। বাবা রাত্রি ৮টায় একবার এবং ভোরে আর একবার ঠাকুর-মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করেন; সকাল ও রাত্রির পূজা সারিয়া নীচের বসিবার ঘরে বসিয়া রাত্রি এগারটা পর্যন্ত শিষ্যগণসহ আনন্দ করেন; তৎপর গিয়া ক্রিয়ায় বসেন এবং সমস্ত রাত্রি ক্রিয়াতেই লিপ্ত ছিলেন। জানকীদাদারা রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত কীর্তন করিয়াছিলেন। জানকীদাদার রচিত কীর্তনটি বাবার ভাল লাগিয়াছিল। জানকীদাদার রচনা সার্থক। কীর্তনান্তে গোপীনাথ কিয়ৎকাল যোগতত্ত্বাদি ব্যাখ্যা করেন।

রজনীদাদা বাবাকে আমার মুখে শ্রুত শিবরাত্রির উপবাসের গল্পটি শুনাইয়াছিলেন। বাবা খুব হাসিয়াছিলেন; তারপর নিজেও অনেককে ঐ গল্পটি বলিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে এ অধমের নাম বহুবার তাঁহার শ্রীমুখে উচ্চারিত হইয়াছিল শুনিয়া আমি আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম।

জানকীদাদার মুখে ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, শিবরাত্রির দিন বিকালে বাবা একটু ধুনার ছাই হাতে তুলিয়া লইয়া তাহা জ্বলন্ত ধুপে পরিণত করেন এবং বলেন যদি কুমারী খাওয়াও তবে এই ধুপখণ্ড তোমরা যত বড় করিতে বলিবে তত বড় করিয়া দিব।

বাবার কলিকাতায় আগমনের দিন (২৫শে ফাল্গুন ১৩৩৮ সাল) ভোর রাত্রিতে আহ্নিক সারিয়া ৬টায় হাবড়া ষ্টেশনে যাই। বাবা গাড়ী হইতে প্লাটফর্মে পদার্পণ করিয়া আমাকে দেখিয়া বলেন, "কি গো, ভাল ত?" আমি 'আজ্ঞে হাঁ, বাবা' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশদাদা গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "মশায়, আমরা গাছ নাড়া দিয়ে কাকডাকানো উপোস করি নি!"

আমি। উপবাসের এরূপ একটা ভাল কৌশল শিখিয়ে দিলাম, তবু আপনারা সেটা কাজে লাগালেন না?

বাবা। ওরা গাছ নাড়া দিয়েছিল, কাক ডাকলে না!

আশ্রমে শিবরাত্রির পারণের দিন কুমারীভোজনাদির জন্য বিলম্ব অনেকেরই প্রায় অসহ্য বোধ হয়। বোধ করি বাবা ঐ প্রকারে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া একদিন জানকীদাদা আমাকে তাঁহার

"মুক্তিকাহিনী" হইতে সেদিনের লিখিত কথাটুকু পড়িয়া শুনান। বাবা অনেক সময়েই কর্মের প্রশংসাপ্রসঙ্গে "কর্মেভ্যো নমঃ" এই কথাটি বলিতেন। সেদিন জানকীদাদা বাবার কথারূপে নয়, নিজেরই ভাবের উচ্ছ্বাসবশে লিখিয়াছেন, "কর্মেভ্যো নমঃ, কর্মেভ্যো নমঃ।" শুনিয়া আমি বলি, জানকীদা', ঐ কর্মেভ্যো নমঃ কথাটির উপরে লিখিয়া রাখুন শ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ। কর্ম বাবা আমাদিগকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা অবশ্য করিব ; কিন্তু কর্মে আমাদের ভরসা কম, কৃপাই আমাদের ভরসা পরদিন ২৮শে ফাল্গুন (জন্মোৎসবের পূর্বদিন) বিকালে জানকীদাদা যখন বাবাকে প্রণাম করিতে যান, তখন হলঘরটিতে বহুলোক সমবেত হইয়াছেন। জানকীদাদা বাবাকে প্রণাম করিয়া একটু দূরে বসেন। কিছুক্ষণ পরে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, 'জানকী কোথা গো ?' পরে তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, "এই দিকে(অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণের সন্নিকটে) এসে বস ” জানকীদাদা উঠিয়া তাঁহার কাছে গেলে বাবা বলেন, 'জানকী, কর্মেভ্যো নমঃ,— তাই নয় কি ?"

জানকী। হাঁ বাবা ; শ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ এইটি প্রধান করিয়া পরে কর্মেভ্যো নমঃ।

বাবা। হাঁ তাই।

ইহার কিছুক্ষণ পরে আমি শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণদর্শন করিতে গেলে বাবা আমাকে পানপ্রসাদ দিয়া বলেন, "জানকী কোথা গেল ?" জানকীদাদা ঐ মুহূর্তে ওখানে ছিলেন না, নীচে গিয়াছিলেন। বাবা খুঁজিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া তিনি বাবার কাছে আসিলে, আমাকে দেখাইয়া বাবা তাঁহাকে বলেন, "তোমরা দু'জন কাছাকাছি ব'স, তারপর যুক্তি করে কথা বল।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে দয়াময় নরেনদাদার দিকে তাকাইয়া একটু নিম্নস্বরে বলেন, "ওরা জিততে পারবে না ; কেন না ওটা ওদের মুখের কথা কি না ?" এই কথাটি আমার কানে আসে নাই। তা'ছাড়া তৎপূর্বে জানকীদাদার সঙ্গে যে কথা হইয়াছে তাহা তখনও আমার গোচরে আসে নাই। জানকীদাদা শুধু আমাকে এইটুকু বলিয়াছিলেন, 'আপনি আর একটু আগে এলে ভাল হত ; আমাদের জোর হত।' বুঝিলাম, কৃপা ও কর্ম সম্বন্ধেই বাবার সঙ্গে দাদাদের কথাবার্তা হইতেছিল। আমি বাবাকে বলিলাম, 'বাবা, এখানে যে সকল কথাবার্তা হয়, জানকীদাদা বাড়ী গিয়া সে সকল একখানি খাতায় লিখিয়া রাখেন।' আমার উদ্দেশ্য ছিল, ঐরূপ ভূমিকা করিয়া আমি সেদিনের সেই কর্মেভ্যো নমঃ ও শ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ এই প্রসঙ্গটা তুলিব। কিন্তু রসিকরাজ তাহা করিতে দিলেন না, বলিলেন, "ও ওর মাথা আর মুণ্ডু লিখে রাখে।" বাবার কথায় উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন, আমার বক্তব্য সেই হাসির স্রোতে দূরে ভাসিয়া গেল। মনে হইল বাবা ইচ্ছা করিয়াই কৃপার প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। তারপর যখন তৎপূর্বে বাবা নরেনদা'র

দিকে তাকাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিলাম, তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

সেদিন বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ডায়েরীতে লিখিলাম,—সত্যই ত গুরুদেব, কৃপার কি বুঝি? ওটা মুখের কথা বই আর কি? কৃপা কি যথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়াছি? কর্ম করিতে করিতে কৃপার উপলব্ধি আসে। কৃপার উপর নির্ভর করিয়া ক্রিয়ার দিকের রশিটা একটু আলগা করিয়া দেওয়ার প্রবৃত্তিটা আমাদের মত নিম্ন অধিকারীর পক্ষে স্বাভাবিক, তাই বাবা কৃপাকে কখনও প্রধান স্থান দেন না। সুচতুর কাণ্ডারী জানেন ক্রিয়ার রাশিটা টানিয়া ধরিলেই আমাদের জীবনতরীর পালে হাওয়া লাগিবে, তাতে তরীটা চলিবে ভাল। নচেৎ প্রবৃত্তির প্রবল স্রোত ঠেলিয়া উজান চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাবা বলেন, "কৃপা ত আছেই রে, বাপু, কর্ম কর, কর্ম কর।" এদিকে আমরা দেখি, আমাদের কর্মের স্বাধীনতা কোথায়? আমরা ত সংস্কারের—রিপুর—শয়তানের—দাস। কর্ম করিতে বসিলে সেই শয়তান নানারূপে দেহ বা চিত্তকে অধিকার করিয়া কর্ম পণ্ড করিয়া দেয়; তখন যাহা করা হয় সেটা ত ক্রিয়া নয়, ক্রিয়ার ভাণমাত্র। কৃপা ভিন্ন আমাদের গতি কি? গুরু কৃপা করিয়া আমাদিগকে দিয়া যতটুকু ক্রিয়া করাইয়া নিবেন ততটুকুই আমরা করিতে পারিব।

তার পরে লিখিলাম, আচ্ছা কি আশ্চর্য মহাপুরুষ আমাদের বাবা। যদি শিষ্যদের চিত্তরঞ্জন করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়ান তাঁহার ইষ্ট হইত, তাহা হইলে আমাদের 'গুরু কৃপাই একমাত্র ভরসা, গুরুকৃপা হি কেবলম্' ইত্যাদিরূপ স্তুতিবাক্যে অনরবত সায় দিয়া চলিতেন; বলিতেন, 'আমার উপর নির্ভর কর, আমি ত তোদের ও ভগবানের মধ্যবর্তী হইয়াই আছি।' কিন্তু সেটি হইবার নয়। আমাদের প্রকৃত কল্যাণই বাবার ইষ্ট, নিজের পসার নয়, তাই কেবলই বলেন, কর্ম কর, কর্ম কর, কর্মেভ্যো নমঃ। যেন একেবারে মীমাংসাদর্শনের অনুগামী কর্মী। মীমাংসকেরা ভগবান্ পর্যন্ত মানেন না, কর্মই তাঁহাদের সব।

আচ্ছা, তাহা হইলে গুরুতে নির্ভর কি কিছুই নয়? নয় কেন? নির্ভরই সব, প্রকৃত নির্ভর কি আমাদের পাপদুষ্ট হৃদয়ে আসিতে পারে? নির্ভরের উপায়রূপেই ক্রিয়ার আশ্রয় দরকার। বাবারও কথার মর্ম তাহাই, ইহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি।

যথাস্থানে লিখিতে ভুলিয়াছি—গত পূজার সময় কাশীর আশ্রমে একদিন বাবা বলিতেছিলেন, "ভাবছি, কোথায় (কোন তীর্থস্থানে) যাই? নূতন স্থান ত দেখতে পাই না।" পরিব্রাজকভাবে বাবাকে সকল তীর্থই দর্শন করিতে হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে নূতন স্থান আর কি থাকিতে পারে? আর তিনি যে কেবল স্থূলদেহেই পরিব্রজন করিয়াছেন তাহা নহে, প্রকৃত পরিব্রাজকের যাহা কর্তব্য, অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ তাহাও তাঁহার বাকি নাই। সে যাহা হউক,

তাঁহার কথার উপরে আমি বলিলাম, "বাবা, আপনার পক্ষে নূতন স্থান আর কি আছে? আমাদের (আমার বলিতে সাহসে কুলাইল না) হৃদয়ে আসুন, এখানে আপনার অদ্যাপি আসা হয় নাই।" বাবা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "বড্ড ড্যামেজ।" বিজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না, আমি যাহা বাবাকে বলিয়াছিলাম সেটা একেবারেই একটা কেতাবী কথা*। কিন্তু বাবার বাক্‌চাতুর্য আশা করি সকলেই মুগ্ধ করিবে। উত্তরটি মৌলিক ত বটেই, তদুপরি কঠোর সত্যদ্যোতক।

বার

বাঙ্গালা সন ১৩৩৮ সালের কথাই চলিতেছে। ২৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব। এবার স্ত্রী-পুত্র কন্যাদি সহ উৎসবে গিয়াছিলাম এবং সকলেই শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি এবং প্রণামীরূপেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম। যোগেশদাদার সহিত পরিচয় ছিল না বলিয়া পূর্ব বৎসর চাঁদা বাবদ যাহা দিয়াছিলাম তাহা রায়সাহেব দাদার হস্তেই দিয়াছিলাম। এবারকার চাঁদা যোগেশদাদার হস্তেই দিলাম। যোগেশদাদা বলিলেন, 'এ পর্যন্ত সাড়ে তেরশত লোক খাইয়াছে। এখনও শ'খানেক লোক খাইতে বাকি আছে।' তাহা হইলে পূর্ব বৎসর ভুক্তব্যক্তিগণের সংখ্যা আমি যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম (১০৬ পৃঃ) তাহা নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ ও অল্পমাত্র। এবারের উৎসবও যোগেশদাদার গৃহেই হইয়াছিল। সকল ব্যবস্থাই পূর্ব বৎসরের অনুরূপ ও সর্বাঙ্গসুন্দর। আমার স্ত্রী, পুত্রগণ ও কন্যা উৎসবে যোগদান করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইয়াছিল—এ শ্রেণীর অভিজ্ঞতা তাহাদের সকলের পক্ষেই নূতন। পুষ্পাঞ্জলিদানের সময় শ্রীশ্রীবাবা স্মিতোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমাকে সংবর্ধিত করায় আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

ঐ দিন প্রসাদ পাইতে বসিয়া শুনিতে পাই—শ্রীযুক্ত যোগেশদাদার অনুরোধে বাবা ফোকাস্ করিয়া ভোর রাত্রিতে অল্পবৃষ্টি নামাইয়াছিলেন। পরে অনুসন্ধানে এই ঘটনার যে বিবরণ পাই তাহা এইরূপ—শীতের পর এ পর্যন্ত একদিনও বৃষ্টি

* এক ভক্তকবি শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

রত্নাকর স্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
দেয়াং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীরবামনয়নাহৃতমানসায়
দত্তং মনো যদুপতে তদিদং গৃহাণ।

হে যদুনাথ, তোমার গৃহ রত্নাকর- আর লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী; তুমি নিজে পুরুষোত্তম; তোমাকে দেওয়ার! যোগ্য বস্তু কি আছে? তবে, বামনয়না গোপরমণীগণ (কটাক্ষপাত দ্বারা) তোমার মনটি হরণ করিয়া নিয়াছে, তাই আমার এই মনটি তোমাকে দিলাম, এইটি তুমি গ্রহণ কর।

না হওয়ায় এই সময়ে খুব গরম পড়িয়াছিল। বেলা আটটায়ই সূর্যের তাপ অসহ্যপ্রায় হইয়া উঠিত, সেই জন্যই ২৮শে ফাল্গুন রাত্রিতে বাবার সমক্ষে যোগেশদাদা বলেন, 'কাল সকালে সামিয়ানাগুলি পিচকারী দিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে, নচেৎ ভোজনকালে কুমারীমাতাদিগের কষ্ট হইবে।'

যোগেশদাদার এই কথায় বাবা বলিলেন, "কুমারী খাওয়াও ত শুধু সামিয়ানা ভিজান কেন, বেশ একপশলা বৃষ্টিই করে দেওয়া যায়।"

যোগেশদা। বেশী বৃষ্টিতে আবার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হবে।

বাবা। তা' জগদম্বা ইচ্ছা করলে অল্প বৃষ্টিও হতে পারে।

তারপর আর কুমারী ভোজনের সর্ত না করিয়াই বাবা নিজের খেয়াল বশে ফোকাস্ করিয়া রাখেন এবং তাহা সকলকে বলেনও। শেষ রাত্রিতে ভবানীপুরে (উত্তর কলিকাতায় নয়) এক পশলা পাতলা বৃষ্টি হয়। উহার পরে বহুদিন মধ্যে ভবানীপুরে বা কলিকাতার অন্য কোনও স্থলে একবিন্দু বর্ষণও হয় নাই।

৫ই চৈত্র শ্রীশ্রীবাবার জ্যেষ্ঠ পৌত্র সরোজমোহন ('গুঁইরাম') বাবাজীর উপনয়নসংস্কারের দিন ছিল। তদুপলক্ষে ২রা চৈত্র তারিখেই বাবা বর্ধমান চলিয়া যান। আমি উপনয়নের দিন সকালের একটি লোকাল ট্রেনে বর্ধমান যাই এবং গাড়ীতে জানকীদাদা, রজনীদাদা, নরেনদাদা, শরৎদাদা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গ পাইবার সৌভাগ্য হওয়ায় সমস্ত পথটাই পরমানন্দে যাওয়া গিয়াছিল। সমস্ত দিনটাই খুব আনন্দে কাটে। নানাস্থান হইতে শ্রীশ্রীবাবার বহু শিষ্য বর্ধমান আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। কাশী হইতে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। পূজনীয় দুর্গাদাদা ঘটা করিয়াই কুমারীভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমারীসেবা আমাদের আশ্রমে পৌঁছিবার পূর্বেই সম্পন্ন হয়। দুর্গাদাদার পরিদর্শনে অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হয় নাই। শ্রীশ্রীবাবা স্নিগ্ধ মধুর হাস্য সংবলিত দুই-চারিটি কথায় প্রত্যেক শিষ্যকে আপ্যায়িত করেন, এবং কুমারীর প্রসাদ পাওয়া হইয়াছে কি না, জলযোগ হইয়াছে কি না ইত্যাদিরূপ অনুসন্ধান প্রত্যেকের সম্বন্ধে করিয়া হৃদয়ের অসীম ভালবাসার পরিচয় দেন। পুরাতন শিষ্যদিগের ত কথাই নাই, আমাদের মত নূতন শিষ্যেরাও ঐ দিন দেখিয়াছিলেন, পরমহংস শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামী লৌকিক আচারেও একজন আদর্শ পুরুষ।

বর্ধমান হইতে শ্রীশ্রীবাবা ১৩ই চৈত্র তারিখে প্রাতে বণ্ডুল গমন করেন। এটা ছিল ইষ্টারের ছুটির সময়। সেইজন্য কলিকাতা ও অন্যস্থান হইতেও অনেক শিষ্য বাবার অনুগামী হইতে পারিয়াছিলেন। জানকীদাদারা, সপুত্র যোগেশদাদা, রায় সাহেবদাদা, কুঞ্জ ঘোষদাদা, দুর্গাকান্ত রায়দাদা প্রভৃতি বড় ছোট অনেকেই গিয়াছিলেন। মোটর গাড়ীতে চড়িলে আমার মাথা ঘোরে ও বমি হয় বলিয়া আমার পক্ষে বণ্ডুল যাওয়া কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। বিলাসীপাড়ার শ্রীযুক্ত

নৃপেন্দ্র চৌধুরীদাদা বগুলে বাবার বাসের অসুবিধা অবগত হইয়া তথায় একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাবা সেই আশ্রমে প্রবেশ করেন। তদুপলক্ষে কুমারীভোজন ব্রাহ্মণভোজনাদি সবই হয়। নৃপেনদাদাই সমস্ত ব্যয় বহন করেন। শুনিয়াছি আশ্রমনির্মাণে দাদার ব্যয় প্রায় চল্লিশহাজার টাকার মত হইয়াছিল। আমাদের এক গুরুভাই কণ্ট্রাকটার নির্মাণ কার্যটি করিয়াছিলেন; তত্বাবধান করিয়াছিলেন কুঞ্জ ঘোষদাদা ও দুর্গাকান্ত রায়দাদা—কখনও একক, কখনও মিলিতভাবে। কুঞ্জদাদা ইতঃপূর্বেই কটকের ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারের পদ হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিপত্নীক ও অপুত্রক ছিলেন। চাকরী হইতে অবসর লইয়া এই সময়ে তিনি দুর্গাকান্তদাদার ন্যায় বাবার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন; কেবল বাবার কলিকাতায় অবস্থিতিকালে হাবড়াতে স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র ডাঃ ননীলাল ঘোষের বাসায় থাকিতেন। রায়সাহেবও কলিকাতায় স্বগৃহে থাকিতেন, কিন্তু আশ্রমের সব কার্য দেখিতেন। দুর্গাকান্তদাদা কলিকাতায়ও আশ্রমেই থাকিতেন, যদিও তাঁহার পুত্রেরা কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন এবং পত্নীও বর্তমান ছিলেন।

আশ্রমনির্মাণে নৃপেন্দ্র চৌধুরীদাদার ব্যয় কিছু অনুচিতরূপেই বেশী পড়িয়াছিল শুনিয়াছি। সে যাহা হউক, অর্থশালী হইলেও যুবকবয়সে গুরুর আরামকামনায় একযোগে এত অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়। পূর্বজন্মের সুসংস্কার না থাকিলে এরূপ প্রেরণা কাহারও আসিতে পারে আমার এরূপ মনে হয় না। বড়ঘরে জন্ম এবং সদ্বৃত্তি উভয়ই বিশিষ্টরূপ সুকৃতির পরিচায়ক তাহাতেও সন্দেহ নাই।

বগুলেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য বাবা অনেক সময়েই কথাপ্রসঙ্গে কীর্তন করিতেন। ঐ বাণলিঙ্গটি (নাম—"হরহরি") পূর্বে জ্ঞানগঞ্জে ছিলেন। শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস বাবার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ঐটি তাঁহাকে দান করেন। শুনিয়াছি জ্ঞানগঞ্জের অন্য পরমহংসগণ আশ্রম হইতে ঐ বিপুলমাহাত্ম্যশালী জ্যোতির্লিঙ্গটির অপসারণের বিরোধী ছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যেঠা গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি মহাতপার অনুমতিক্রমে বাবাকে উহা লইয়া আসিতে দেন। তাঁহারই আদেশে ঐ লিঙ্গের জন্য বগুলে মন্দির নির্মিত হয়। বগুলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানকীদাদা আমাকে বলেন যে, ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরদেশ অতি স্নিগ্ধ ও আরামজনক। বাবার মুখে পূর্বেই শুনিয়াছিলাম দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিঙ্গের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। জানকীদাদা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন—প্রাতে লিঙ্গের বর্ণ খয়ের গোলার মত দেখায়, পরে বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে রক্তিমা দেখা দেয়। সন্ধ্যায় লিঙ্গ উজ্জল শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন।

২৯শে চৈত্র বিকালে শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আমি এবং অন্যান্য অনেক গুরুভাই ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। ২১শে বারুণী স্নান ছিল। ষ্টেশনে

কেদার ভৌমিকদাদা বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, বাবা কি কাল গঙ্গাস্নান করিবেন ?

বাবা। সেই জন্যই ত এলাম।

শুনিয়া আমি বাবার সঙ্গে গঙ্গাস্নানের সঙ্কল্প করিলাম। তৎপূর্ব বৎসর বারুণীস্নানে (৩রা চৈত্র, ১৩৩৭) বাবা শিষ্যদিগকে একটি কৌতুক প্রদর্শন করেন। উহার বিবরণ ইতিমধ্যে আমি জানকীদাদার ও রজনী দাদার মুখে শুনিয়াছিলাম *। যদিও তৎপূর্বেই আমার দীক্ষা হইয়াছিল তথাপি তৎকালপর্যন্ত আমি বাবার কাছে অধিক যাতায়াত করিতে পারি নাই এবং গুরুভ্রাতাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। সেইজন্য বাবা যে শিষ্যগণসমভিব্যাহারে বারুণীস্নান করিবেন এ সংবাদ যথাকালে আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এইরূপ :—বারুণীস্নানান্তে দেখা গেল শ্রীশ্রীবাবার যোগিয়া রঙে ছোপান বস্ত্র একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সকলেই মনে করিলেন রঙ্‌টা একেবারে কাঁচা ছিল ; বাবা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "রঙ ত সবই কাঁচা, কি বল গো ?" যাহা হউক বাবা বস্ত্র ত্যাগ করিলে ডাঃ ফণী মজুমদারদাদা উহা ধুইবার জন্য গঙ্গায় গিয়া দেখিলেন বস্ত্রের যে যে অংশ কোঁচা বা কাছারূপে ভাঁজ করা ছিল, সে অংশের রঙ্ তখনও আছে। ফণীদাদা ঐ রঙ্‌টুকু উঠাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেও উহা উঠিল না। তখন তিনি বস্ত্রখানি আনিয়া ঐ অংশগুলি বাবাকে দেখাইলে বাবা পা ধুইবার জলের ঘটি হইতে একটু জল লইয়া সেই সকল স্থান ফণীদাদাকে রগড়াইতে বলিলেন। উহা করিবামাত্র রঙ্ সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া গেল। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং বাবা হাসিতে লাগিলেন।

এবার বাবার সঙ্গে যখন বারুণীস্নান করি তখন বাবা শিষ্যদের আগ্রহে প্রত্যেকের হাত হইতে দুই-একটি কাঁচা আম ও কিছু পুষ্প নিয়া গঙ্গায় দেন এবং অবগাহনান্তে গঙ্গায় দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ জপ করেন। বাবা জপের আদিতে ও মধ্যেও একবার আচমন করায় আমার ধারণা হইয়াছিল তিনি প্রথমে গায়ত্রীজপ করিয়া স্বীয় ইষ্টমন্ত্রজপ করিলেন। দেখাদেখি আমিও তাহাই করিলাম। স্নানান্তে বাবা অরুণ বসুর হস্তদ্বারা ভিখারীদিগকে দুই-তিনটাকার আধলা দান করিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে বেড়াইতে আসিয়া এই ঘাটে (বাবুরঘাটে) যত ভিখারী থাকিত সকলকেই এক একটি আধলা দান করিতেন। এদিন শিষ্যগণ সকলেই কিছু কিছু দান করিলেন। তারপর বাবা মোটরে আশ্রমে গেলেন, আমি গুরুভাইদের সঙ্গে ট্রামে তাঁহার অনুবর্তী হইলাম। আশ্রমে কুমারীভোজন হইয়াছিল। আমরা কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া এবং বাবার চরণপ্রান্তে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বেলা প্রায় ১২ টায় যে যাহার বাসায় ফিরিয়া আসি।

* পরে "বিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গে" ৫ম খণ্ডে তিন ভ্রাতাই উহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

একদিন আমি যখন বাবার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছি, ঐসময়ে তিনি কোনও একটি শিষ্যের আনীত কতকগুলি ফুল হইতে একটি অপরাজিতা, একটি লাল রঙের ও দুইটি হলুদ রঙের কোনও ফুল লইয়া (এই ফুলগুলির নাম আমার অজ্ঞাত) স্বীয় অঙ্গুলিদ্বারা একসঙ্গে টিপিতে টিপিতে একটি লবঙ্গাকৃতি কলিতে পরিণত করেন। আমি ঐটির প্রতি জানকীদাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাবা উহা আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখান। তারপর তিনি উহা নিজ নাকের কাছে নিয়া অনবরত আঘ্রাণ করিতে থাকেন। তিন-চারি মিনিট পরে দেখা গেল উহা একটি জবার কলির আকার প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু স্থলে স্থলে অপরাজিতার মত বেগুনী রঙের ছিটাও আছে। বাবা বলিলেন, "যদি কুমারী খাওয়াও তবে এটাকে খুব বৃহদাকার একটা ফুলে পরিণত করি।" কিন্তু সে বিষয়ে কোনও শিষ্যের বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়া টিপিয়া টিপিয়া উহাকে আবার ছোট করিয়া ফেলিলেন এবং একটু বেগে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কোনও দ্রব্যে অন্য দ্রব্যের পরমাণুর অনুপ্রবেশ (১২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) করাইয়া সেই পরমাণুগুলিকে পুনরায় বিক্ষিপ্ত করিতে হইলে বাবা দ্রব্যটিকে একটু বেগে ছুঁড়িয়া ফেলিতেন—ইহা পরে শুনিয়াছি এবং নিজেও লক্ষ্য করিয়াছি। আধলাকে গিনি করিয়া তাহাকে পুনরায় আধলা করিতে ঐরূপ একটু বেগে ছুঁড়িয়া ফেলা হইত।

উক্ত ব্যাপারের পরে কোনও শিষ্য বারুণীস্নানের উপকারিতার বিষয় উত্থাপন করিলে বাবা বলেন, বারুণী, গ্রহণ ইত্যাদি যত স্নানযোগ আছে, সেই সকল যোগে গঙ্গার জলে বিশেষ বিশেষ শক্তিমান্ পরমাণুর বিকাশ হয়; ইহা বিজ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখান যায়। ঐ সময়ে স্নান করিলে তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার তেজ একটু মন্দীভূত করিয়া সুষুম্নার তেজকে প্রবল সুবিধা করিয়া দেয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতে থাকিলে সুষুম্নার ক্রিয়া খুব ভাল হইতে থাকে।

বারুণীস্নানের দুইদিন পরে অর্থাৎ ২৩শে চৈত্র (১৩৩৮) মঙ্গলবার রজনীদাদা আলিপুর কোর্টে যাওয়ার পথে আশ্রমে বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে যোগেশদাদা বাবাকে বলেন, 'কাল আপনি অরুণকে কি দেখাইলেন? আমাদের ভাগ্যে তাহা দেখা হইল না।' "ও আর একটা কি," এই কথাটুকু মাত্র বলিয়া বাবা নিজ ক্রিয়ার ঘরের দিকে গেলেন। ঐ সময়ে যোগেশদাদা রজনীদাদাকে বলেন, 'বাবা কাল অরুণকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন!' পরে অরুণ [বসু]দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া রজনীদাদা জানিতে পান—সোমবার সন্ধ্যার পর আহ্নিকের অন্তে তিনি যখন বাবাকে প্রণাম করিতে আসেন, তখন বাবা স্বীয় অভ্যাস অনুসারে শয়ান ছিলেন; ঘরে কোনও দীপ ছিল না, কিন্তু বাহিরে দীপ (electric light) জ্বলিতেছিল, উহার আভা খানিকটা ঘরের ভিতরেও ছিল। প্রণামান্তে সেই ক্ষীণ আলোকে অরুণ যখন বাবার দিকে তাকাইলেন, তখন বাবাকে না দেখিয়া তৎস্থলে বৃক্ষলতাদিমণ্ডিত একটা

পাহাড়ের মত কিছু দেখিলেন। ঐ দৃশ্য অল্পক্ষণই ছিল। উহা অন্তর্হিত হইলে তিনি বাবাকে ঐ দর্শনের বিষয় নিবেদন করিলে বাবা শুধু বলেন, "কেমন, দেখতে ভাল লাগ্‌ল ত ?"

যোগেশদাদা এই ব্যাপারটিকে বিশ্বরূপদর্শন এই আখ্যা দিয়াছিলেন। তাহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার পূর্বে শ্রীশ্রীবাবা একবার সত্যসত্যই এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে বিশ্বরূপের মতই কিছু দেখাইয়াছিলেন। আমি উহার বিবরণ শ্রীযুক্ত গোপীনাথের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা এইরূপ—

একদিন পুরীতে শ্রীশ্রীবাবা বিকালে আশ্রমে বসিয়া ছিলেন ; (গোপীনাথ তখন পুরী আশ্রমেই উপস্থিত ছিলেন) এমন সময় পুরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র তাঁহার দর্শনার্থ আসেন। তিনি মধ্যে মধ্যেই আসিতেন। এ দিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বদেহে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন এই বিষয়টা মানুষের ধারণার অতীত। সার্ধত্রিহস্তপরিমিত স্থানে কি প্রকারে বর্ণিতরূপ বিশাল বিশাল দৃশ্য সকল দেখান সম্ভব ? বাবা বলেন, "সাড়ে তিন হাত স্থানের কথা কি ? ভাগবতে পড় নাই কি শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিয়া মুখগহ্বরমধ্যেই যশোদাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন ? নরদেহে মুখগহ্বর কতটুকু স্থান ?"

মিশ্র। হাঁ, ঐ ব্যাপারটাই ত আমরা বুঝি না।

বাবা। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের কথা শুনিয়াছ কি ?

মিশ্র। শুনিয়াছি, কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব তাহা বুঝি নাই।

সদাশিব মিশ্র উত্তম অধিকারী ছিলেন বলিয়াই হউক, বা কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবাবার চিত্তে প্রসন্নতা আসায় দরুনই হউক, কিংবা হঠাৎ তাঁহার ঐরূপ খেয়াল জাগিয়া উঠাতেই হউক, তিনি স্বীয় মুখ ব্যাদান করিয়া সদাশিব মিশ্রকে বলিলেন, "দেখ দেখি, মুখে কি আছে ?"

মিশ্র। (নিরীক্ষণ করিয়া) কই বিশেষ কিছুই ত দেখিতেছি না।

বাবা বলিলেন, "ভাল করে দেখ।" বাবা বলিলেন লিখিলাম, কিন্তু বস্তুত বাবা তখন মুখব্যাদান করিয়াই ছিলেন, অথচ সদাশিব মিশ্র কানে পুনঃপুনঃ শুনিতে লাগিলেন তিনিই বলিতেছেন, "ভাল করে দেখ।" হঠাৎ ভাগ্যবান্ পণ্ডিত মহাশয়ের দৃষ্টি খুলিয়া গেল। গীতায় যে ভগবান্ বলিয়াছেন "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ" (অর্জুন, তোমাকে দিব্যচক্ষুঃ দিতেছি) মিশ্রেরও সেই অবস্থা আসিল। মিশ্র দেখিলেন, বাবার মুখের মধ্যে উত্তাল লহরলীলাসমন্বিত সুবিশাল সমুদ্র—পারাপার লক্ষ্য হয় না। হঠাৎ যেন পটপরিবর্তন হইল, মিশ্র দেখিলেন বৃক্ষলতা-সমন্বিত বিশাল উচ্চশৃঙ্গ পর্বত। পট পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ক্রমে কৃষিক্ষেত্র, প্রান্তর বন, নগর, কত দিব্য দিব্য লোক, সেখানে কত দিব্য দিব্য দৃশ্য মিশ্রের নয়নগোচর

...হইল। তখনও তিনি কানে শুনিতেছেন, "ভাল করে দেখ।" তথায় উপস্থিত ...ন্য কোনও ব্যক্তি কিন্তু তাহা শুনিতেছেন না; তাঁহারা শুধু দেখিতেছেন সদাশিব মিশ্র বিহ্বলনেত্রে বাবার ব্যাত্ত মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। প্রায় ১৫ মিনিট কাল মিশ্রের এইরূপ অপূর্ব দর্শন চলিল। তখন বাবা মুখ বন্ধ করিলেন, ...শ্রেরও বহির্দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল।

বাবা বলিলেন, "দেখিলে স্বল্পস্থানেও বিশালদৃশ্য দেখা যায় কি না?"

মিশ্র। হাঁ বাবা দেখিয়াছি এবং পরম কৃতার্থ হইয়াছি।

এই বলিয়া তিনি বাবার চরণে প্রণত হইলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে নিজের ...র্শনের বিষয় সব বলিলেন।*

যোগেশদাদা সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন কিনা শুনি নাই, তবে তিনি ঐ ...টনার বিবরণ নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। অরুণ বসুর দর্শনটিও তিনি সদাশিব ...শ্রের দর্শনজাতীয় মনে করিয়া থাকিবেন এবং সেইজন্য রজনী দাদাকে সেইরূপ ...লিয়াছিলেন।

বাগবাজার অঞ্চলের একটি কায়স্থ ভদ্রলোক (নাম প্রকাশ করিলাম না; ...পাধি—ঘোষ) এই সময়ে একদিন স্ত্রী ও অনূঢ়া যুবতী কন্যা সহ বাবার সহিত ...ক্ষাৎ করিতে আসিয়া নিজ পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। বাবা প্রথমে ...লেন, "ও সব বলা নিষিদ্ধ।" কিন্তু লোকটি পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয় জানিবার জন্য ...র্বন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন বাবা বলেন, "উহা শুনিলে মন খারাপ ...হবে।" তথাপি লোকটি নিরস্ত না হইয়া বাবাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে থাকায় ...বা বলিলেন, "তুমি বাপু পূর্বজন্মে ছাগল ছিলে।"

লোকটি। প্রমাণ?

বাবা প্রমাণস্বরূপ তাহার এ জন্মের ছাগলোচিত একটি অতিগর্হিত স্বভাবের ...ল্লেখ করিলে লোকটির বাক্য বন্ধ হয়, এবং তিনি আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না ...রিয়া স্ত্রী ও কন্যা সহ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যান। এই সময়ে আমাদের কোন ...রুভাই উপস্থিত ছিলেন কি না তাহা জানিতে পারি নাই। ঘটনাটি বাবা স্বয়ং ...সেদিন প্রাতে ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে বেড়াইতে কেদার ভৌমিকদাদাকে ...লেন।

উক্ত লোকটির যে দুরাচারের কথা বাবা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহা নিতান্তই ...হিত রকমের ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করা যায় মহাপুরুষকর্তৃক ...াহার প্রকাশের ফলে লোকটির চরিত্রসংশোধন হইয়াছিল। সেরূপ সম্ভাবনা ...না থাকিলে বোধ হয় বাবা তাহাকে ঐরূপ অপ্রীতিকর কথা বলিতেন না।

---

* মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র খ্রীঃ ১৯২৯ সনে অর্থাৎ আমার দীক্ষার এক বৎসর পূর্বে জন্মাষ্টমী ...ন পরলোকগত হন। উক্ত ঘটনাটি তাহার অল্পকাল পূর্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

যদিও কথিতপ্রকার দুরাচারের দৃষ্টান্ত সমাজে কমই শুনা যায়, তথাপি নানা দুষ্প্রবৃত্তি হইতে আমরা কি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত? বালিকা ব্রহ্মজ্ঞা শ্রীশ্রীশোভামার মুখে শুনিয়াছি পূর্বজন্মের অনেক দুষ্ট সংস্কারের ভোগ দুষ্টচিন্তাদ্বারাও হইয়া যায়। সে যাহা হউক, আমাদের অনেকেরই ভিতরে শয়তানের খেলা নিরন্তরই চলিতেছে ইহা নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীবাবার অবিদিত ছিল না। অথচ সব জানিয়া শুনিয়াও বাবা তাঁহার প্রত্যেকটি শিষ্যকে স্নেহ করিতেন, আদর করিতেন, এবং কাহারও দোষ প্রায়শঃ কঠোরভাবে ব্যক্ত না করিয়া প্রয়োজন মত সদুপদেশ দিতেন। প্রাসঙ্গিকরূপে একটি ঘটনার কথা বলি। ইহাও আমি শ্রীযুক্ত গোপীনাথের মুখে শুনিয়াছি।

গোপীনাথের দীক্ষার কিছুকাল পরের কথা। হনুমান্ ঘাটের সন্নিহিত আশ্রমে একদিন গোপীনাথ শ্রীশ্রীবাবার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় ডাকে একখানি পত্র আসে। পত্রটি কিছু দীর্ঘ ছিল এবং বাবাকে উহা আগাগোড়া মনযোগসহকারে পাঠ করিতে দেখিয়া গোপীনাথের মনে তৎসম্বন্ধে তথ্য জানিবার কৌতূহল জন্মে। ঐ কৌতূহল তিনি বাবার নিকট ব্যক্ত করিলে বাবা পত্রখানি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন। পত্রে যাহা লিখিত ছিল এবং পরে যাহা যাহা হয় সবই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

পত্রলেখক বাবার একজন পুরাতন শিষ্য। তিনি নিজ যুবক পুত্রকেও বাবার নিকট আনিয়া দীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। পুত্রটি বেশ নিষ্ঠা ও তৎপরতাসহকারে ক্রিয়া করিত বলিয়া বাবা তাহার উৎসাহবৃদ্ধির জন্য তাহার জ্ঞানের আবরণ কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত করিয়া দেন; ফলে তাহার কিঞ্চিৎ পরচিত্তজ্ঞতা জন্মে। বাবা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "সাবধান! কখনও স্বজনদিগের চিত্ত পরীক্ষা করিতে যাইও না।' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবকটি কিয়ৎকাল পরে প্রাপ্তশক্তির অপপ্রয়োগ করিয়া সকল ঘনিষ্ট স্বজনের চিত্ত পরীক্ষা করিতে থাকে। ফলে সকলের চিত্তের গূঢ়তর ভাব সকল বিদিত হওয়ায় তাহার মনে সকল স্বজনের প্রতি একটা অস্বাস্থ্যকর ঘৃণার উদয় হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবারই উপক্রম হয়। এই সময়েই তাহার পিতা পূর্বোক্ত পত্রখানি বাবাকে লিখেন। বাবা তদুত্তরে তাঁহাকে পুত্র সহ কাশী আসিতে লিখিয়া দেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা আসিলে বাবা সেই যুবকটিকে অনেক উপদেশ দেন ও নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তাহার স্বজন কেহই প্রকৃতপক্ষে সে যেরূপ মনে করে সেরূপ খারাপ লোক নয়। কিন্তু এইরূপ উপদেশে কোনও উপকার না হওয়াতে বাবা বলেন, "বাপু, তুমি ত পরের চিত্তই পরীক্ষা করিয়াছ, নিজের চিত্তের দিকে একবার তাকাইয়াছ কি?

যুবক। না, তাহা করি নাই।

বাবা। আচ্ছা, এখন তাহাই কর দেখি।

যুবক (বোধকরি বাবার প্রদত্ত তীব্রতর শক্তিবলে) নিজ হৃদয়কন্দরে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে নিজে কাহারও অপেক্ষা কোনও অংশেই উৎকৃষ্টতর বৃত্তিসম্পন্ন নহে। অথচ সেও নিজেকে খারাপ মনে করে না, অন্যেও তাহাকে খারাপ মনে করে না। তখন তাহার চৈতন্যের কিছু উন্মেষ হইল। তারপর বাবা বলিলেন, "বাপু, তোমাকে আমি কতটুকু শক্তিই দিয়েছি? তোমার চেয়ে আমার শক্তি বেশী একথা স্বীকার কর ত?"

যুবক। আজ্ঞে, তা' অবশ্যই করি।

বাবা। দেখ আমার হাজার হাজার ছেলে। তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তে কোন্ দুষ্টবৃত্তি ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন আছে সবই আমি জানি। তথাপি কেহ কি বলিতে পারে আমি কাহাকেও ঘৃণা বা অনাদর করি? সকলেই আমার প্রিয়, সকলের উপরেই আমার আশীর্বাদ আছে, সকলেরই কল্যাণ-সাধনের জন্য আমি সর্বদা ব্যগ্র। তবে তুমি কেন তোমার আপন জন সহ সংসার করিতে পারিবে না?

এই কথায় যুবকটির সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসে। বাবাও তাহার শক্তিটুকু হরণ করিয়া নেন। তারপর সে পিতার সহিত স্বগৃহে ফিরিয়া যায়।

২৬শে চৈত্র ও ২৭শে চৈত্র দুই দিনই বিকালে বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে বরেন্দ্র বসু নামে একটি সুদর্শন ভদ্র যুবককে বসিয়া থাকিতে দেখি এবং শুনিতে পাই ইনি একজন ব্যারিষ্টার, বাবার উপর খুব শ্রদ্ধাবশতঃ মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে আসেন। ঐ দুই দিনের মধ্যে একদিন ইহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এই ত্রিবিধ দেহ-সম্বন্ধে বাবাকে অনেক প্রশ্ন করিতে শুনি। বাবার সব উত্তর আমার কানে পৌঁছে নাই। জানকীদাদারা কেহ সঙ্গে ছিলেন না বলিয়া অশ্রুত অংশ পূর্ণ করিয়া লইবারও সুবিধা হয় নাই। যতটুকু স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম তাহার মর্ম এইরূপ—সূক্ষ্মদেহেই মনের আধার, কিন্তু মনের কার্যের প্রকাশ হয় স্থূল দেহে। মন চঞ্চল নয়, চঞ্চল হইতেছে চিত্ত। জলের উপর শোলা যেরূপ ভাসে, চিত্তের উপর মনও তেমনি ভাসিয়া আছে। চিত্তের চঞ্চলতার দরুনই মন চঞ্চল হয়। চিত্তকে স্থির করাই হইতেছে আসল কাজ, তাহার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে যোগ।

মন ও চিত্তের মধ্যে বাবাকে প্রভেদ করিতে পরে বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে কখনও তাঁহাকে প্রশ্ন করি নাই। মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি—এই তিনটি তত্ত্বের সাধারণ নাম চিত্ত এরূপ মতও আছে, আবার মন, অহঙ্কার বুদ্ধির বৃত্তি সকল হইতে চিত্তের বৃত্তি পৃথক অর্থাৎ মনের বৃত্তি সঙ্কল্পবিকল্প অর্থাৎ নানাবিধ ইচ্ছা, অহঙ্কারের বৃত্তি অহং ও মম এইরূপ সম্বন্ধবোধ, বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়, আর চিত্তের বৃত্তি অনুসন্ধান, এইরূপ মতও আছে। বাবার পরিভাষা দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক ছিল। আমার মনে হয়, বাবার মতে চিত্তই

সকল সংস্কারের আশ্রয়, মন চিত্ত হইতে একটু বিশুদ্ধতর সত্তা। চিত্তের প্রভা হইতে মুক্ত করিয়া মন নিয়া অনেক উর্ধ্বে যাওয়া যায়। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইতে তাহা পারা যাইত না।

২৭শে তারিখে বাবা ভ্রমণের জন্য বাহিরে চলিয়া গেলে যখন আমি ও অন্যান্য গুরুভ্রাতা স্বগৃহের দিকে ফিরিতেছিলাম ঐ সময়ে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সোণাভা (বিশ্বেশ্বর দত্ত) ও এটর্ণি মন্মথ দাদা পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন। মন্মথদা বলেন, একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—বাবা, কামজনিত চাঞ্চল্য কিসে একটু কমে? তাহাতে বাবা বলেন, "বেটা তোরা আজন্ম লম্পট, তোদের কাম কি দুই-একদিনে যাবে? ঔষধ ত দেওয়াই হয়েছে। এখন সেটা খুব ক চালা, সব দোষ কেটে যাবে।"

সোণা ভাই বলিলেন, "সর্বদা বাবার কাছে আসা দরকার। দাদা (এটর্ণি ননী দত্ত) যখন মরণের মুখে, তখন কয়েকদিন বাবার কাছে আসিতে পারে নাই। বাবা ঐ সময়ে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বিপদে গুরুর কাছে ঘন ঘন আসা ভাল। দাদাকে বাবা বলিয়াছিলেন, 'তুমি কিছুদিন কলিকাতার বাহিরে যেও না।' দাদা কোষ্ঠী হইতেও জানিতেন বায়ান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যুযোগ আছে। তবু গুরুর আদেশ অল্পকারণে লঙ্ঘন করিয়া দেশে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন বাবা বলিলেন, 'আর কিছু করিবার প নাই, শিবের অসাধ্য।'

এই ননী দত্তদাদার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া সোণা পুরীতে আমাকে বলিয়াছিলেন "দেখা গিয়াছে কর্ম কিছু কিছু করিলে বেশ উপকার হয়। দাদা বছর দশে মাত্র বাবার শিষ্য হইয়াছিলেন, ঘণ্টা খানেকের বেশী কর্ম কদাচিৎ করিতেন, অথ মৃত্যুকালে কি সুন্দর ভাব! প্রথমে মনে মনে জপ, তার পর মৃত্যুযন্ত্রণাবৃদ্ধি সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে জপ। শেষে বেশ বুঝা গিয়াছিল দাদা বাবাকে প্রত্য দেখিতেছেন।"

মহাবিষুবসংক্রান্তি দিনে বাবা সত্তরটি কুমারীকে জলপূর্ণ এক একটি কাঁসা জলপাত্র ও এক একটি পক্কাম্র দান করেন এবং মিষ্টান্নাদিদ্বারা ভোজন করান। পরদিন নববর্ষ উপলক্ষেও পঞ্চাশটি কুমারী ভোজন করান। এইদি ইন্দু চক্রবর্তী দাদা প্রাতে কালীঘাটে বলি দিয়া সেই মহাপ্রসাদ দ্বারা বে ১১টার মধ্যেই বাবার ভোগ দেন। কালীঘাটে এত সকালে বলি প্রায় হ না। ইন্দুদাদা সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও কিয়ৎকালের জন্য হাইকোর্টের জজ র বাহাদুর দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর পুত্র বলিয়াই বোধ হয় উহা সম্ভব হইয়াছিল বাবার ভোগে তাঁহার আহ্নিক ক্রিয়ার মতই এক মিনিটও বিলম্ব হইবার ছিল না।

১লা বৈশাখ যখন আশ্রমে যাই তখন মনে মনে পূর্বদিন যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের লাভক্ষতি খতিয়ান করিতে গিয়া মৃতা কন্যাটিকে স্মরণ করিয়া মন খুবই বিকল হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবার চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সেই বিকলতা দূর হয়।

এইদিন কথাপ্রসঙ্গে বাবা বলেন, "ব্রাহ্মণদের বংশানুক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মণ্যতেজ কখনই একেবারে লুপ্ত হয় না। অনাচারাদি দ্বারা তাহা অভিভূত বা আবৃত থাকে। যেমন মল-মাখা হীরা হীরাই থাকে সেইরূপ। ক্রিয়াদি যথারীতি করিলে কিয়ৎকালমধ্যেই সেই স্বাভাবিক তেজ পুনরায় ফুটিয়া উঠে। কায়স্থদিগের বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, উহা তাহাদের চরিত্রে জাতিগত সংস্কাররূপে বদ্ধমূল। সেইজন্য ক্রিয়াতে বেশ উন্নতি হইলেও চরিত্রের মধ্যে একটু খাদ থাকিয়াই যায়, যেমন অনেক মিষ্ট আমেরও আঠিতে একটু টক থাকে সেইরূপ। ব্রাহ্মণে ও কায়স্থে এই প্রভেদ। ইচ্ছা হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করি, বৈদ্যজাতির অবস্থা কিরূপ? কিন্তু সাহসে কুলাইল না। তবে জানকীদাদার ও তেওতার বিজয়শঙ্কর রায়দাদার মুখে শুনিয়াছি, অন্য সময়ে বাবা বৈদ্যজাতির সদ্‌বুদ্ধির প্রশংসাই করিয়াছেন। বিজয়দাদা জাতিতে বৈদ্য। জাতিগতভাবে উগ্রক্ষত্রিয়দিগেরও প্রশংসা বাবা করিয়াছেন এরূপ কথাও কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি।

আমি জাতিগত স্বভাবের কথাই লিখিলাম—বাবাও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের জাতিগত স্বভাবের কথাই বলিয়াছিলেন। জাতিগত ভাব হইতে ব্যক্তিগত ভাবকে অবশ্যই প্রবল বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণেও দস্যুবৃত্তি করে, আবার প্রহ্লাদের জন্ম দৈত্যকুলে হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবার কোনও কথা বা মতের সমালোচনা বা সমর্থন আমার লক্ষ্য নয়, সাধ্যও নয়। তবে আশা করি বাবার শিষ্য বা অশিষ্য যে-কেহ এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন—বাবা ব্রাহ্মণজাতির প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই যেমন গর্বিত হইয়া উঠিবার সমুচিত কারণ নাই, সেইরূপ কায়স্থজাতির কিঞ্চিৎ নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া কোনও কায়স্থেরই ক্ষুব্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কায়স্থজাতিসম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ মন্তব্য বাবা বহুবার করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রধান প্রধান কায়স্থ শিষ্যের সমক্ষে এবং কায়স্থ শিষ্যের গৃহে অবস্থিতিকালেও করিয়াছেন। এরূপ আশা করা অন্যায় নয় যে, ঐ সকল শিষ্য বাবার মন্তব্য শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ হৃদয়ের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছেন—ব্রাহ্মণেরা ভাল হউন বা মন্দ হউন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা (কায়স্থ শিষ্যগণ) বাবার ঐরূপ মন্তব্যের যোগ্য, কি তদবস্থার ঊর্ধ্বে। ব্যক্তিগতভাবে এক কায়স্থ যুবক শিষ্যসম্বন্ধে বাবাকে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, দশহাজার লোকের মধ্যে তাহার মত উৎকৃষ্ট আধার একজনেরও দেখা যায় না। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোনও ব্রাহ্মণ শিষ্যের অর্থলোভ, অসাধুতা ও মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতি দোষের নিন্দা তাহাদের সমক্ষেই ইঙ্গিতে বা স্পষ্টভাবে

করিতে বাবা কখনই কুণ্ঠিত হন নাই। কাহাকেও খুসী রাখা বা অখুসী করা ত তাঁহার লক্ষ্য ছিল না; সকলকে সংশোধন করিবার চেষ্টাই তিনি চিরদিন করিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে শ্রীশ্রীবাবার কায়স্থ শিষ্যগণের মধ্যে অনেক কর্মী ও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন এবং আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন বিশেষ শক্তিসম্পন্নও হইয়াছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের একজন বিভূতির গর্বে মত্ত হইয়া "ভৈরবানন্দ" নাম গ্রহণপূর্বক বহুলোককে দীক্ষা দিতে থাকেন এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের শিষ্যদিগকে বা গুণমুগ্ধ ভক্তগণকে স্বীয় চরণধূলিও দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার ঐ সকল অনাচারে জ্ঞানগঞ্জের মহর্ষিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীবাবাকে তাহার সমুচিত শাস্তি দিতে উপদেশ দেন। কালিদাস বলিয়াছেন, "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্"—বিষবৃক্ষকেও নিজে বড় করিয়া নিজ হাতে কাটা সমীচীন নয়। বাবাও তাহাই মনে করিতেন, সেইজন্য তিনি সাক্ষাৎভাবে সেই শিষ্যটির কোনও অনিষ্ট করেন নাই। বরং সময় সময় বলিয়াছেন, শাস্তি দিব এরূপ একটা ভাব মনে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিষ্যটি দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর প্রবল উৎসাহ ও প্রযত্নসহকারে যে কর্ম করিয়াছে সেই কর্ম আসিয়া বাধা দেয়। জ্ঞানগঞ্জের মহর্ষিদিগকেও তিনি এই রকম সকল কথাই বলিয়াছিলেন। শিষ্যটি গুরু সাজিবার পর বাবার নিকটে আসিতেন না বলিয়া তাঁহাকে মৃদু ভৎর্সনা বা উপদেশ দিয়া তাঁহার গর্হিত আচরণ সমূহ হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব ছিল না। বর্তমানে কাশীর "বিশুদ্ধানন্দকানন" আশ্রমের কার্যকারী সেবায়েত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দাদার সহিত বাবার উক্ত শিষ্যটির খুব সৌহৃদ্য ছিল। তিনি বাবার সহিত উহার পুনর্মিলনের জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি দণ্ডরূপে কুমারীভোজন জন্য একশত আট টাকা দিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া তাঁহাকে বর্ধমান আশ্রমে আনিয়াও ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে কোনও কোনও গুরু ভাইয়ের শ্লেষোক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া "ভৈরবানন্দ" বিরক্তিবশে আর গুরুর নিকট আসেন নাই। ক্রমে তিনি গুরুরই নানা নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্ষমাময় গুরু তখনও নিজ কথায় বা কার্যে তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্তি বা অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন নাই। অবশেষে তাহার পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে তাঁহারই একটি বিধবা যুবতী শিষ্যা-সংক্রান্ত অতি কুৎসিত অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া তিনি অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেন। শুনিয়াছি তাঁহার যোগৈশ্বর্যে মুগ্ধ কোনও অত্যুচ্চ রাজ-কর্মচারীর সহায়তায় পরিশেষে তিনি বিপন্মুক্ত হন। কিন্তু ঐ ব্যাপারের পর তাঁহার পূর্বতন ভক্তদের মধ্যেও তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কতগুলি যোগবিভূতি নাকি শেষ পর্যন্ত ছিল এরূপ কথাও শুনিয়াছি, আবার উহার বিপরীত কথাও শুনিয়াছি। আমি স্বয়ং তাঁহাকে দেখি নাই।

অপর কায়স্থ শিষ্যটিও অল্পদিনমধ্যে গুরুর কৃপায় কতগুলি শক্তি—বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্‌দর্শন ক্ষমতা লাভ করেন। বাবার নিষেধ ছিল তিনি যেন কখনও কোন স্বজনের ভবিষ্যৎ না দেখেন। কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্টক্রমে একটি পরমস্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র অতি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তিনি গুরুর আদেশ বিস্মৃত হইয়া বা অমান্য করিয়া তাহার ভবিষ্যদ্‌দর্শন করেন, এবং শোকাকুল হন। তিনি শ্রীযুক্ত গোপীনাথকে বলিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ একটি দেবী-প্রতিমা (নায়িকা) তাঁহার সুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "আর আমার থাকা চলিল না, আমি গেলাম।" তদবধি তাঁহার ঐ সিদ্ধিটি (উহার নাম নাকি "নায়িকাসিদ্ধি") লুপ্ত হয়। কিন্তু তিনি কখনও গুরুতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হারান নাই, শেষপর্যন্ত গুরুগতপ্রাণ ছিলেন। আমি তাঁহাকেও দেখি নাই। আমার দীক্ষার অল্পপূর্বে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

একটি ব্রাহ্মণ শিষ্যেরও তীব্র ক্রিয়ার ফলে কয়েকটি বিভূতিবিকাশের পর একটা অতি গহিত রকমের চরিত্রদোষ ঘটে। ফলে বিভূতিগুলি বিলুপ্ত হয়। একথা উহু ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি। এই গুরুভাইটির সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনিও পরলোকে।

এই শেষোক্ত দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, প্রথমোক্ত গুরুভাইটি অসাধারণ রকমের যোগৈশ্বর্য লাভ করিবার পর জাতিগত ত্রুটির দরুন অর্থাৎ কায়স্থ বলিয়াই বিকৃত হইয়াছিলেন, কিংবা দ্বিতীয় গুরু ভাইটিও কায়স্থ বলিয়াই তাঁহার নায়িকাসিদ্ধিটি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগত স্বভাবই প্রতি স্থলেই প্রবল হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ শিষ্যদের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা রাধিকা (বন্দ্যোপাধ্যায়) নামক এক শিষ্যের প্রশংসা প্রায়ই করিতেন। ইনি তাঁহার গুস্করায় অবস্থিতিকালের প্রথম দিকের শিষ্য। ইনি উত্তরকালে নেপাল দরবারের অধীনে পূর্ত-বিভাগে এঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। দুইটি পুত্রসন্তান উপার্জনক্ষম হইলেই ইনি স্ত্রীসহ সংসারত্যাগ করেন। উভয়েই গার্হস্থ্যাশ্রমেই যোগক্রিয়া করিয়া খুব উন্নত হইয়াছেন, রাধিকাদাদার আকাশ-গমন ক্ষমতাও হইয়াছে—এরূপ কথাও না কি বাবার মুখে শুনা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মুস্তাফি বাবার খুব প্রাচীন শিষ্য। তিনি রাধিকাদাদাকে দেখিয়াছেন এইরূপ কথা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষও দেখিয়াছেন বলেন, তাঁহার একটি অত্যাশ্চর্য রকমের বিভূতির কথাও তিনি মধ্যে মধ্যে বলেন। আমার পরিচিত আর কেহ রাধিকাদাদাকে দেখিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি এখনও দেহে আছেন এইরূপ কথা সম্প্রতি শুনিয়াছি; বিশেষ বিবরণ পাই নাই।

বাঙ্গালা ১৩৩৮ সালের জন্মোৎসব ও বারুণীস্নান এই দুইটি ঘটনার অন্তর্বর্তী

কালে শ্রীযুক্ত যোগেশদাদা কাশীর "বিশুদ্ধানন্দকানন" আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনের জন্য খুব উদ্যোগী হইয়া উঠেন। এই বৃহৎ কার্যটিতে হস্ত দেওয়ার পূর্বে তিনি শ্রীশ্রীবাবার অনুমতি নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহাদের অর্থসাহায্যে উহা স্থাপিত হইবে সেই গুরুভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত এবিষয়ে পূর্বে কোনও পরামর্শ বা আলোচনা করেন নাই বা করা উচিত বা আবশ্যক মনে করেন নাই। যোগেশদাদার বহুগুণের মধ্যে এইটি ছিল একটা বড় রকমের ন্যূনতা, কোনও কার্যেই তিনি বাবা ভিন্ন অপরের মতামত বড় একটা গ্রাহ্য মনে করিতেন না। মর্মরমূর্তি স্থাপন করিতে হইবে এই সঙ্কল্প তাঁহার নিজ মনে দৃঢ় হইলেই, তিনি অপর কাহাকেও বিশেষ যোগ-জিজ্ঞাসা না করিয়া কুমারটুলীর বিখ্যাত ভাস্কর সম্প্রতি পরলোকগত গোপেশ্বর পালের সহিত একটা চুক্তিপত্র করিয়া ফেলেন। যোগেশদাদা নিজ কার্যের সমর্থনে বলিতেন, "বিশুদ্ধানন্দ-কানন" আশ্রম হইবার পূর্বে শ্রীশ্রীবাবা নাকি একবার ধানবাদে কোনও শিষ্যের গৃহে অবস্থানকালে যোগেশদাদা, সুরেন্দ্র চক্রবর্তীদাদা এবং আরও কয়েকটি শিষ্যের সাক্ষাতে কতকটা আপন মনে (যোগেশ দাদা বলিতেন ভাবস্থ হইয়া) বলিতে থাকেন, কাশীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর আশ্রমে তাঁহার যেরূপ একটি মর্মরমূর্তি আছে বাবার মৃত্যুর পর তাঁহার ঐরূপ একটি মর্মর মূর্তি গড়িয়া কাশীতে কোনও বাগান-বাটীতে শিষ্যগণ তাহা স্থাপন করিলে তাহাদের অক্ষয় স্বর্গ (?) হইবে। তারপর কলিকাতায় নাকি বাবা একদিন যোগেশদাদাকে বলিয়াছিলেন, "যদি মূর্তি স্থাপন কর, তবে তাহা আমি দেহে থাকিতেই কর, যেন দেখিয়া যাইতে পারি।" এইজন্যই যোগেশদাদা বলিতেন যে, এই সময়ে এই কার্যে তিনি এত তৎপর হইয়াছেন।

পক্ষান্তরে এই সময়ের দুই বৎসর পূর্ব হইতেই দেশে একটা ভীষণ আর্থিক দুরবস্থার সূচনা হয়, এবং উহার প্রকোপ উকিল, ডাক্তার, জমিদার তালুকদার সকল শ্রেণীর লোকের উপর আপতিত হওয়ায় সকলেই অল্পাধিক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য যোগেশদাদার এই উদ্যম বাবার কলিকাতাস্থ মধ্যবিত্ত শিষ্যগণমধ্যে কোনও আনন্দ বা উৎসাহের সঞ্চার করে নাই। যদিও বাবার শিষ্য সংখ্যা এত ছিল যে, পত্রদ্বারা সকলের সহযোগিতা আহ্বান করিলে কাহাকেও কিছুমাত্র পীড়াপীড়ি না করিয়া পাঁচ-ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন হইত না, তথাপি যোগেশদাদা সে পথে গেলেন না। বাহিরে যে দু-দশ জন গুরুভাই মোটা চাঁদা দিতে সমর্থ, তাঁহাদের নিকট তিনি পত্রাদি লিখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান চেষ্টা হইল বাবা কলিকাতায় থাকিলে যে সকল শিষ্য প্রায়শঃ তাঁহার কাছে আসিতেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতেই অনুমিত ব্যয়ের অধিকাংশ আদায় করা। তিনি বাবার অসাক্ষাতে ঐ সকল শিষ্যদিগের সমক্ষে সাধারণভাবে এত বড় কল্যাণকর একটা ব্যাপারে সকলের অনুৎসাহের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নিত্য নিত্য

নানা রকমের ঝাঁঝাল মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রকারান্তরে কলিকাতাস্থ শিষ্যগণের উপর বেশ গুরু-চাপই দেওয়া হইতে লাগিল। আমি নূতন শিষ্য, আমার অভিজ্ঞতা অল্প। কিন্তু মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ব্যক্ত হওয়ামাত্র বাবার বহু শিষ্যের, এমন কি দুই একজন হোমরা শিষ্যের মুখেও যোগেশদাদা-কর্তৃক ক্রমশঃ উক্তরূপ চাপের আশঙ্কা প্রকাশ পাইতে শুনিলাম। পরে ঐ আশঙ্কা যখন সত্য হইল, তখন অনেকের মধ্যেই প্রবল অসন্তোষ লক্ষ্য করিলাম। অন্যদিকে যোগেশদাদার মনোভাব যাহা আমি তাঁহার মুখে গোড়ার দিকে শুনিয়াছিলাম তাহা এইরূপ: অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শিষ্যগণ যে যেমন ইচ্ছা করিবেন তাহাই দিবেন ; যাহা অপূর্ণ থাকিবে তাহা তিনি নিজ হইতে পুরণ করিবেন। কার্যতঃ কিন্তু তিনি অর্থসংগ্রহের চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গুরুভ্রাতৃগণ মধ্যে নিবদ্ধ রাখেন নাই।

যোগেশদাদার দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার আর্থিক অবস্থায় একটা গুরুতর বিপর্যয় ঘটে। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কালেক্টররূপে মাসিক হাজার টাকা বেতন পাইতেছিলেন। যদিও দুই বৎসর পূর্বেই তাঁহার অবসর-গ্রহণের কাল আসিয়াছিল, তথাপি কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন কয়েকটি শর্তানুসারে তাঁহার স্থলে নিয়োগযোগ্য প্রার্থীর অভাব হওয়ায় পুনঃ পুনঃ তাঁহার কার্যকাল প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইতেছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন এই ভাবেই তিনি আরও কিছুকাল চাকরিতে থাকিতে পারিবেন। কিন্তু কর্পোরেশন চাকরির উক্ত শর্তগুলিতে হঠাৎ কিছু পরিবর্তন করিয়া যোগেশদাদার অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এইবার (খ্রীঃ ১৯৩২) মার্চ মাসের শেষ তারিখে তাঁহার সহকারীকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া ফেলেন। এইরূপে পরদিন (১লা এপ্রিল) হইতে যোগেশদাদাকে চাকরি হইতে অবসর লইয়া আসিতে হয়।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ঠিক ঐদিন হইতে তাঁহার একমাত্র পুত্র যতীশের চাকরিটিও হঠাৎ যায়। যতীশদাদা রেমিংটন টাইপ রাইটার কোম্পানীতে আড়াইশত টাকা বেতনে চাকরি করিতেছিলেন। ঐ কোম্পানীটির কারবার হস্তান্তরিত হওয়ায় ব্যয়সংক্ষেপার্থ অন্য কতিপয় কর্মচারীর সঙ্গে তাঁহাকে একমাসের নোটিশের পরিবর্তে একমাসের (এপ্রিলের) বেতন অগ্রিম দিয়া ৩১শে মার্চ তারিখে চাকরি হইতে বিদায় দেওয়া হয়।

আর্থিক অবস্থার এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনে যোগেশদাদার বাবার মূর্তিপ্রতিষ্ঠাসম্পৃক্ত সদিচ্ছায় (অর্থাৎ তজ্জন্য ব্যয়ের একটা মোটা অংশ বহন করিবার ইচ্ছায়) অবশ্যই একটা দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় ঘটিয়াছিল। তাহাতেও তৎকর্তৃক অপর শিষ্যগণের অনুৎসাহের সমালোচনা কতটা তীব্রতর হইয়া থাকিবে।

শ্রীশ্রীবাবা যেদিন বণ্ডুল হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, সেইদিন হাবড়া ষ্টেশনে যোগেশদাদা আমাকে বলেন, "আপনার নামে দু'শ (২০০) টাকা চাঁদা ধরেছি।"

এটা বোধ করি তাঁহার কায়েতি চাল! সে যাহা হউক, আমি বলিলাম, "দাদা, এতটা কি আমি দিয়া উঠিতে পারিব ?"

যোগেশদাদা। একবারে না হয় তিন চারি কিস্তিতে দেবেন।

সেদিন এসম্বন্ধে আর কোনও কথা হয় নাই। আমি পূর্বে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম একশত টাকা দিব। (কার্যতঃ পরে কিঞ্চিৎ বেশী দিয়াছিলাম)। সে যাহা হউক, বারুণী স্নানের পরে আশ্রমে যোগেশদাদা সকলকে (অবশ্য বাবার অগোচরে) বলেন, "কে কি দিবেন বলুন। প্রথম কিস্তির টাকা ১০ই এপ্রিলের পূর্বেই দিবেন। কাহাকেও আমি পীড়াপীড়ি করিতেছি না। তবে আমার আয় হঠাৎ যেরূপ কমিয়া গেল, তাহার পর আপনারা উপযুক্তরূপ সাহায্য না করিলে আমাকে চুক্তিপত্র cancel (বাতিল) করিতে হইবে—ইত্যাদি।" সে দিন কেহ যে কোনওরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এরূপ শুনি নাই। দুই দিন পরে আমি প্রথম কিস্তিরূপে যোগেশদাদার হস্তে পঁচিশটি টাকা দিলে তিনি বলেন, "আপনার হাতেই বউনি হইল।"

আমি। তবেই মূর্তি হয়েছে।

৩১শে চৈত্র তারিখে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া অবগত হই যে, জ্ঞানগঞ্জ হইতে বাবার নিকট একপত্র আসিয়াছে তাহাতে এইরূপ আদেশ পাওয়া গিয়াছে যে, পীড়াপীড়ি করিয়া কোনও শিষ্য হইতে যেন মূর্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা আদায় করা না হয়। "পীড়াপীড়ি" ঠিক হইতেছিল না, তবে বোধ করি যোগেশদাদার সমালোচনার ঝাঁঝই উক্ত আদেশের লক্ষ্য ছিল। সে ঝাঁঝ আদেশপ্রাপ্তির পরেও বিশেষ কমে নাই। গণতন্ত্রসম্মত প্রণালীতে চলিলে এইরূপ আদেশের কোনও প্রয়োজন হইত না। কিন্তু যোগেশদাদার মনোবৃত্তি ছিল গণতন্ত্রের বিপরীত।

জ্ঞানগঞ্জের পূর্বোক্ত চিঠিতে বাবার আটত্রিশটি শিষ্যের স্বভাব বা আচরণ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হইয়াছে এইরূপ শুনিয়াছিলাম। এই আটত্রিশ জনের মধ্যে যোগেশ বসু, তৎপুত্র যতীশ, ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণ, রায় সাহেব, কুঞ্জ ঘোষ, কেদার ভৌমিক, ও জানকী ও বজনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দাদাদিগের নাম ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। বাবা আমার সমক্ষেই ঐ সকল কথা বলিতেছিলেন, তবে সমস্ত কথা আমার কর্ণগোচর হয় নাই। জানকীদাদাদের কাছে পরে তাহা শুনিয়াছিলাম। জ্ঞানগঞ্জের পত্রে আমার নাম থাকার কথা শুনি নাই; সকলের নাম বাবা প্রকাশও করেন নাই। বাবা বলিয়াছিলেন, "চিঠিতে যোগেশের এতটি,* ননীর (রায় সাহেবের) এতটি, কুঞ্জের এতটি দোষের উল্লেখ আছে।" কাহারও কাহারও কয়েকটি দোষের কথা বাবা সেদিন সকলের সমক্ষে প্রকাশও করিয়াছিলেন। যাঁহার যে যে দোষ আছে তাহা বাবা কৌশলে বা গোপনে

* বাবা সংখ্যাগুলিই বলিয়াছিলেন।

তাঁহাকে বলিয়া দিবেন বা অন্য প্রকারে সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা আমার মনে হইয়াছিল। পরে তদ্বিষয়ে আর অনুসন্ধান করি নাই। যাহাদের অনেকগুলি গুণ ছিল, তাঁহাদেরই দোষের বিবরণ অবশ্য পত্রে আসিয়া থাকিবে—যেন তাঁহারা সত্বর আত্মসংশোধনে রত হইতে পারেন। আমার মত যাহারা নির্গুণ, জ্ঞানগঞ্জের চিঠিতে তাহাদের নাম না থাকায় বিস্ময়ের কিছু নাই। আমার নিজসম্বন্ধে আমি সেদিন যাহা ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম তাহা এইরূপ: আমি সবে মাত্র দেড় বৎসর বাবার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছি। সাধন কতটুকুই করিয়াছি? ভক্তি নামমাত্র, ত্যাগ তার চেয়েও কম। আমার প্রতি ইতিমধ্যে জ্ঞানগঞ্জের মহর্ষিগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে এরূপ মনে করাই মূর্খতা।

৩রা বৈশাখ (১৩৩৯ খ্রীঃ) ১৬।৪।৩২ তারিখে মুসলমানী পর্ব ইদ উপলক্ষে আফিস বন্ধ ছিল। প্রাতেই রূপনারায়ণ নন্দন লেনে আশ্রমে যাই। গিয়া দেখিতে পাই মর্মরমূর্তিনির্মাণের প্রাথমিক কার্যরূপে ভাস্করকর্তৃক শ্রীশ্রীবাবার একটি মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মিত হইয়াছে, এবং ভাস্কর বাবার সম্মুখে বসিয়া উহার অবয়বাদি সূক্ষ্ম সংশোধন করিতেছেন। মৃন্ময় মূর্তিটি ভারি সুন্দর ও বাবার অবিকল অনুরূপ হইয়াছে দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়াছিল। আশা হইয়াছিল মর্মর-মূর্তিও তাহাই হইবে। কার্যতঃ কিন্তু মর্মর-মূর্তির মুখ শ্রীশ্রীবাবার মুখ হইতে একটু যেন ভিন্ন হইয়াছিল। বাবা বলিয়াছিলেন ঐ শিল্পীটির হাত মাটির কাজে যত পাকা, পাথরের কাজে তত নয়। ড্যালহৌসি স্কোয়ারের স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি এই শিল্পীর কৃত। সেটি ঠিক হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কেননা স্যার রাজেন্দ্রনাথকে আমি দেখি নাই। বাবার মূর্তিতে গোপেশ্বর পাল তাদৃশ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

তের

আবার বারুণীস্নানের দিনের কথায় ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। তৎপূর্বে হঠাৎ যোগেশদাদার আর্থিক অবস্থায় যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা বলা হইয়াছে। বারুণীস্নানের দিন তিনি মনোদুঃখে শ্রীশ্রীবাবাকে বলেন, "বাবা, আর যে কখনও বাড়ীতে রাখিয়া আপনার সেবা করিতে পারিব সে সম্ভাবনাও রহিল না।" (এই কথা হইতেছিল রূপনারায়ণ নন্দন লেনের আশ্রমে)। বাবা যোগেশদাদার কথার কোনও উত্তর দেন নাই। যতীশ সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন কি না ঠিক মনে হইতেছে না। আমার ডায়েরীতে দেখিতেছি কিয়ৎক্ষণ পরে তিনিও কথাপ্রসঙ্গে আপনাদের আয়সঙ্কোচের কথা বাবার নিকট অবতারণা

করেন। তদুত্তরে বাবা বলেন, "চাকরি গিয়াছে, ওতে হয়েছে কি? সদ্‌বৃত্তি যদি থাকে, তবে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি কেউ অভাবে কষ্ট পায় না।"

যতীশদাদার আধার ভাল। তিনি বাবার বাক্যে নিশ্চয়ই কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পরে কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহাদিগকে আর্থিক ক্লেশ প্রচুররূপেই সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সদ্‌বৃত্তি হারান নাই, তাই আজ তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষরূপেই ভাল হইয়াছে, এবং যোগেশদাদা তাহার সূচনা দেখিয়া গিয়াছেন। বাবার কথা সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সে যাহা হউক, বাবার উক্ত উত্তরসম্পর্কে আমাদের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত রজনীদাদা প্রশ্ন করেন, "সদ্‌বৃত্তি কি, বাবা, লোকে নিজের চেষ্টায় অবলম্বন করিতে পারে?"

বাবা। সম্পূর্ণরূপে পারে।

রজনীদাদা। পূর্বজন্ম ইত্যাদির সংস্কার দ্বারা তাহাতে কোনও বাধা হয় না?

বাবা। সংস্কার কাকে বল? কতকটা অভ্যাস বই ত নয়। অভ্যাসই বল্‌তে পার। তা যেমন একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সেটাকে নির্মূল করবার জন্য বিপরীত অভ্যাস করা চাই।

শ্রীশ্রীবাবা স্বীয় অভ্যাস মত বিষয়টি খুব সংক্ষেপে বলিলেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও উহা গভীর অর্থপূর্ণ। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের মর্মও ঠিক এইরূপ। বিষয়টি আমাদের অনেককে বিভ্রান্ত করে বলিয়া লিখিতে প্রলুব্ধ হইতেছি যে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই সমস্যার উল্লেখ ও সমাধান এইরূপ আছে :—

বশিষ্ঠ বলিতেছিলেন, শাস্ত্রালোচনা, সৎসঙ্গ-প্রভৃতি বাল্যকাল হইতে প্রচুররূপে অভ্যস্ত হইলে, তাহাদের দ্বারাই পুরুষের চেষ্টা হিত অর্থ (নিঃশ্রেয়সাদি) সম্পাদন করে। তদুত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন,

প্রাক্তনং বাসনাজালং নিয়োজয়তি মাং যথা।
মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কিং করোম্যহম্॥

হে মুনে, পূর্বজন্মার্জিত বাসনাজাল আমাকে যে প্রকারে নিয়োজিত করে, আমি সেই প্রকারেই নিযুক্ত থাকি। আমি অবশ, কি করিব?

তদুত্তরে বশিষ্ট বলিলেন, সেইজন্যই ত তোমার পুরুষকারের প্রয়োজন অধিক। পূর্বজন্মের কি কেবল অশুভ বাসনাই আছে, শুভ বাসনা নাই?

শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা সরিৎ ;
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥
অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবধারয়।
স্বং মনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর।

শুভ ও অশুভ উভয়পথে প্রবহন্তী বাসনানদীকে পৌরুষ প্রযত্ন দ্বারা শুভ পথে বাজিত করিতে হইবে। হে বলিশ্রেষ্ঠ, তোমার মন অশুভ বিষয়ে সমাবিষ্ট হইলে পুরুষকারদ্বারা বলপূর্বক তাহাকে শুভ বিষয়ে নিযুক্ত কর।

শাস্ত্রের সারতত্ত্ব বাবা সাক্ষাদ্‌ভাবে নিজ অনুভূতিতে যেমন যেমন পাইয়াছিলেন তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অভ্রান্তরূপেই দিতেন। ইহার প্রমাণ প্রচুর পাইয়াছি। এই গ্রন্থে তাঁহার সকল উক্তি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা আমার নাই। উহার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করি না। মহাপুরুষগণের উপদেশ বিচারের বিষয় নহে, অনুসরণের বিষয়।

২৮শে চৈত্র তারিখে রজনীদাদা,-প্রভৃতির প্রশ্নের উত্তরে কৃপা ও কর্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবা অনেক কথা বলেন। জানকীদাদা কৃপাবাদী, আমিও তাই, সেই জন্য কথার মধ্যে বাবা স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অতি মধুর বাগ্‌ভঙ্গীতে আমাদের উভয়কে একটু পরিহাসও করেন। সে যাহা হউক, তাঁহার কথার সার হইতেছে, "জগতে কৃপা বলিয়া কিছু নাই। কর্ম কর, কর্মই সার।" আমার মত যাহারা তামসিক--আলস্যপরায়ণ, কর্মবিমুখ, তাহাদের পক্ষে যে উপদেশ সর্বাপেক্ষা হিতকর বাবা তাহাই দিয়াছিলেন তদুপরি ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি পিতা আমরা পুত্র। পুত্রগণের কল্যাণের জন্য পিতার যে স্বাভাবিক ব্যগ্রতা তাহা তাঁহার আছে; তাহাকে তিনি কৃপা বলেন না।

নানা চিন্তায় যে কর্মে ব্যাঘাত হয়, সে বিষয়ে ১লা বৈশাখ তারিখে (বাবার অনুপস্থিতিতে) যোগেশদাদা আমাদিগকে বলেন, "বাবা কাল বলিতেছিলেন, বেটারা ভেবে ভেবেই ম'ল। এত ভাবনা কিসের রে? কাজ ক'রে যা না। এক একবার ভাবি এইরূপ একটা নিয়ম করি যে, প্রত্যেকবার ভাবনার জন্য ১টা ক'রে আধলা জরিমানা দিতে হবে। তা' হ'লে পয়সা দেওয়ার ভয়ে বেটারা আর ভাব্‌বে না।"

৩রা বৈশাখ (খ্রী ১৬।৪।৩২) ভোগের পর আমরা কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে সমবেত হইলে বাবা শিষ্য বিশ্বেশ্বর দত্তের (সোণার) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, যোগ অভ্যাস না করিলে বিষয়চিন্তা ও তজ্জন্য উদ্বেগ মৃত্যুকাল পর্যন্ত মানুষকে ছাড়ে না। যোগ করিলে মৃত্যুকালে মন ভগবানে সংলগ্ন থাকে বলিয়া অন্যচিন্তা আসিতে পারে না। মাছ ধরিবার জন্য চার দিলে ছোটখাট অনেক মাছ আসে, কিন্তু একটা বড় রুই বা কাৎলা আসিলে সেগুলি সব পলাইয়া যায়। ভগবানের চিন্তা রুই-কাতলার মত। আর বৈষয়িক নানা চিন্তা ছোট ছোট মাছের ঝাঁকের মত।

পরদিন ৪ঠা বৈশাখ রবিবার বলিয়া সেদিনও প্রাতে বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই। ঐদিন গিয়া দেখি একটি সাহেব বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিয়া নীরবে নতনয়নে ফরাস বিছানার এক কোণে বসিয়া আছেন। ইনি না কি আসিয়া বাবাকে বলিয়াছিলেন, "আমার জিজ্ঞাস্য বিশেষ কিছু নাই, আমি কেবল কিছুক্ষণ আপনার নিকটে বসিয়া থাকিতে চাই।" বাবা সম্মতি দিয়াছিলেন। সমবেত শিষ্যেরা সকলেই নীরবে বসিয়াছিলেন। আমি আশ্রমে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরে সাহেবটি চলিয়া যান। বয়স ৩০।৩৫ বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কি নাম, কোন্ দেশী তাহা শুনি নাই।

বাবা ভোগের জন্য উঠিয়া গেলে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কর্ম ও কৃপা প্রসঙ্গে তর্ক উঠিয়া কিছুক্ষণ মধ্যে আসর বেশ গরম করিয়া তোলে; তর্কটা (ব্যক্তিগত মন্তব্যহেতু) একটু ঝাঁঝাল ভাবেই চলিয়াছিল। কৃপার দলে প্রধান বক্তা ছিলেন অরুণ বসু; কর্মের দলের যুগল মুখপাত্র ছিলেন যতীশ বসু ও রজনী বন্দ্যোপাধ্যায়। (রজনী দাদা অবশ্য ব্যক্তিগত মন্তব্যের মধ্যে যান নাই।) সে যাহা হউক, এই তর্কের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে, তন্মধ্যে একটি এইরূপ: রজনীদাদার মতে গুরুদত্ত ক্রিয়াই মুখ্যকর্ম; গুরুর দর্শন বা সেবা ইত্যাদি গৌণ বা আনুষঙ্গিক কর্ম। ক্রিয়া জপ ইত্যাদিতে নিবিষ্ট থাকিলেই শ্রীগুরুর শ্রেষ্ঠ সঙ্গ করা হয়, এবং তাহা তাঁহার স্থূলদেহের সেবার চেয়ে নিকৃষ্ট নহে। অরুণ দাদার কথা এই যে, বাবাই বলিয়াছেন গুরুদর্শন, গুরুসেবা ও গুরুর স্থূল সঙ্গও বিশেষ আবশ্যক এবং অরুণের মতে তাহার ফল ক্রিয়া ও জপ হইতে ন্যূন নহে। শ্রীশ্রীবাবা ভোগের পরে উপরে আসিলে প্রশ্নটি মীমাংসার্থ তাঁহার সমক্ষে উপস্থাপিত হয়। তিনি ফলের ন্যূনতা বা আধিক্যসম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া মোটের উপর অরুণ বসুর মতই সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন, গুরুদর্শনের যে নিয়ম শাস্ত্রে আছে, যথা এক ক্রোশ ব্যবধানে থাকিলে প্রত্যহ একবার গুরুকে দর্শন করিতে হয়, তাহার অধিক দূরত্ব অনুসারে সপ্তাহে বা মাসে বা বৎসরে অন্ততঃ একদিন দর্শন অবশ্য কর্তব্য, তাহা অবশ্য পালনীয়, ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। গুরুসঙ্গ, গুরুসেবা, গুরুকে আহার্যাদি দানও প্রকৃষ্ট ফলপ্রদ। (স্থূলে গুরুকে হারাইয়া সকলেই এখন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি তাঁহার স্থূল সঙ্গের মূল্য কত অধিক!)

অরুণ নিজ মত সমর্থিত হওয়ায় উৎসাহাধিক্যবশে বলিলেন, "আহ্নিক ক্রিয়া যখন সুবিধা হয়, করিলেই হইল। সকলের পক্ষে ভোর চারটায় উঠিয়া বসিতে পারা সম্ভব নাও হইতে পারে। সেজন্য কেহ যদি আটটা বা ন'টা বেলায় বসে তাতে কি তার ফল হইবে না?" শ্রীশ্রীগুরুদেব এ বিষয়ে অরুণকে সমর্থন করেন নাই। তিনি বলেন, যথাসময়ে ক্রিয়া করিলে অল্পসময়ে যে ফল হয়, অন্য সময়ে ততখানি ফল পাইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক সময় ও শ্রম লাগে। তবে যাহারা কোনও বিশেষ বাধার দরুন যথাসময়ে ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহারা সদ্ভাবে চেষ্টা করিতে থাকিলে গুরুকৃপায় সে বাধা দূর হইয়া যায় এবং তাহারা ঠিক সময়ে ক্রিয়া করিবার প্রবৃত্তি ও সুবিধা পায়। যাহারা বাতাদি রোগগ্রস্ত বা বিকলাঙ্গ

বলিয়া আসন করিয়া বসিতে পারে না, তাহাদের সিদ্ধি একটু বিলম্বে হয়; তবে তাহারাও একাগ্রতাসহকারে যথাসাধ্য ক্রিয়া করিলে অল্প ক্রিয়াদ্বারাই যথেষ্ট ফললাভ করে।

আমি একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, বাবা, যখন আহ্নিক করিতে বসা হয় তখন জপ চলিতে থাকিলেও মন সব সময় তাহাতে সংযুক্ত থাকে না। সেরূপ জপে কোনও উপকার হয় কি?"

বাবা। অবশ্য হয়। আসনে বসিয়া জপ করিলে তাহার ফল অবশ্য হইবে। অতি অল্প সংযোগ থাকিলেই সেইটুকু ধরিয়াই জগদম্বা সাধককে উঠান।

ইহার পর রজনীদাদা বাবাকে প্রশ্ন করেন, গুরু ও দেবতা যখন একই বলা হয়, আর শাস্ত্রে গুরুরও বীজ আছে, তখন গুরুবীজ না দিয়া দেবতার বীজ কেন দেওয়া হয়? বাবার উত্তরের মর্ম এইরূপ: দেবতার বীজের মধ্যেও গুরুশক্তি ক্রিয়া করে। শুধু গুরুবীজ দিলে অসুবিধা এই যে, গুরুর দেহান্তে শিষ্য (তেমন উন্নত না হইলে) গুরুতে মনুষ্যবোধ প্রবল থাকে বলিয়া গুরুবীজজপে মনে তেমন ভরসা পায় না কিন্তু দেবতা নিত্য বিরাজমান এ ধারণা সকলেরই থাকায়, দেবতার মন্ত্রজপে ভরসা বেশী পাওয়া যায়।

আমি ও রজনীদাদা আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার পর জানকীদাদা আশ্রমে পৌঁছেন। রাত্রিতে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, আমাদের গুরুভ্রাতা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (বর্তমানে ষ্টেটস্ কমিশনার) সুবিদ্বান্ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর পট্টনায়ক, যিনি শ্রীগুরুদর্শন করিতে আসিয়া আশ্রমে ছিলেন, প্রাতে পরেশনাথ মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বাবার সমক্ষে বিশ্বেশ্বর দত্ত দাদা সেই সম্বন্ধে পট্টনায়ক দাদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলেন, "সেখানকার (জ্ঞানগঞ্জস্থ ঋষিগণের) আদেশ—আমার শিষ্যেরা যেন কোনও জৈনমন্দিরে না যায়।" দেবতামন্দির এবং প্রসাদ-সম্বন্ধে বাবা কোনও রূপ সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিতেন না। তবে জৈনমন্দির সম্বন্ধে এই আদেশ কেন একথা বহুদিন ভাবিয়াছি। জৈনরা নাস্তিক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হয়, এইজন্য কি? বৌদ্ধেরাও বেদবিরোধী বলিয়া নাস্তিক গণ্য হয়। তবে বুদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার এবং মহাযান মত হিন্দু তান্ত্রিক মতের অতি সন্নিকট বলিয়া বোধ করি বৌদ্ধমন্দিরে আমাদের প্রবেশ-সম্বন্ধে তেমন নিষেধ নাই। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রেও "ন গচ্ছেদ্ জৈনমন্দিরম্" এই নির্দেশ আছে।

৮ই বৈশাখ তারিখে বাবার সমক্ষে প্রেতাত্মাদের প্রসঙ্গ উঠে। আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রেতাত্মার আবেশ সম্বন্ধে কয়েকদিন পূর্বে বিলাতে একটা মানহানির মোকদ্দমা হইয়াছিল। জজ বা জুরী কেহ প্রেতাত্মার আবেশে বিশ্বাস করেন নাই। বাবা বলিয়াছিলেন, প্রেতাত্মা আছে বই কি; তাদের আবেশও হয়।

১৮ই বৈশাখ (খ্রীঃ ১।৫।৩২) রবিবার প্রাতে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন

করিতে গিয়া কুঞ্জ ঘোষদাদার সাক্ষাৎ পাই। কুঞ্জদাদা যেমন কর্মী সেইরূপ সুরসিক অথচ স্পষ্টভাষী লোক ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার সঙ্গ আমার ভাল লাগিত। বাবা (পূর্বে কোনও সময়ে) বলিয়াছিলেন, "কুঞ্জের পরমায়ু মাত্র একচল্লিশ বৎসর ছিল, (কুঞ্জদাদার মুখে শুনিয়াছি তাঁহার কোষ্ঠীতেও ঐরূপ কথা ছিল), ক্রিয়ার ফলে বাড়িয়াছে।" সে যাহা হউক বাবা সেদিন কুঞ্জদাদা এবং আরও অনেক শিষ্যের উপস্থিতিতে বলিতে থাকেন, "যে ধন দেওয়া হইয়াছে তাহাই মূল করিয়া কিছুদিন স্থিরচিত্তে কাজ করিয়া যাও, ফল অচিরেই দেখিতে পাইবে। কিছু কিছু এখনই দেখিতেছ না কি? বাকি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বিড়ালের ঘাড়ে ত হাতীর বোঝা দেওয়া যায় না। যত কর্ম করিবে, তত বেশী দেখিবে। যোগের তুল্য উপায় আর নাই। আর যে কর্ম কর না কেন তাহাতে সংস্কার জন্মিবে এবং তাহার ফলভোগ করিতে আসিতে হইবে। যোগ ভালমন্দ সকল সংস্কার ধ্বংস করিয়া দেয়।"

পুণ্যকর্মের মধ্যে এইদিন বাবা দানের প্রশংসা করেন এবং বলেন, "দানকারী কখনও অর্থাভাবে কষ্ট পায় না। অন্নদান অর্থাৎ ভোজনার্থ যে দান তাহা গরীব-দুঃখীকেই দিতে হয়; অধিক দান সৎপাত্রে দেওয়া কর্তব্য।"

পাপসম্বন্ধেও এইদিন অনেক কথা হইয়াছিল! বাবা পাপ, মহাপাপ, অতিপাপ, ও বিষম পাপ—পাপের এই চারি প্রকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। (যতদূর মনে পড়ে শাস্ত্রে পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক এই তিন প্রকার পাতকের উল্লেখ দেখিয়াছি)। বাবা বলেন পাপ ও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। অতিপাপ ও বিষমপাপের ধ্বংস যোগ ভিন্ন হয় না। এই উপলক্ষে (বোধ করি কোনও শিষ্য বিশেষের উপকারার্থে) বাবা পরপিণ্ড (ধন) প্রত্যাশার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "তোমরা কেহ পরের বিষয়-আশয় ভোগের প্রত্যাশা করিও না। উহা একটি অতিপাপ, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।" দুর্ভাগ্য (বা সৌভাগ্য) ক্রমে আমার তিন কুলে এমন কেহ নাই যাহার প্রত্যাশার যোগ্য বিষয় আছে। কাজেই ঐ উপদেশ কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইবার আমার কোনও কারণ ছিল না; কিন্তু ইহার পরের উপদেশটি নিশ্চয়ই আমার উপকারার্থেই বলা হইয়াছিল। সেটি এই—

কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া কর্মে নিবিষ্ট হওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমি। বাবা, কৃপা হইল সাধ্য, কর্ম সাধন। সাধন শ্লাঘ্য হইলেও সাধ্যের উপর তাহার মর্যাদা দেওয়া চলে না।

বাবা ঐ মতকে আমল দিলেন না। তিনি বলিলেন, কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্মেভ্যো নমঃ। কৃপা সকলের উপরেই আছে—তাহা অজস্র বর্ষিত হইতেছে। কর্মদ্বারা উহা উপলব্ধি করিতে হয়।

কাশীর গিরিধারী লাল ব্যাস দাদার শিশুপুত্র মেয়েদের বসিবার ঘরের দিক হইতে আসিয়া বাবাকে (অবশ্য হিন্দীতে) বলিল, মা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি যে বাবাকে প্রত্যহ ফুল গঙ্গাজল দ্বারা পূজা করেন, বাবা তাহা টের পান কি না।

বাবা। হাঁ, অবশ্য টের পাই।

গিরিধারী দাদার পুত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চলিয়া গেল। যতীশ বসুও একদিন ঐ আশ্রমে (রূপনারায়ণ নন্দন লেনে) বাবাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে বাবা বলেন, "কেন? আজ যে তুমি পদ্মফুল দিয়া আমার পূজা করিয়াছ তাহা কি আমি জানি না?" অন্য যতীশ দাদাও উপস্থিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গ্রহণ করিলেন বা করিলেন না তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব?"

বাবা। তোমাদের বুঝিবার ত কোনও প্রয়োজন নাই। আমি পাইলেই হইল।"

জানকীদাদা। আমাদের যে পূজা সেটা ত কতকটা খেলাধুলার মত। ও ত ঠিক পূজা হয় না। উহাতে কোনও ফল হয় কি?

বাবা। অবশ্য হয়।

২৫শে বৈশাখ রবিবার (খ্রী: ৮।৫।৩২) অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে আশ্রমে কুমারীভোজন হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্বে (১১ই বৈশাখ তারিখে) গুরুভ্রাতা রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ পাবনা হইতে (ইনি তখন তথাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট) বাবার সেবার্থ কয়েক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট দধি পাঠান। উহা পাইয়াই বাবা যোগেশদাদাকে আদেশ করেন, "বারটি কুমারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে তাহাদিগকে এই দধি ও তৎসঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করাও।" যোগেশদাদা কৃতকর্মা লোক; তৎক্ষণাৎ বাবার আদেশ প্রতিপালিত হইল। কোনও ভাল বস্তুই বাবা অগ্রে দ্বারা কুমারীভোজন না করাইয়া গ্রহণ করিতেন না।

৩১শে বৈশাখ শনিবার (খ্রী ১৪।৫।৩২) আফিস হইতে আশ্রমে যাই। অনেক গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। রাস্তায় কোনও একটা লোক বাঁশীতে একটা গান বাজাইতেছিল, সুরটা ভাল।

বাবা। (আমাকে) তুমি বাঁশির গান শুনিতে পাইতেছ?

আমি। হাঁ, বাবা।

বাবা। জানকীর বোধ করি এতক্ষণে চক্ষে জল আসিল। (জানকীদাদা একটু ভাবপ্রবণ লোক।)

উপস্থিত সকলে হাসিলেন।

জানকীদাদা। আচ্ছা, আমি জোড়াবাগান কোর্টে আছি। ইচ্ছা হইল

বাবার কাছে আসি, কিন্তু কাজের বাধায় আসিতে পারিলাম না। তখন য
আমার চক্ষে জল আসে সেটা কি মন্দ? তা'তে কি কোনও উপকার হয় না?

বাবা। যদি বাবা বলিয়া সত্যই তেমন টান হয়, তাহা হইলে সেখা
থাকিবে কেন? সব ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। আসলে তেমন টান
হয় না; সে অবস্থায় চোখের জল ফেলাতে কি গুণ আছে? আর তা'তে
উপকারই হইবে?

কীর্তনাদি শ্রবণে ভক্তদের অশ্রুপাতের কথা উঠিল।

বাবা। কীর্তনে বিরহ ইত্যাদির গান শুনিয়া যে চক্ষে জল আসে তাহা
আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয় বিশেষ নাই। নিজের যে বিরহ ইত্যাদির অভিজ্ঞ
আছে উহাই রাধা ইত্যাদিতে আরোপ করিয়া তাহারই উপভোগ হয় মাত্র
তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাধার আবার বিরহ কি রে বাপু? শ্রীকৃষ্ণে
শক্তিরূপে রাধা তাঁহার সহিত নিত্যযুক্তা। কীর্তনের যে যে ভাবে লোকে কাঁ
তাহা পদকর্তাদের মনের সৃষ্টি। ভাবপ্রবণতায় প্রকৃত লাভ বা উপকার কিছু
হয় না, বরং মন দুর্বল হয়।

এইদিন কাশীর আশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত ভূষণদাদার * প্রেরিত একখা
চিঠি আসে। তাহার মধ্যে টাইপ করা ইংরাজি একখানি চিঠি ছিল।
চিঠিখানি কাশীর টেলিগ্রাফ অফিস হইতে আসিয়াছিল। মর্ম এইরূ
'মহাশয়, সঙ্গে যে তারের খবরটির (cable) নকল পাঠাইলাম উহা অষ্ট্রিয়া হই
কেহ পাঠাইয়াছে। চিঠিতে যেরূপ কাতর আবেদন আছে তাহা আপনার বি
বিবেচনাযোগ্য।' তারের খবরটি দেখিলাম অষ্ট্রিয়া হইতে একটি বালিক
প্রেরিত, নামটি টুকিয়া আনি নাই। খবরে লেখা ছিল, 'এই cable কাশী
টেলিগ্রাফ অফিসে পাঠাইলাম। টেলিগ্রাফ মাষ্টার যেন উহা কাশীর সর্বশ্রে
ও সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত যোগীকে পাঠাইয়া দেন এবং আবশ্যক হইলে তরজ
করিয়াও দেন। হে যোগিবর, আমার মাতা Sarcoma ব্যাধিতে পীড়িত হই
মৃতপ্রায়। হয়ত তিনি আর কয়েকদিনমাত্র বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার বয়স
তিনি পরম সুন্দরী (so young, so beautiful)—তাঁহার এই পরিণাম।
নতজানু হইয়া প্রার্থনা করি আপনি তাঁহাকে আপনার আশীর্বাদ (thought
প্রেরণ করুন। যদি দয়া করিয়া আপনি আসেন তাহা হইলে তাহার ব্য
দিতে হইবে জানাইবেন। আমি জানি আপনি ইচ্ছা করিলেই নিকটে আসি
পারেন বা দূর হইতেও তাঁহাকে কৃপা করিতে পা...'

চিঠি ও তারের মর্ম অবগত হইয়া বাবা অনেকক্ষণ কিছু বলেন নাই। প
বলিলেন, "এ চিঠি ভূষণ কেন রাখিল এবং কেন আমাকে পাঠাইল?" ইহার ক

* ভূষণচন্দ্র বসু দাস; বিপত্নীক বৃদ্ধ, বাবারই শিষ্য। ইঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু পরে লিখিত হই

রে তিনি একবার ক্রিয়ার গৃহে যান, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার বলেন, ভূষণ কেন এ চিঠিটা রাখিল ?"

আমি। বাবা, মেয়েটি বড় কাতর প্রার্থনা করিয়াছে বলিয়াই টেলিগ্রাফ াষ্টার "কাশীর শ্রেষ্ঠ যোগী" বলিয়া আপনাকে উহার নকল পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বাবা কোনও উত্তর দিলেন না। এই সময়ে তাঁহার বৈকালিক ভ্রমণের গাড়ী (বাবা এই সময়ে এবং ইহার পরেও অনেকদিন বিলাসীপাড়ার নৃপেন্দ্রদাদার মোটরে বেড়াইতে যাইতেন) আসাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। কাশীর প্রিয়গোপাল দাদা এইদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরাতন শিষ্য, বাবার সঙ্গও হুকাল করিতেছেন। তিনি এবং ঐরূপ যাঁহারা বাবাকে বেশী দিন যাবৎ দখিতেছেন তাঁহারা বলিলেন, 'মেয়েটির কাজ হইয়াছে; তার প্রার্থনা বাবার স্পর্শ করিয়াছে। নচেৎ কি বারবার ঐরকম কথা বলেন? প্রতিকার থাকিলে তিনি অবশ্যই কিছু করিবেন।' আমারও মনে হইয়াছিল, যখন একটি কুমারী মেয়ে আবেদন করিয়াছে, তখন এক্ষেত্রে বাবার নিজের কিছু করিবার অনুমতি না থা কলেও তিনি জ্ঞানগঞ্জে নিশ্চয়ই খবর দিবেন।

প্রিয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা এই সময়ে একটি কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতায় ছিলেন। তিনি কন্যাটির জন্য পাত্র অনেক দিন ধরিয়া খুঁজিতেছিলেন কিন্তু কৃতকার্য না হইয়া শেষে বাবাকে এ বিষয়ে পত্র লিখেন। বাবা তাহার উত্তরে জানান, "কাশীতে থাকিলে বিবাহের চেষ্টা ভাল চলিবে না, কলিকাতায় যাও।" সেইজন্য প্রিয়দাদা অবিবাহিত দুইটি কন্যা সহ কলিকাতায় আসেন এবং আসিয়াই এক পাত্রের সন্ধান পান এবং সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলেন, এমন কি কয়েক দিনের মধ্যেই—২রা জ্যৈষ্ঠ—বিবাহ হইয়া যায়। ৩রা জ্যৈষ্ঠ (খ্রীঃ ৭।৫।৩২) দশহরা উপলক্ষে আফিস ছুটি ছিল বলিয়া প্রাতেই বাবার কাছে যাই; গিয়া শুনিলাম, রাত্রি প্রভাতে বাবার প্রাতঃভ্রমণে যাইবার পূর্বেই প্রিয়দাদা কন্যা ও জামাতাকে আনিয়া বাবাকে প্রণাম করাইয়াছেন। বাবা আমাদের নিকট বরটির প্রশংসা করিলেন। মেয়েটি সর্বদা বাবার নিকট আসিত। বাবা বলিলেন, "দেখিলাম, সেটি আর নেই।" বাবা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন কুমারী কন্যার মধ্যে মহামায়ার যে বিকাশ থাকে বিবাহ হওয়া-মাত্র সেটি অন্তর্হিত হইয়া যায়। এইদিন বাবা বিবাহের পূর্বে ভাবী বর-কর্তৃক কন্যা দেখার, এমন কি বরের বন্ধুদেরও দলবদ্ধ হইয়া কন্যা দেখিতে যাওয়ার যে প্রথা এখন প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার অত্যন্ত নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "পরমাণুর স্বভাবমতে উহা অত্যন্ত গর্হিত প্রথা। উহার ফল কখনই ভাল হয় না।"

এইদিন আমি আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার পর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার বি. সি. চট্টোপাধ্যায় বাবাকে দর্শন করিতে আসেন। শ্রীযুক্ত জানকীদাদা উপস্থিত

ছিলেন। চ্যাটার্জী সাহেব এ পর্যন্ত তিন-চারি দিন কেদার ভৌমিকদাদার সঙ্গে বাবার কাছে আসিয়াছেন। তাঁহার একটি পুত্রের মস্তিষ্ক সুস্থ নহে। ইচ্ছা—বাবা যদি প্রতিকার করেন। বাবা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানগঞ্জে চিঠি পাঠাইয়াছেন এইরূপ শুনিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এই দিন চ্যাটার্জী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে নিজেরই খেয়াল বশে বাবা বিজ্ঞানের কথা বলিতে থাকেন এবং সম্মুখে স্থিত কতকগুলি বেলফুল হইতে একটি হাতে নিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে স্ফটিকে পরিণত করেন। ইহার পর বায়ুবিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া চ্যাটার্জী সাহেবেরই হস্তে স্থিত একটি খালি কৌটায় (পূর্বে বর্ণিত উপায়ে) অনেকটা সন্দেশ প্রস্তুত করেন। চ্যাটার্জী সাহেব বন্ধুদিগকে দেখাইবার জন্য স্ফটিকটি চাহিয়া লইয়া যান। সন্দেশও কতটুকু নিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর বাবা বলেন, "ওকে বিজ্ঞানের খেলা কিছু দেখাইলাম। এজন্য আমাকে কয়েকটি কুমারী খাওয়াইতে হবে। লোকটির সংস্কার ভাল। এই সব দেখিয়া ধর্মপথে প্রবৃত্তি জাগিতে পারে।"

পরদিন ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীবাবা পুরী চলিয়া যান। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া বাবাকে প্রণাম করি; আরও বহু গুরুভ্রাতা গিয়াছিলেন। বাবার সঙ্গে দুর্গাকান্তদাদা, যোগেশদাদা, কুঞ্জদাদা ও করালীদাদা পুরী যান। করালী দাদার নাম ইতঃপূর্বে করা হয় নাই। ইঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা পূর্ব হইতে বাবার শিষ্য ছিলেন কিন্তু ইনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়া স্বামী সারদানন্দ হইতে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম স্বামী দুর্গেশানন্দ, পূর্বাশ্রমের নাম করালীচরণ মুখোপাধ্যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে তাহার অল্পকাল পূর্বে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়িয়া আসিয়া বাবার নিকট দীক্ষা নেন, এবং তদবধি আশ্রমে থাকিয়া বাবার সেবায় রত থাকেন। সুস্থ ব্যায়ামপুষ্ট দেহ; মেজাজটি ভাল। কয়েকটি আসন পূর্ব হইতেই অভ্যস্ত ছিল। বাবার আশ্রয়ে আসিবার পর ক্রিয়াদি সোৎসাহে করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবার পুরীযাত্রার পর কিছুদিন তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই; আমিও ১৮ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত তাঁহার নিকট কোনও পত্র লিখি নাই। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার (খ্রী ৩০।৫।৩২) আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া আমার স্ত্রীর মুখে শুনিতে পাই ঐদিন বেলা ৩টার সময় আমাদের বাসায় আহ্নিকের গৃহের দরজায় কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া বাবার গাত্রগন্ধ স্পষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। শুনিয়া প্রতীতি হইল এতদিন পত্র দ্বারাও যে তাঁহাকে প্রণাম জ্ঞাপন করা হয় নাই এবং তাঁহার শ্রীচরণকুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করা হয় নাই ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদির জন্য মনটা খুবই খারাপ ছিল, তজ্জন্য ক্রিয়াকালে চিত্তের বিক্ষেপও অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮ই জ্যৈ

তারিখে বাবাকে প্রণাম জ্ঞাপনের অবসরে চিত্তের উদ্বেগের কথা উল্লেখ করি। এ পত্রের কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। ৪ঠা আষাঢ় জানকীদাদা বলেন, বাবা তাঁহার এক পত্রের উত্তরে তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, আশ্রমে গরমের দরুন সকলের কষ্ট হইতেছিল বলিয়া তিনি ৺বিমলাদেবী ও ৺জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে মা বিমলা, হে জগন্নাথ, যদি কাল হইতে বাতাস না হয়, তাহা হইলে এখানে আর থাকা হইবে না, কালই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইব।" পরদিন সকাল হইতেই খুব বাতাস বহিতে থাকে। বাবা লিখিয়াছেন, আশ্রমস্থ সকলেই এখন ভাল আছে এবং বলিতেছে এখন আর পুরী ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

এই সময়ে আমি শ্রীকুলদা ব্রহ্মচারি-লিখিত "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ"-নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলাম। তাহাতে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। আশা করি অন্যেও উহাদ্বারা উপকৃত হইবেন।

(১) "গুরুকে বিশ্বাস করা কি সহজ? যিনি গুরুকে বিশ্বাস করেন তিনি ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি প্রলয় করতে পারেন।" উপদেশটি পড়িয়া আমার মনে পড়িল আমার ভ্রাতার মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার গুরু বাবা গম্ভীরনাথের একটি উগ্র সাধনশীল শিষ্য একবার (সম্ভবতঃ হৃদয়ের শুষ্কতায় পীড়িত হইয়া) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাতেই ত আমার বিশ্বাস হয় না।" তাহাতে শ্রীগম্ভীরনাথ বলেন, "বিশ্বাস হইলে ত সবই হইয়া গেল।" শ্রীশ্রীবাবার আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার কত অলৌকিক শক্তির কথা শুনিতেছিলাম, কত বা প্রত্যক্ষই করিতে-ছিলাম। তথাপি দৃঢ় বিশ্বাসবলে তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিতেছিলাম কই? হৃদয়ের এই শোচনীয় হীনতা পদে পদে অন্তরকে পীড়িত করিতেছিল; ভাবিতেছিলাম, যদি বিশ্বাসের দৃঢ়তা চরমসিদ্ধির পূর্বে না হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, দিল্লী এখনও বহুদূর। বাবাও বলিতেন—তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্বাস থাকে।

(২) "সদ্‌গুরুর আশ্রয় যাঁহারা পেয়েছেন, তাঁহারাই নিরাপদ্ হয়েছেন; সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলে কোনও ভয়ই থাকে না।" গোস্বামী প্রভুর এই কথাটি বড়ই আশাপ্রদ। কিন্তু পাছে আমরা আত্মোন্নতিতে নিশ্চেষ্ট হই, বোধ করি সেই সম্ভাবনায় শ্রীশ্রীবাবা কখনও স্পষ্টভাবে এরূপ আশ্বাস দেন নাই।

(৩ "সদ্‌গুরু লাভ কি এতই সহজ?...একমাত্র ভগবানের কৃপায়ই সদ্‌গুরু লাভ হয়। সদ্‌গুরুলাভ হ'লে তাঁরা আর কোনও অবস্থা হ'তেই পতিত হন না। তবে কর্ম কাটাবার জন্য তাঁদের অবস্থা কিছু কালের জন্য চেপে রাখা প্রয়োজন হ'তে পারে। নষ্ট কখনও হয় না।"

(৪) "সাধন না ক'রে, কেবল গুরু করবেন, গুরু করবেন বল্‌লে কিছু হবে না।

...যতকাল অহঙ্কার আছে, পুরুষকার আছে, ততকাল গুরু করবেন বললে চলবে না। নিজেরা খাট, নিজেরা না খাটলে কিছুই হবে না। কেহ সাধ্য মত খাটলেই গুরু তাকে সাহায্য করেন।”

বাবা এই চতুর্থ উপদেশের অনুরূপ আদেশই সর্বদা আমাদিগকে করিতেন। পাছে এই আদেশ দুর্বল হয় অর্থাৎ আমরা অলস পরিতৃপ্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়ি, সেই সম্ভাবনা স্মরণ করিয়াই দ্বিতীয় তৃতীয় উপদেশের অনুরূপ কথা প্রায় বলিতেন না।

শ্রীশ্রীবাবার পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ তথায় যান। আমি ২রা জুলাই যাইব ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার তৃতীয় পুত্র উহার কয়েকদিন পূর্বে ফুটবল খেলিতে খেলিতে হাতে কঠিন আঘাত পায়। তৎপরেই সে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইয়াছিল। তথায় তাহার হাত X-ray দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, অস্ত্রোপচার করিয়া কনুইয়ের একখানি ভাঙ্গা হাড় বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। ৫ই জুলাই ঐ অস্ত্রোপচার হইবে এইরূপ কথা ছিল। শ্রীশ্রীবাবাকে সকল কথা পত্রে নিবেদন করাতে তিনি সেখানে গোপীনাথকে বলিয়াছিলেন, “অস্ত্রোপচার করিতে হইবে না, অমনিই ভাল হইয়া যাইবে।” ঐ মর্মে তিনি আমাকে একখানি পত্রও লিখেন, কিন্তু তাহা পাইবার পূর্বে অস্ত্রোপচারে বিলম্ব হইবে ডাক্তারদের এইরূপ মত শুনিয়া আমি ৪ঠা জুলাই (২০শে আষাঢ়) পুরী যাত্রা করি। পরদিন রথযাত্রা ছিল, তদুপলক্ষে আশ্রমে পঁচিশ-ত্রিশটি কুমারীভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি বাবার সেবার জন্য অন্যান্য কয়েকটি জিনিষের সঙ্গে কিছু পাঁপড় নিয়া গিয়াছিলাম। বাবা তুষ্ট হইয়া উহা তৎক্ষণাৎ কুমারী সেবায় নিয়োগের আদেশ দেন। আমি পুরীতে থাকিতে থাকিতে আশ্রমে চারিদিন কুমারী ভোজন হইয়াছিল।

গোপীনাথের সঙ্গে আমাদের দুইটি গুরুভ্রাতাও এই বৎসর পুরী গিয়াছিলেন। একজন হইতেছেন শ্রীযুক্ত মুকুন্দ শাস্ত্রী এবং আর একজন শ্রীমান্ সুরেশ দেব। সুরেশের নাম পূর্বে প্রসঙ্গান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। মুকুন্দ শাস্ত্রী কাশীর হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপক। ইনি কিছুকাল পূর্বে কোনও একখানি প্রাচীন পুঁথিতে পারদ ঘনীভূত করিবার একটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখিয়া সেই প্রক্রিয়া অবলম্বনে পারদ দ্বারা একটি শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহা তিনি প্রত্যহ পূজাও করিতেছিলেন এইবার পুরীতে কথা প্রসঙ্গে সেই কথা শ্রীশ্রীবাবাকে বলা হইলে বাবা শিবলিঙ্গটি দেখিতে চান এবং দেখিয়া বলেন জিনিষটি সম্পূর্ণ ঠিক হয় নাই। তৎপর তিনি লিঙ্গটি করতলে নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন, “এটি খেয়ে ফেল্‌ব ? খেয়ে ফেল্‌ব ?” মুকুন্দ শাস্ত্রী লাজুক ও গম্ভীর লোক ; তিনি যে কারণেই হউক প্রথমে কিছু বলেন নাই, কিন্তু বাবা ঐ কথা

পুনর্বার বলাতে তিনি বলিলেন, "ফেলুন" ; আর অমনি বাবা তাহা নিজের মুখে ছুঁড়িয়া দিলেন। সুরেশ ও গোপীনাথ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল আমার পুরী পৌঁছিবার পূর্বে। আমি যেদিন পুরীতে পৌঁছি, ঐ দিনই গোপীনাথ সুরেশ ও মুকুন্দ শাস্ত্রীসহ কলিকাতায় রওনা হইয়া আসেন। উক্ত ঘটনাটির বিবরণ আমি পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সুরেশ ও গোপীনাথ উভয়ের মুখে শুনিয়াছি। সে যাহা হউক পারদ-লিঙ্গটি স্বীয় মুখে ফেলিয়া দিবার পর বাবা স্বীয় মস্তক দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "উহা এইখানে রহিল।" বাবার মস্তকে আরও একটি শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম ছিল ইহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাবা মস্তক নাড়িলে তথায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনা যাইত একথা শ্রীযুক্ত যোগেশ বসু দাদা ও ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে" স্ব স্ব লিখিত বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন।

পরে এক সময়ে শুনিয়াছিলাম বাবা অনেকদিন পরে স্বীয় মস্তক হইতে মুকুন্দ শাস্ত্রী দাদার পারদ লিঙ্গটি বাহির করিয়া কাহাকেও কাহাকেও দেখাইয়াছিলেন। তখন উহা আকারে একটু ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বলতর দেখা যায়। ঐরূপ পরিবর্তনের কারণ বাবা বলিয়াছিলেন যে, উহার মধ্যে যে সামান্য খারাপ পরমাণু ছিল উহা চলিয়া গিয়াছে।

মুকুন্দ শাস্ত্রীদাদার নিকট হইতে লিঙ্গটি ঐরূপে নেওয়ার কারণ এইরূপ অনুমিত হয় যে, পারদ একটি অতি তেজঃসম্পন্ন ধাতু ; ঐ ধাতুতে প্রস্তুত লিঙ্গ পূজা করিবার অধিকারী বোধ করি সকলে নয়, অনধিকার পূজায় অকল্যাণ হওয়াই সম্ভব। লিঙ্গটি শাস্ত্রীর কাছে থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে প্রত্যহ তাহা পূজা করিতে হইত ; অপূজিত লিঙ্গ গৃহে রাখিতে নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই অনুমান আমার। বাবাকে এ বিষয়ে কখনও প্রশ্ন করি নাই।

সে যাহা হউক, আমি পুরী আশ্রমে পৌঁছিলেই শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আমাকে বলেন, "আপনি আসিতে পারিবেন না শুনিয়া আশ্রমস্থ সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন।" পুরী আশ্রমে তখন কুঞ্জদাদা, রায়সাহেবদাদা, যোগেশদাদা, প্রকাশ ঘোষদাদা, বিধুদাদা প্রভৃতি অনেক গুরুভাইই ছিলেন। বাবা বলিলেন, "তোমার ছেলের অপারেশন দরকার হবে না।" আমি বাবার দয়া ও স্নেহে এবং গুরুভাইদিগের ভালবাসায় মুগ্ধ ও কৃতার্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অযোগ্যতাবোধে মনে মনে কতকটা পীড়িত হইয়াছিলাম। যথাকালে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে রথযাত্রাদর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তৎপর ২৫শে আষাঢ় তারিখে প্রাতে তাঁহার সঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন করিয়াছিলাম। এইরূপে এইবার দুইদিন একসঙ্গে গুরু ও গোবিন্দ দর্শন অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। ছেলের অস্ত্রোপচার-সম্বন্ধে বাবা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সত্য হইয়াছিল।

২৫শে আষাঢ় বিকালে শ্রীশ্রীবাবা সহ আমরা আশ্রমস্থ সকল গুরুভ্রাতা কটকে যাই। কটকের সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত চিন্তামণি আচার্য দাদা ইনি সম্প্রতি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছেন। রথযাত্রার দিন সস্ত্রীক পুরীতে আসিয়া বাবাকে একবার তাঁহার গৃহে পদার্পণ জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন এবং আমাদিগের প্রত্যেককে বাবা সহ যাইবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ করেন। নির্দিষ্ট দিনে চিন্তামণি দাদা সকলকে লইয়া যাইবার জন্য স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। সকলের জন্যই দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গাড়ীতে খুব ভিড় হইলেও শ্রীশ্রীবাবার জন্য বসিবার একটু স্থান করিতে পারা গিয়াছিল। সন্ধ্যা হইলে বাবা গাড়ীতে একটু গঙ্গাজল ছিটাইয়া বেঞ্চে বসিয়াই সংক্ষেপে আহ্নিক কার্য সমাপন করিলেন। কোনও অবস্থায়ই বাবার আহ্নিকের সময় আলস্যে বা অন্যকার্যে অতিক্রান্ত হইতে পারিত না। আমরাও যে যে ভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ছিলাম সে সেই ভাবেই (নিম্নতম নির্দিষ্ট সংখ্যায়) নিত্যজপ করিয়াছিলাম।

কটকে আমরা ২৯শে আষাঢ় পর্যন্ত ছিলাম। এ কয়দিন চিন্তামণি দাদা ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে বাবার সেবার ত কথাই নাই, আমাদেরও যেরূপ অভ্যর্থনা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার আন্তরিকতায় আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কটকের গুরুভাইরাও সকলেই এই কয়দিন মধ্যাহ্নে চিন্তামণিদাদার গৃহে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। একদিন সবিশেষ ভক্তি ও ব্যগ্রতা সহকারে আহূত হইয়া শ্রীশ্রীবাবা কটক হইতে সতের মাইল দূরবর্তী একটি গ্রামে তাঁহার স্বর্গত ভক্তিমান্ শিষ্য অনন্ত দাসের গৃহে মোটর গাড়ীতে গমন করেন। অনন্ত দাসের পুত্র ঈশ্বর দাস এই বৎসরই পুরীতে বাবা হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি আবার চিন্তামণিদাদার জ্যেষ্ঠ জামাতা। ঈশ্বরদাদা আবার অভ্যর্থনার্থ স্বগৃহে পৌঁছিবার পথে বহুদূর পর্যন্ত কতকগুলি পত্রসজ্জিত তোরণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস; তাঁদের পত্নী ও কন্যাগণ আসিয়া বাবাকে পদ্মপুষ্প দ্বারা অঞ্জলিদান করেন; তাহাতে বাবার কোমর পর্যন্ত পদ্মপুষ্পে ঢাকা পড়ে। বাবা বেলা ৬টায় ৺অনন্ত দাসের গৃহে গমন করেন, এবং ৯টাতেই ফিরিয়া কটকে আসেন। পুরী হইতে যাঁহারা কটকে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক আমি ভিন্ন সকলেই বাবার সঙ্গে অনন্ত দাসের গৃহে গিয়াছিলেন। মোটর গাড়ীতে চড়িলে আমার মাথা ঘোরে বলিয়া আমি যাই নাই। কটকে বাবা শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রদাদা ও লক্ষ্মীধর মহান্তিদাদার গৃহেও কিয়ৎক্ষণের জন্য পদার্পণ করেন। কটকের শিষ্যশিষ্যাগণের গুরুভক্তির পরিচয় পূর্ব বৎসরেই কটক রেলওয়ে ষ্টেশনে পাইয়াছিলাম। এবার আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়া চমৎকৃত এবং কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

কটক হইতে ফিরিবার দিন গাড়ী ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা ষ্টেশনে আসিয়াছিলাম। বাবা গাড়ীতে বসিয়া চিন্তামণিদাদার সঙ্গে নানা কথা বলিতেছিলেন। চিন্তামণিদাদার মূর্ছার ব্যারাম ছিল; বোধ করি সেই প্রসঙ্গই হইতেছিল। আমি ঐ গাড়ীতেই ছিলাম, কিন্তু মৃদু স্বরে কথিত হওয়ার দরুন ঐ সকল কথা শুনিতে পাই নাই। প্রকাশ দাদাও ঐ গাড়ীতে একটু ব্যবধানে বসিয়াছিলেন, তিনি কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তত মনোযোগ দেন নাই। পরে নিজের নাম শুনিতে পাইয়া মনোযোগ দেন। তিনি বলিলেন, বাবা চিন্তামণি দাদাকে চিন্তা করিতে মানা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের সকলের কথাই আমি সর্বদাই ভাবি। এই দেখ প্রকাশের স্ত্রী; তার শরীর কত খারাপ, সর্বদা আমি চোখে চোখে রাখি। পুরীতে সাথে আনিয়াছি, কাশীতেও যাইতে বলি। যদি এ ভাবে না রাখিতাম তাহা হইলে এতদিন ধুলায় মিশিয়া যাইত। এরা ভাবে বাবার সাথে থাকিয়া বাবারই উপকার করি।" প্রকাশদাদার মুখে শুনিয়াছি—বাবা তাঁহার স্ত্রীকে একবার কাশী যাইতে বলেন, সেবার কি কারণে তাঁহার যাওয়া সম্ভব হয় না। তার পর তাঁহার ভয়ানক জ্বর হয়, এবং অবস্থা খুব খারাপই হয়। বাবাকে সে সংবাদ দেওয়া হইলে বাবা খুব রাগ করেন; বলেন, "ভাল উপদেশ দিলে শুনবে না, এখন যা খুশী করুক।" পরে তাঁহার কৃপায়ই দিদি সুস্থ হন। দিদি বাবার কৃপায় টিকিয়া ছিলেন। তিনি বাবার সঙ্গে পুরী বা কাশী গেলে বাবার সেবাও খুব করিতেন।

প্রকাশদাদার কথা শুনিয়া মনে হইল, ইতঃপূর্বে একদিন বাবা প্রকাশদিদি ও আমার স্ত্রীর সম্মুখে নিজের শরীরসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "শরীর আমার কি করে ভাল থাকবে? আমার এতগুলি মেয়ে, কিন্তু বাবার দিকে কে তাকায়?" বাবা উঠিয়া গেলে প্রকাশদিদি বলেন, 'বাবার সেবা ত যখন পারি করি। এবার শরীরটা তত ভাল ছিল না, তাই বাবার কাছে যাইতে পারি নাই।' বাবার কাছে যাওয়া যে বাবার জন্য নয়, সেদিন বাবার কথার ভঙ্গীতে তাহা প্রকাশদিদি বা আমার স্ত্রী কেহই বুঝেন নাই। চিন্তামণিদাদার সহিত বাবার ঐ দিনের আলাপ শুনিয়া বুঝা গিয়াছিল, বাবার সেবায় উপকৃত প্রকৃত পক্ষে হয় কে।

২৯শে আষাঢ় (খ্রীঃ ১৩।৭।৩২) আমরা কটক হইতে পুরী ফিরিয়া আসি। ৩০শে আষাঢ় কলিকাতার সিদ্ধেশ্বর সিংহ নামক একটি যুবকের দীক্ষা হয়। ইনি জাতিতে তাম্বুলী; বড়বাজারে (সোনাপট্টিতে) ইঁহার একখানি সোনারূপার দোকান আছে। দীক্ষার পরে ইঁহার ও করালী দাদার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি বাবার খবর কোথায় পাইলেন?"

সিদ্ধেশ্বরদা'। (করালীদাদাকে দেখাইয়া) ইঁহার কাছে। ইনি আমার পরম উপকার করিয়াছেন।

আমি। করালীদাদার সহিত আপনার পূর্ব হইতে পরিচয় ছিল বুঝি?

সিদ্ধেশ্বরদা'। না ; আমার অদৃষ্টগুণে হঠাৎ পরিচয় হয়। তিনবৎসর পূর্বে ইনি আলমোড়া হইতে কাশী আসিতেছিলেন, আমি দেরাদুন যাইতেছিলাম। কাঠগুদাম ষ্টেশনে আমি ওঁদের গাড়ীতে উঠিয়া পড়ি। আমি তাহার পূর্বে অনেক দিন যাবৎ পেটে একটা ব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলাম। কলিকাতার সকল শ্রেষ্ঠ ডাক্তার—যথা নীলরতন সরকার, কর্ণেল কে. কে. চ্যাটার্জী, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র—সকলে একসঙ্গে আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা দেন, অপারেশন ভিন্ন গতি নাই। আবার তাঁহারাই ইহাও বলেন, অপারেশনের ফলও অনিশ্চিত, এরূপ অপারেশনে শতকরা ৮ জন বাঁচিয়া থাকে। আমি ঠাণ্ডা জায়গায় থাকিলে একটু ভাল থাকিতাম বলিয়া নৈনিতাল ইত্যাদি স্থানে গরমের সময় থাকিতাম। এইরূপে এই এই ব্যারামে আমার পাঁচ হাজার টাকার মত খরচ হইয়া গিয়াছে। সেদিন কাঠগুদামে গাড়ীতে উঠিয়া করালী দাদার সন্ন্যাসবেশ দেখিয়া কথায় কথায় ইঁহাকে বলিলাম, শুনিয়াছি কৈলাসের পথে নাকি সাধুরা থাকেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া ঔষধ দিয়া কঠিন কঠিন ব্যাধি উপশম করিয়া দেন। ইহাতে করালীদাদা বলেন, ঔষধের জন্য কৈলাসের পথ পর্যন্ত যাইতে হইবে কেন? কাশীতে আমার পিতার গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস আছেন, তাঁহার কাছে রোগের কথা বলিলে অনেক সময়ে বিনা ঔষধেই রোগ সারিয়া যায়।

বলা বাহুল্য সিদ্ধেশ্বরদাদা করালীদাদার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হন এবং শ্রীশ্রীবাবাসম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তখন কাশীতে আছেন কি না ও তাঁহার ঠিকানা কি তাহা তাঁহাকে (সিদ্ধেশ্বর দাদাকে) দেরাদুনের ঠিকানায় জানাইবার জন্য সিদ্ধেশ্বরদাদা করালীদাদাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং একখানি পোষ্টকার্ডও দেন। যথাসময়ে করালীদাদার পত্র পাইয়া তিনি কাশীতে চলিয়া আসেন এবং ঠিকানা একটু অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া "বিশুদ্ধানন্দ কানন" খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, আশ্রম পাইয়া তিনি বাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিশেষ আর্তি জানাইয়া ঔষধ প্রার্থনা করেন।

বাবা। তুমি আমার নাম কাহার নিকট শুনিলে?

সিদ্ধেশ্বর। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী দুর্গেশানন্দ স্বামীর কাছে। তাঁহার পিতা আপনার শিষ্য।

বাবা। ও! অমুকের ছেলে বুঝি? আমি ত কাহাকেও আজকাল আর ঔষধ দেই না! ঔষধ দিতে হইলে আমাকে আমার গুরুর নিকট লিখিয়া অনুমতি আনিতে হয়।

সিদ্ধেশ্বরদাদা পুনরায় অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা জানাইলে বাবা বলেন, "আচ্ছা চিঠি লিখিয়া দিব। তুমি মধ্যে মধ্যে খবর নিও।"

সিদ্ধেশ্বর। যদি অনুমতি করেন তবে যে কয়দিন কাশীতে আছি, রোজই একবার করিয়া শ্রীচরণদর্শন করিব।

বাবা। আচ্ছা; আসিতে পার।

সিদ্ধেশ্বরদাদা প্রত্যহ বাবার সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন এইভাবে গেলে একদিন বাবা হঠাৎ বসিবার ঘর হইতে উঠিয়া বাগানের দিকে গেলেন। সিদ্ধেশ্বরদাদাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। দয়াময় বাবা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা একটা কাজ করিয়া দেখিও (অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী ও মধ্যমা দেখাইয়া) এই তিন আঙুলে যে কয়টা জোয়ান ওঠে সেই কয়টা জোয়ান রোজ প্রাতে মুখে ফেলিয়া দিয়া এক গেলাস জল খাইও।"

সিদ্ধেশ্বরদাদা আমাকে বলিলেন, "দাদা, বলিব কি, তার পর দিন যেমন বাবার কথামত জোয়ান জল খাইতে সুরু করিলাম, অমনি ব্যথা কোথায় চলিয়া গেল। আজ তিন বৎসর ভাল আছি।"

সিদ্ধেশ্বরদাদা আরও বলিলেন, যেদিন বাবার সঙ্গে তাঁহার প্রথম দেখা হয় সে দিন ডাঃ শোভারামদাদা বাবার কাছে বসিয়া ছিলেন। শোভারাম দাদা এদেশ হইতে এম. বি. পাশ দিয়া বিলাত যান এবং লণ্ডন হইতে ডি. পি. এচ. উপাধি নিয়া আসিয়া কাশীতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারা গুজরাটী ব্রাহ্মণ; কাশীতেই কয়েক পুরুষ আছেন। ইনি বাবার একজন অত্যন্ত ভক্তিমান্ শিষ্য। প্রত্যহ প্রত্যুষে আহ্নিক সমাপন করিয়া ইনি ও ইঁহার স্ত্রী বাবাকে প্রণাম করিতে আসিতেন। আশ্রমে অন্য মেয়েমানুষ না থাকিলে শোভারামদিদি বাবার আহারাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু আয়োজন করিয়া যাইতেন। ইঁহাদের দুইটি কুমারী কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বাবার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পুত্রটিও প্রত্যহ বাবার কাছে আসিত। শোভারামদাদা প্রত্যহ একাধিকবার আসিতেন। আশ্রমের নানা কাজের ভার তাঁহার উপর ছিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন "শোভারাম, তোমরা এটাকে কি ব্যারাম বল?"

ডাঃ শোভারাম। একে duodenal ulcer (অন্ত্রের ক্ষত) বলা হয়।

বাবা। ইহার চিকিৎসা কি?

ডাঃ শোভারাম। এই ব্যারাম জার্মানিতে অপারেশনে কতকটা উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। অন্যত্র ইহার চিকিৎসা নাই বলিলেই চলে।

বাবা। আমরা একমাত্রা ঔষধে এই ব্যারাম ভাল করিয়া দিতে পারি।

ডাঃ শোভারাম। সেই জন্যই ত আপনার কাছে এসেছি।

ব্যারাম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধেশ্বরদাদা বাবার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন এবং তিন বৎসর ঘোরাঘুরি করিবার পর এইবার পুরীতে দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষার জন্য পুরীতে আসিয়া অন্যত্র ছিলেন। দীক্ষার পরে আশ্রমে উঠিয়া আসেন।

আমি পুনর্যাত্রার দিন রথ টান দিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রাণামপূর্বক কলিকাতার দিকে নিজেও পুনর্যাত্রা করি।

মনোমোহন লাল নামে আমাদের এক গুরুভাই তখন ফয়জাবাদে পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। (সম্প্রতি ইনি গুরুধাম গত হইয়াছেন) তিনি ফয়জাবাদ হইতে এক ঝুড়ি আম রেল পার্শেলে হাওড়া পাঠাইয়া দেন। তাঁহার রসিদটিও চিঠির সঙ্গে ডাকে কলিকাতায় আসে এবং এখান হইতে কেহ ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া চিঠিটি পুরীতে পাঠাইয়া দেন। বাবা ঐ রসিদটি আমাকে দিয়া বলিলেন, "আমগুলি তুমি বাড়ী নিয়া যাহা খুশী করিও।" আমি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই পার্শেলটি খালাস করিয়া আনি। কয়েকদিনের গুদাম ভাড়া (demurrage) দিতে হইয়াছিল; ভাবিয়াছিলাম ফলগুলির অধিকাংশই বোধ করি পচিয়া গিয়াছে। কিন্তু পার্শেল খুলিয়া দেখা গেল, দুই-একটি ব্যতীত সব ফল ভাল আছে। আমি তৎক্ষণাৎ পাড়া হইতে ছয়টি কুমারী আহ্বান করিয়া সেই আম ও কিছু সন্দেশ ও রসগোল্লা দ্বারা তাহাদের সেবার ব্যবস্থা করিলাম। তৎপর নিজের পৌঁছখবর সহ সে সংবাদ ডাকে বাবার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। বাবা কলিকাতায় ৩২শে আষাঢ় ফিরিয়া আসেন। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। অবশ্য আরও অনেকে গিয়াছিলেন। যে কয়েকটি আম তাঁহার সেবার জন্য রাখিতে পারিয়াছিলাম তাহা ১লা শ্রাবণ (রবিবার) প্রাতে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। আমার স্ত্রীও ঐদিন বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যান। বাবা তাহাকে দেখিয়াই বলেন, "বেশ করিয়াছিলে; আম দিয়া কুমারী ভোজন করাইয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছিলে।"

স্ত্রী। বাবা, আপনার নাতিরাও খুব খেয়েছে।

বাবা। বেশ করেছে।

চৌদ্দ

কিছুদিন হইতে শ্রীশ্রীবাবার কাছে প্রায়ই একটি গুরুভাইকে বসিয়া থাকিতে দেখিতেছিলাম, বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, নীচেই। কথাবার্তায় অপর সাধারণ হইতে কিছু বিশেষত্ব ছিল বলিয়া ইঁহার পরিচয় জানিবার জন্য আমার ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল। ফলে জানিতে পাই ইনি বিলাতফেরত লোক, আসামে পুলিশ

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, কোনও একটা গুরুতর অপরাধ করায় চাকরি হইতে অপসৃত (suspended) হইয়া আছেন। বাবা যখন বিলাসীপাড়ায় যান, তখন তাঁহার রাজোচিত অভ্যর্থনা দেখিয়া ইনি বাবার সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর নিয়াছিলেন; তাহার পরে বিপদে পড়িয়া বাবার শরণাপন্ন হয়। কৃত অপরাধের জন্য তিনি ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে নিম্ন আদালতে, পরে দায়রায় তাঁহার বিচার হয়। জুরী তাঁহাকে নির্দোষ বলিলেও জজ সে মত গ্রহণ না করিয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমার নথিপত্র পাঠাইয়া দেন। ১৮ই জুলাই (২রা শ্রাবণ) সোমবার হাইকোর্টের জজগণ মোকদ্দমার রায় দেন। তাঁহারা তাঁহাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন। মঙ্গলবার প্রাতে তিনি বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বাবা তাঁহাকে জ্ঞানগঞ্জের একখানি চিঠি দেখান। তাহার মর্ম এইরূপ— "অমুকের অপরাধ গুরুতর; তাহার দ্বীপান্তরেরই সম্ভাবনা ছিল। অনেক চেষ্টায় দণ্ড লঘু করিয়া কয়েকমাস মাত্র কারাদণ্ড করা হইল।" ঐ দিন দ্বিপ্রহরে কুঞ্জ ঘোষদাদা, ইন্দু (মুখো) দাদা এবং আরও কেহ কেহ বাবার মুখে ঐ কথা শোনেন এবং জ্ঞানগঞ্জের চিঠিও দেখেন। আমি ইন্দুদাদার মুখ হইতেই এই বিবরণ পাই।

আমাদের উক্ত ভ্রাতাটি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'জেলে কর্ম কিরূপ করিব?' উত্তরে বাবা বলেন, "কম্বলে বসিয়া জপ করিও।" ইন্দু দাদার মুখে আরও শুনিয়াছি বাবা তাঁহার ঐ শিষ্যটি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "অমুকের চাকরি গেলেও কষ্ট হইবে না; চলিয়া যাইবে।" কারাগার হইতে ফিরিয়া তিনি ভাল রোজগারই করিতেছিলেন শুনিয়াছি। তাঁহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

৭ই শ্রাবণ (খ্রীঃ ২৩।৭।৩২) শনিবার আফিস হইতে বাবার আশ্রমে যাই। শ্রীশ্রীবাবা যথাসময়ে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলে যোগেশদাদা বলিলেন, জ্ঞানগঞ্জ হইতে পরমহংস শ্রীশ্রীউমানন্দ স্বামী বাবাকে এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, "আপনি যে সম্প্রতি এত শিষ্য করিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কি মর্মরমূর্তি-স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা?" এইখানে বলা আবশ্যক যে, এবার বাবা পুরীতে যে কতদিন (কিঞ্চিদূন দুইমাস) ছিলেন তাহার মধ্যে সেখানে মোট সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ জন লোককে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। এত অল্পসময়মধ্যে এত অধিক লোককে তিনি বোধ করি তৎপূর্বে কখনও দীক্ষা দেন নাই। সে যাহা হউক, বাবা নাকি শ্রীউমানন্দ স্বামীর পত্রোত্তরে তাঁহাকে জানান, তাঁহার শ্লেষের (পরিবাদের) উত্তর তাঁহাকে দিবেন না, প্রয়োজন হইলে জেঠা গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ ভৃগুরাম পরমহংসকে দিবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাবা যোগেশদাদাকে আদেশ দিয়াছেন, কোনও নূতন শিষ্য হইতে যেন মর্মরমূর্তির জন্য একটি পয়সাও লওয়া না হয়। যোগেশদাদা এই আদেশে প্রীত হন নাই ইহা বলাই বাহুল্য। নূতন শিষ্য

ঈশ্বর দাস ইতিমধ্যে আড়াইশত টাকা উক্ত উদ্দেশ্যে দিয়াছিলেন এবং সিদ্ধেশ্ব সিংহ একান্ন টাকা দিবেন বলিয়া স্বতঃ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যোগেশদা বলিলেন এই সব টাকা ফেরত দিলে উঁহারা দুঃখিত হইবেন।

৯ই শ্রাবণ তারিখে জানকীদাদা গুরুগীতার একটি শ্লোক বাবাকে বলি তৎসম্বন্ধে অল্প একটু আলোচনা হয়। বাবা নানা কথার মধ্যে বলেন, "শাস্ত্র সব সত্য; তবে শাস্ত্রের মর্ম ঠিক ঠিক বুঝিবার অধিকারী ক'জন আছে? সক অক্ষরার্থ লইয়াই কচ্‌কচি করে। ক্রিয়া করিতে করিতে শাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি ক যায়। ক্রিয়াহীন লোক শাস্ত্র পড়িয়া কেবল অহঙ্কারী হয়। এবং সভায় ব আওড়াইয়া বিদ্যা জাহির করে।"

তৎপূর্বে একদিন শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে বসিয়া ছিলাম। আরও কয়েকটি শি ছিলেন, বিশেষ কথা কিছু হইতেছিল না। হঠাৎ বাবা আমার দিকে মুখ অগ্রস করিয়া বলিলেন, "বচনে কিছু হবার নয়; বচনে কিছু নেই।" শাস্ত্রবচনে আমা গভীর বিশ্বাস না থাকিলেও শাস্ত্র-ব্যাখ্যাশ্রবণের দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল সেইজন্যই শনিবারে শনিবারে পূজনীয় রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের স্থাপি উৎসবসৎসঙ্গে কয়েক বৎসর যাবৎ যাইতেছিলাম। শাস্ত্রজ্ঞান মোটেই গভীর ব্যাপক না হইলেও দুই-চারিটা বচন আওড়াইবার রোগও আমার ছিল। বা বোধ করি ঐ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দ্বারা আমাকে ঐ সকল রুচি ছাড়িয়া কর্ম ভালক আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১০ই শ্রাবণ রজনীদাদা কাছারী হইতে বাসায় ফিরিবার পথে বাবাকে প্রণা করিতে গিয়া শুনিতে পান বাবা বলিতেছেন, "নিজে কর্ম না কর্‌লে কারও কি হয়েছে এমন ত বাপু আমি দেখি নি, শুনিও নি; ইতিহাস পুরাণ হ'তে আমা একটি দৃষ্টান্ত দেখাও যেখানে নিজের কর্ম ছাড়া কারও পরমার্থলাভ হয়েছে। তারপর তিনি বলেন, "চরিত্রটি ঠিক করা দরকার, চরিত্রগঠন, হিংসাত্যাগ, দান একাগ্রতা এইগুলি চাই। মাৎসর্য, ঈর্ষা—এসব ত্যাগ করতে হবে। দান সাধ্যম করবে, সাধ্যের বাহিরে যেতে আমি বলি না।"

ঐ দিনই জানকীদাদা প্রাতে বাসায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, "আমি বাক্যবাগীশ, কিন্তু বুঝি কতটুকু? বাবার কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই, কি বাবাতে নির্ভর করি কতটুকু?" এই ভাবিয়া তাঁহার মনটা কিছু খারাপ হয় বিকালে কাছারী হইতে বিজয় বসু দাদা সহ তিনি শ্রীশ্রীবাবার নিকট গিয় বসিয়াছেন এবং চুপ করিয়াই আছেন; এমন সময়ে বাবা বিজয়দাদার দিকে চাহিয় বলিতে লাগিলেন, "জানকী বক্তৃতায় বেশ পটু, অনেক কথা বলিতে পারে, কি অনুভব নাই।" তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "নির্ভর কই বাপু! তেমনভাবে নির্ভর করতে পারলে ত হ'য়েই যেত।"

জানকীদাদা যখন যাহা ভাবিতেন তাহা গভীরভাবে প্রাণমন দিয়া ভাবিতেন, ...ই বাবা তাহা টের পাইতেন। আর একদিনের কথা জানকীদাদা আমাকে ...লিয়াছিলেন এবং বহু পরে "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপ্রসঙ্গ" পঞ্চম খণ্ডে স্বয়ং লিখিয়াছেনও ...তিনি কাছারী হইতে বাহির হইয়া ভাবিলেন 'বাবার কাছে যাই কি বাড়ী ...ই?' ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্যে শ্যামবাজারের ট্রামে চাপিয়া ...সিলেন। কিন্তু কাজটা ঠিক হইল না বলিয়া মনে বেশ একটু অনুতাপ আসিল। ...ই অনুতাপ শান্ত হইবার পূর্বেই ট্রাম হাতীবাগান অঞ্চলে আসিয়া পড়িল। ...খন তিনি সেই ট্রামেই বসিয়া যেন প্রত্যক্ষ দেখিলেন বাবা রসা রোড দিয়া মাঠের ...কে যাইতেছেন, সঙ্গে অরুণ বসু। এটা অবশ্য তিনি দৃষ্টিভ্রমই মনে করিলেন। ...দিকে বাবা রসা রোড দিয়া যাইতে যাইতে অরুণকে বলিলেন, "ঐ দেখ জানকী ...মে যাইতেছে।" অরুণও রসা রোডেই ট্রামে সেইরূপ দেখিলেন! পরদিন ...নকীদাদা বিকালে বাবাকে প্রণাম করিতে গেলে বাবা বলিলেন, "কাল ট্রামে ...চ্ছিলে না গো?" যোগেশদাদাও বলিলেন, "বাবা একটু আগে বলিতেছিলেন, ...ল জানকীকে ট্রামে দেখেছি, অরুণকেও দেখিয়েছি।" জানকীদাদা ভাবপ্রবণ ...ষ্য, বাবার ঐ কথায় তাঁহার মনোভাব কি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করার চেয়ে ...নুমান করা সহজ।

১৪ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীবাবা দুইদিনের জন্য বর্ধমান যান; সঙ্গে গিয়াছিলেন দুর্গাকান্ত ...দাদা, ইন্দুদাদা, বিধুদাদা ও ফণী মজুমদারদাদা প্রভৃতি। ১৬ই শ্রাবণ তাঁহারা ...রিয়া আসেন। ইন্দুদাদার মুখে পরে শুনিতে পাই—বর্ধমানের কোনও প্রাচীন ...রুভ্রাতা শোকতাপে ও অভাবের তাড়নায় একটু বিভ্রান্ত হইয়া নাকি বলিয়া- ...লেন, বাবা বর্ধমান ইত্যাদি অঞ্চলের পুরাতন শিষ্যগণ অপেক্ষা পরবর্তী কালের ...লিকাতার শিষ্যদিগের প্রতি অনুগ্রহ অধিক করেন। সেইজন্য তাহাদের ...ংসারিক উন্নতিও অধিক হইতেছে। বাবা ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সাধারণভাবে ...লিকাতার শিষ্যদিগের এবং বিশেষভাবে কয়েকটি শিষ্যের গুরুভক্তির প্রশংসা ...রিয়াছিলেন। বাবা বলেন, "দেখ বিধুর স্ত্রীর অভাব কিসের? কত দাস-দাসী ...চক; তবু প্রতিদিন ভোর রাত্রিতে উঠিয়া সে শরীরের অসুস্থতাসত্ত্বেও স্বহস্তে ...মার জন্য নানা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আশ্রমে পাঠাইয়া দেয়।" তারপর বলিতে ...কেন, "আমার কাছে যাহারা মন্ত্র নিয়াছে, তাহারা যদি আর দুষ্প্রবৃত্তির কাজ না ...য়ে, তবে তাহাদের কাহারও দুঃখদুর্গতির কারণ নাই; অনবরত কলহ, ঈর্ষা এবং ...ন্য সকল দুষ্কর্ম ছাড়িয়া দেও, রোজ এ-বেলা আধ ঘণ্টা ও-বেলা আধ ঘণ্টা করিয়া ...াহিকে বস, ফলাফল আমার উপর ছাড়িয়া দেও; দেখি কেমন করিয়া দুর্গতি ...য়।" আরও বলিয়াছিলেন, "বাপু, সবই নিজের কর্মের ফল, সেই কর্ম আর বাড়াইও ...া। পঞ্চপাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের কত অনুগৃহীত ছিল, তাহাদের এত কষ্ট, এত দুঃখ কেন? ...র্জুন ত তাঁহার সখা, তাঁহাকে তিনি গীতা শুনাইয়াছেন, তাঁহার সহিত ভগিনীর

বিবাহ দিয়াছিলেন ; তবু তাঁহার পুত্র অভিমন্যুর অকালমৃত্যু হইল কেন ? সব কর্মদোষ। বাপু, কেবল দুঃখটুকুই দেখ, কিন্তু কত রাশি রাশি দুষ্কৃতির ভো ঐ দুঃখটুকুতে কাটিয়া যাইতেছে তাহা ত দেখ না। দুষ্কর্ম ছাড়িয়া দেও, আ নূতন কষ্টের সৃষ্টি হইবে না। হাঁ, মনের ধর্মে সময় সময় দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক হই বই কি! কিন্তু মনের বলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ দমন করা উচিত, তাকে প্রশ্র দিলেই সে বিপদ্ ঘটাইবে।"

১৮ই শ্রাবণ বুধবার (খ্রীঃ ৩।৮।৩২) বিকালে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণপ্রান্তে আমা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাবা কথাপ্রসা বলিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির যেপথে স্বর্গারোহণ করেন সেপথে বর্তমানযুগে যতদূর পর্য যাওয়া যায় তাহা তিনি গিয়াছেন। বদরীধামের পর কতক দূর গেলে বালগোপাল নামক স্থানে পৌঁছা যায়, তাহার কয়েক ক্রোশ পরে শিবসঙ্কট* ; তারপর আ অগ্রসর হওয়া যায় না, দুর্গম তুষারক্ষেত্র ও অত্যুচ্চ পর্বত। ঐ স্থান হইতে দূরে একটি উজ্জ্বল তোরণের মত দেখা যায় ; তাহাকে স্বর্গদ্বার বলে। সময় সম গীতবাদ্যের মত শব্দও শুনা যায় ; লোকে বলে অপ্সরা ও কিন্নরীরা গান করিতেছে শিবসঙ্কটে অনেক মেয়ে দেখা যায়।

২১শে শ্রাবণ শনিবার উৎসবসৎসঙ্গে পূজ্যপাদ রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ে মুখে শুনিয়াছিলাম, ইষ্টমূর্তির ধ্যান গুরুপাদুকায় করিতে হয় এবং গুরুপাদুকা কি কোথায় অবস্থিত সে সম্বন্ধেও "পাদুকাপঞ্চক-স্তোত্র" উল্লেখপূর্বক তাহা মর্মব্যাখ্যাবসরে তিনি কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। আমার মনে হইয়াছিল, গুরু পাদুকায় শ্রীগুরুর শ্রীপদই ধ্যেয় এবং ইষ্টদেবতার ধ্যানের প্রশস্ত স্থল হৃদয়-পুণ্ডরীক পরদিন বাবাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন গুরুপাদুকায় ইষ্টদেবতা শ্রীচরণ ও গুরুর শ্রীচরণ উভয়ই ধ্যান করা যায়। আমি পাদুকাপঞ্চকস্তোত্র তখন পাঠ করি নাই ; গুরুপাদুকা দ্বাদশদল শুভ্রবর্ণ পদ্মাকার একটি বস্তু, ইহা মজুমদা মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। বাবা বলিলেন, উহা ঠিক শুভ্র নহে। উহাকে পদ্মাকার বলিয়া যে স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা তাঁহাকে দেখাইতে তিনি আমাকে আদেশ করিলেন। আমি নানাস্থানে খুঁজিয়া অবশেষে ইম্পিরিয়া লাইব্রেরী হইতে রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের "বিচারচন্দ্রোদয়"-নামক পুস্ত আনাইয়া উহা হইতে পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রটি প্রথমে নিজে ভাল করিয়া পড়ি এব তৎপর ২৬শে শ্রাবণ (খ্রীঃ ১১।৮।৩২) বৃহস্পতিবার পুস্তকখানি সহ শ্রীশ্রীবাবা কাছে যাই এবং তাঁহার আদেশে তিনটি শ্লোক তাঁহাকে পড়িয়া শুনাই। এই সময়ে একটি ভক্তিমান্ গুরুভ্রাতা—শ্রীযুক্ত তারক বন্দ্যোপাধ্যায় বি. ই.—আসি

* এই দুইটি নাম ঠিক শুনিয়াছিলাম কি না বলিতে পারি না। বাবা উঠিয়া গেলে উপস্থি একজন গুরুভাইকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তিনি বলেন, তিনিও ঠিক শুনিতে পান নাই।

অন্যবিধ প্রসঙ্গ আরম্ভ করাতে সেদিন গুরুপাদুকাসম্বন্ধে কোনও আলোচনা আর হইতে পারিল না। আমি পুস্তকখানি বাবার নিকট রাখিয়া আসি। ২৭শে শ্রাবণ তারিখে বাবার নিকট যখন পুনরায় যাই, তখন পাদুকাস্তোত্র সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করিলে বাবা বলেন—গুরুপাদুকাকে পদ্মাকার বলা ভুল। বস্তুতঃ উহা দেখিতে পাদুকারই মত। বাবা উহার আকার কাগজে আঁকিয়া আমাকে দেখান। তৎপর বলেন—ত্রিকোণমণ্ডলাদি যাহা স্তোত্রে বলা হইয়াছে উহা সব কবিকল্পনামাত্র। গুরুপাদুকা দেখিতে কতকটা শুভ্র, ঠিক শুভ্র নহে। (স্তোত্রে আছে—"অবদাতমদ্ভুতম্"।) আজ্ঞাচক্রে দ্বিদল পদ্মের ঊর্দ্ধে এক সহস্রার ভিন্ন আর পদ্ম নাই; আছে পাদুকাকার একটি স্থল। তাহাকেই গুরুপাদুকা বলা হয়।

আমি। গুরুপাদুকাধ্যানে কোনও উপকার আছে কি?

বাবা। অনর্থক পরিশ্রম।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রীবাবা কল্পিতাকার কিছুরই, এমন কি ছবি ইত্যাদিতে দৃষ্ট দেবদেবীমূর্তিরও, ধ্যানের পক্ষপাতী ছিলেন না। শাস্ত্রে দেবদেবীর ধ্যান আছে; তাহা দিয়া পূর্ণ মূর্তি কল্পনা করা যায় না; অনেকটা ছবি ইত্যাদি হইতেই টানিয়া আনিতে হয়। যোগ করিতে করিতে দেবতাদর্শন হইলে বুঝা যায় কল্পিতাকার হইতে সে মূর্তি কত ভিন্ন। কল্পিত মূর্তির ধ্যানে সময় না দিয়া ক্রিয়া ও জপে সময় নিয়োগে উপকারিতা বেশী। ইহাই ছিল বাবার মত।

সে যাহা হউক ২৬শে শ্রাবণ শ্রীযুক্ত তারক বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া পাদুকাপঞ্চকস্তোত্র-বিষয়ক আলোচনায় বাধা দিয়াছিলেন সেটি এই: তারক দাদা জিজ্ঞাসা করেন, কুমারীভোজনের উপকারিতা কি? আপনি কিছু দেখাইতে কুমারীভোজন আবশ্যক বলেন কেন? আমরা ত দেখি কতকগুলি নাকে পোঁটাওয়ালা মেয়ে; তাদের সেবার কি মাহাত্ম্য তা' ত বুঝি না।

বাবা। ঐ আধারে জগদম্বার বিশেষ প্রকাশ।

তারকদাদা। ঐ আধারে জগদম্বাকে ভাবনা করিতে হয় বুঝি?

বাবা। হাঁ, ভাবনা ত করিতে হয়ই; তা' ছাড়া ওখানে তিনি বিশেষভাবেই আছেন। তোমরা তাহা দেখ না, আমি দেখি। আর কুমারীদের ভোজনের প্রয়োজন তোমাদের নয়, আমার। যখন আমি কিছু দেখাই, তখন সেই প্রক্রিয়ার ফলে আমার শরীরে তাপ জন্মে; সেই তাপ উপশমনের উপায় কুমারীভোজন।

তারকদাদা। কুমারীভোজন না করাইলে আপনার কি অনিষ্ট হয়?

বাবা। আমার শরীর অসুস্থ হয়।

২৯শে শ্রাবণ, (খ্রীঃ ১৮।৮।৩২) আমার ভাদ্রবধূ শ্রীশ্রীবাবা হইতে দীক্ষালাভ করেন। পূর্ব বৎসর পূজার সময় কাশীতে ইহার ও আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার জন্য

দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এবার পুরীতে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাই দীক্ষার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এই সময়মধ্যে বাবা হইতে বৌমার দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে আমার ভ্রাতার মনে একটু সংশয় জন্মে। সে কয়েক মাস পূর্বে ঢাকায় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার সঙ্গে খুব পরিচিত এবং সস্ত্রীক তাঁহার স্নেহভাজন হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসে বৌমা একদিন স্বপ্নে দেখেন যেন মা আনন্দময়ী ঢাকার আশ্রমে তাঁহার স্বামী ভোলানাথ সহ দাঁড়াইয়া আছেন। বৌমা তাঁহাদের কাছে গেলে মা তাহাকে বলেন, "তুমি এই মূর্তির সম্মুখে বসিয়া পূজা কর।" তাহাতে বৌমা বলেন, "আমি ত মন্ত্র জানি না, কিরূপে পূজা করিব?" ইহাতে মা তাহাকে একটি নাম দিয়া বলিলেন, "এই নামে পূজা কর।" এই স্বপ্নবিবরণ শুনিয়া আমার ভ্রাতার মনে হয়—বৌমাকে আনন্দময়ী মা-ই ঐভাবে দীক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং পুনরায় দীক্ষার বোধ হয় আবশ্যকতা নাই। এ বিষয়ে সে শ্রীশ্রীবাবার মত জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে লিখে।

আমি ঐ বিষয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। ভাবিয়াছিলাম, আবশ্যক না হইলে বাবা দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইবেন কেন? তা' ছাড়া অন্যত্র দীক্ষা হইলেও বাবা দীক্ষা দিতেন, মন্ত্র ও দেবতা ঠিক হইলে তাহাই রাখিতেন, কেবল মন্ত্রে চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিতেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে তাহাতে আংশিক পরিবর্তনও করিতেন।

দীক্ষাকালে বৌমা অমূল্যের উপদেশে স্বপ্নে নামপ্রাপ্তির কথা বাবাকে বলিলে বাবা বলেন, "আমি যাহা দিলাম তাহাই জপ করিও। বীজ খুব ভাল পাইলে।" পরে কোনও সময়ে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা আমার ভাই ও বৌমাকে বলেন, "তোমরা দু'জনেই সদ্গুরুর কৃপা পাইয়াছ।"

আমার দিদির অতিবৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা এই সময়ে এরূপ অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া তখন, এমন কি তাহারও বহুদিন পর পর্যন্ত, দিদির বাটী ছাড়িয়া আসা সম্ভব ছিল না। এইজন্য তাঁহার আর বাবা হইতে স্থূলে দীক্ষালাভ ঘটে নাই। কিন্তু যেহেতু বাবা দীক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন সেইজন্য আমার মনে হয় সূক্ষ্মে তাঁহারও বাবা হইতে দীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং বাবা তাঁহার কুলগুরুদত্ত মন্ত্রেই চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। অমূল্যও বাবা হইতে মন্ত্র নেয় নাই, কেননা সে বহু পূর্বে শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তথাপি বাবা অমূল্য সম্বন্ধে বলিতেন, "সে ত আমার শিষ্যই।" সদ্গুরু সব এক; গুরু একই, বহু নয়। তা' ছাড়া কোনও সদ্‌গুরু যাহাকে কৃপা করেন তাহার মাতাপিতা ভ্রাতা-ভগিনী পুত্র-কন্যা ইত্যাদি সকলকেই স্বীয় চরণের আশ্রয় দেন এবং তাহাদের যে যেলোকে যেভাবে আছে সেখানেই সেই অবস্থায় তাহার উদ্ধারের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথের জননী শ্রীশ্রীবাবার শিষ্যা ছিলেন

না, কিন্তু তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পরে বাবা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি জ্ঞানগঞ্জে আছেন। সদ্‌গুরুর কৃপাবৃষ্টি ছিটা ফোঁটায় শেষ হয় না; অমৃতের বন্যা বহাইয়া দেয়।

শ্রীশ্রীবাবার মর্মরমূর্তি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কোথায় স্থাপিত হইবে সেই প্রশ্ন উঠে। কাশীর আশ্রমে একটি গোপাল বিগ্রহ আছেন একথা পূর্বে বলিয়াছি। গুরুভ্রাতা রায়বাহাদুর ৺গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একদিন স্নানার্থে গঙ্গায় নামিয়া একটা কিছু অসাধারণ বস্তুতে পা দিলেন এরূপ বোধ করেন। ডুব দিয়া উহা উঠাইয়া দেখেন, সুন্দর একটি শিলাময় গোপাল। উহা তিনি আনিয়া বাবাকে দেন। এটা বর্ধমানে আশ্রম হওয়ার কিছু পূর্বের কথা। বর্ধমানে আশ্রমের জন্য যে জমি ক্রয় করা হয় তাহাতে দুইটি স্বতন্ত্র গৃহ ছিল, উহার একটিতে গোপাল স্থাপিত হন। পরে বর্ধমানাশ্রম হইতে শ্রীগোপালকে কাশীর বিশুদ্ধানন্দকানন আশ্রমে নেওয়া হয়। গোপালের জন্য বাবার শিষ্য নৃপেন্দ্রকুমার বসু শেষোক্ত আশ্রমে একটি একতলা মন্দির নির্মাণ করিয়া মার্বেল পাথর দিয়া উহার মেঝে বাঁধাইয়া দেন। কিন্তু ঠিক কি কারণে জানি না গোপাল ঐ মন্দির অধিকার না করিয়া শিবমন্দিরে গৌরীপট্টের এককোণ অলঙ্কৃত করিলেন। এখন শ্রীযুক্ত যোগেশদাদা-প্রভৃতি প্রস্তাব করিলেন যে, নৃপেন্দ্র বসুদাদার ব্যয়ে নির্মিত শ্রীগোপালমন্দিরেই বাবাব মর্মর-মূর্তি স্থাপিত হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব জ্ঞানগঞ্জের জেঠা গুরুদেবপ্রভৃতি অনুমোদন করিলেন না, কেননা ইদানীং উক্ত মন্দির বাবার দর্শনার্থে আগত শিষ্যগণকর্তৃক সাময়িক বাসের জন্য ব্যবহৃত হইতেছিল। শ্রীউমানন্দ স্বামী বাবাকে জেঠা গুরুদেবের আদেশক্রমে লিখিলেন, "আপনার জীবিতাবস্থায় যখন মূর্তি স্থাপিত হইতেছে তখন উহা শুদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য স্বতন্ত্র মন্দির করা হউক।" উমানন্দ স্বামী বাবার গুরুভাইয়ের শিষ্য এবং একজন অতি উন্নত শক্তিশালী যোগী। গুরুসম্পর্কে উচ্চ বলিয়া, বয়সে বাবা অনেক ছোট হইলেও উমানন্দ পরমহংস শ্রীশ্রীবাবাকে সম্মান করিতেন, যদিও ইতঃপূর্বে পুরীতে অল্পকালমধ্যে বহু শিষ্য করার প্রতি কটাক্ষ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তবে ঐ পত্রের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার হইতে পারে। সে যাহা হউক উমানন্দ স্বামী অনেক সময়ে নানা নির্মাণ-দেহে আসিয়া বাবার শিষ্যবর্গকে দেখিয়া যাইতেন। পরে এ বিষয়ে আরও কিছু শুনা যাইবে। উমানন্দ স্বামী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত আদেশের ফলে কাশীতে মূর্তিস্থাপনার্থ স্বতন্ত্র একটি মন্দির নির্মাণ করাই স্থির হয়। ৮ই ভাদ্র তারিখে জন্মাষ্টমী উৎসব ছিল। উহা উপলক্ষ করিয়া ৫ই তারিখে বিধুদাদা ও যোগেশদাদা শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে কাশী যান। অবশ্য দুর্গাকান্তদাদা, রায়সাহেবদাদা, করালীদাদা প্রভৃতিও গিয়াছিলেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিলে শুনিয়াছিলাম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। স্থাপনকালে বাবা প্রকাণ্ড একটা তামার মাদুলীতে নানা রত্ন পুরিয়া

স্বহস্তে তাহা ভিত্তির নীচে রাখিয়া দেন। উহার ফল কি জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলেন, উহার গুণে মূর্তির মধ্যে বিশুদ্ধ তাড়িত-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মন্দিরটি কুঞ্জদাদার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হইয়াছিল। কুঞ্জদাদা বলেন—বাবা যে মাদুলীটি মন্দিরের ভিত্তিতে প্রোথিত করেন, ঐ আকারের মাদুলী বাজারে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ওটি সম্ভবতঃ বাবা বিজ্ঞানবলেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

৫ই ভাদ্র তারিখ প্রাতে আমি আশ্রমে গিয়া জানিলাম সেইদিন প্রাতে একটি ভদ্রলোক সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়াছেন। সেই সূত্রে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে আমি মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বাবা বলেন, গুরুদত্ত মন্ত্রের শক্তি ক্রিয়া দ্বারা কার্যকরী হয়; নচেৎ উহা নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু কখনও নষ্ট হয় না।

আমি। মন্ত্র নিজ ধর্মবশতঃ ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি দেয় কি?

বাবা। দেয়, তবে নিজের আগ্রহই ক্রিয়াতে প্রবৃত্তির প্রধান হেতু।

পূর্ব দিন বাবার পদপ্রান্তে ঝালদার 'রাজা' রায়বাহাদুর উদ্ধব সিংহকে দেখিয়াছিলাম। ইঁহার 'রাজা' উপাধিটি—গবর্নমেণ্টের দত্ত বা অনুমোদিত নয়, মর্যাদা দেশীয় রাজ্যের রাজাদিগের মত। আচারাদিও তদ্রূপ। যুবরাজের উপাধি—টিকায়েৎ। Primogeniture অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্রানুক্রমে উত্তরাধিকারও প্রচলিত প্রথা। 'রাজ্যের আয় বর্তমানে বার্ষিক ষাটহাজার টাকার কম নয় বলিয়া শুনিয়াছি। উদ্ধবদাদা বাবার জন্য ঝালদায় একটি আশ্রম করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিলাম ইনি বিষয় পরিচালনায় খুব দক্ষ হইলেও ক্রিয়াতেও খুব উন্নত। এইজন্য বাবাও ইঁহাকে খুব স্নেহ করেন। উদ্ধবদাদা একবার মোটর সাইকেল সহ পাহাড়ের পথ হইতে নীচে পড়িয়া যান ও মস্তকে খুবই আঘাত পান। এদিকে' বাবা বর্ধমানে বসিয়া ঐ মুহূর্তে ক্ষুর দ্বারা নিজের শরীর চিরিয়া কতকটা রক্তমোক্ষণ করেন। দুর্গাদাদা প্রভৃতি শঙ্কিত হইয়া উহার কারণ জানিতে চাহিলেও বাবা তখন কিছুই বলেন না। দিন দুই পরে উদ্ধবদাদা উক্ত দুর্ঘটনার কথা লিখিলে বাবা প্রকাশ করেন যে, ঐ ভাবে তাঁহার শরীর হইতে কিছু রক্তমোক্ষণ না হইলে উদ্ধবদাদা মস্তকে যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহাতেই মারা যাইতেন। উদ্ধবদাদা পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, 'গাড়ী ভাঙ্গিয়া গেল বটে, কিন্তু সংজ্ঞাহীন হইলেও আমার মনে হইল কে যেন আমাকে কোলে করিয়া তাহা হইতে তুলিয়া নিয়া অন্যত্র শোয়াইয়া দিল।'

প্রসঙ্গানুগত বলিয়া কিছুদিন পরে শ্রুত হইলেও আরও দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাবার মর্মরমূর্তি স্থাপন উপলক্ষে উদ্ধবদাদা পত্নী ও এক পুত্র সহ কাশী যান। সেই স্থানে রাণীদিদি* গুরুভগিনীদিগের কাছে ঐ ঘটনা দুইটি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* গুরুর আশ্রমে যাইতেছেন বলিয়া রাণীদিদি হীরা-মুক্তা সোনা দানা কিছুই পরিয়া যান নাই যদিও অবশ্য তাঁহার ঐ সকলের অভাব ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের, বিশেষতঃ কলিকাতা

একবার রাজাদাদার পৃষ্ঠে একটি কার্বাঙ্কল (carbuncle) হয়। রোগের র্ম অনুসারে তাহাতে অসহ্য জ্বালা ও ব্যথা ত ছিলই, তদুপরি পিপাসায়ও তিনি ড়় কষ্ট পাইতেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার আপেল (apple) ফল খাইতে প্রবল চ্ছা হয়, কিন্তু আপেল, সেখানে ত না-ই, রাঁচিতেও লোক পাঠাইয়া পাওয়া গল না। একদিন সন্ধ্যাকালে দাদা 'বাবা গো, মা গো' বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকেন। দিদি বলেন, ঐ সময়ে কিছুক্ষণের জন্য আমি পাশের ঘরে গয়াছিলাম, ওঁর নিকটে কেহ ছিল না। হঠাৎ যেন আরামসূচক "আঃ" এই রকম একটা আওয়াজ আমার কানে গেল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া দেখিলাম যন বাবা বাহির হইয়া গেলেন। আর ওঁর পিঠে যেখানে ঘা, সেখানে চন্দন াখানো একটি তুলসীপাতা দেখিলাম। তখনই জ্বালা ও ব্যথা চৌদ্দ আনা কমিয়া গিয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় টেবিলের উপরে দেখিলাম একটি কাগজের ঠাঙ্গাতে ছয়টি আপেল রহিয়াছে।'

আর একবার রাজাদাদার চতুর্থপুত্র শ্রীমন্তনারায়ণ সিংহ প্রাতে একটা গুলিভরা বন্দুক অসতর্কভাবে নাড়াচাড়া করাতে হঠাৎ বন্দুকের ঘোড়া পড়িয়া যায় ও তাঁহার ডান হাতে ছয়টি ছর্‌রা ঢুকিয়া পড়ে। ইহাতে অজস্র রক্তপাত হয় এবং স্থানীয় ডাক্তার দেখিতে আসিয়া first aid (প্রাথমিক ব্যবস্থা) দিয়া বলেন, ায়ত্ত হাতটা কাটিয়াই ফেলিতে হইবে। ইহাতে ছেলে বলে, 'হাত আমি কিছুতেই কাটিতে দিব না, মরিতে হয় তা'ও স্বীকার।' সে যাহা হউক, বড় ডাক্তারের জন্য লোক মোটর নিয়া রাঁচি গেল। এদিকে বাড়ীতে সকলেই ভীষণ চিন্তায় আকুল, টনানে হাঁড়িও চড়ে নাই। এমন সময় কোথা হইতে অদৃষ্টপূর্ব এক সাধু আসিয়া উদ্ধবদাদাকে বলিলেন, "ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু ভোজন চাই।" উদ্ধবদাদা বাড়ীর দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আমাদের এই অবস্থা, আপনি এই সিকিটি নিন, বাজারে গিয়া কিছু কিনিয়া খান।' সাধু সিকিটি নিয়া বলিলেন, "আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, কিছু জল দাও।" তখন তাহাকে কিছু মিষ্ট দ্রব্য ও জল দেওয়া হইল। সাধু জলপান করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, ছেলের জন্য কোনও চিন্তা নাই, ছয়ট ছর্‌রার দুই-একটা ভিতরে থাকিয়া গেলেও কোনও ক্ষতি হইবে না, হাত ভাল হইয়া যাইবে। দাদা সাধুর কথা শুনিলেন, কিন্তু তাহাতে তেমন আস্থাস্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি চিকিৎসার চিন্তায়ই বিব্রত রহিলেন। পরদিন কি তৎপরদিন শ্রীশ্রীবাবার চিঠি আসিল। তাহাতে যামর এই মর্মে লিখিয়াছেন, "উদ্ধব, তোমার এমন বিভ্রম হইল, আমাকে সিকি

মেয়েদের, চক্ষে গহনার মর্যাদা এত অধিক যে, তাঁহাদের অনেকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়াছিলেন—ও মা! এ কেমন রাণী গো। হাতে কতকগুলি কাচের চুড়ি ভিন্ন কোন গহনাই নাই। রাজাদাদার বেশও কলিকাতায় ও কাশীর আশ্রমে যতবার দেখিয়াছি অতি সাধারণ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন দেখি নাই।

দিলে, মিষ্টি দিলে, জল দিলে, আমার কথা শুনিলে, তবু আমাকে চিনিতে পারিলে না? যা' হোক কোন চিন্তার কারণ নাই। আমি যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহাই হইবে, হাত ভাল হইয়া যাইবে।" বলা আবশ্যক যে, ঐ পত্রপ্রাপ্তির পূর্বে উদ্ধবদাদা বাবাকে ঐ বিপদ্ বিষয়ে কোন সংবাদ দেন নাই। এই ছেলেটি মর্মরমূর্তি স্থাপন উপলক্ষে পিতার সহিত কাশী আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে আহারকালে বাম হাত ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহার ডান হাতের দিকে আমার নজর পড়ে। হাতটি কাটিয়া ফেলিতে হয় নাই, তবে তাহাতে অস্ত্র প্রয়োগের চিহ্ন ছিল। বোধ হয় উহা দিয়া ভাত তুলিয়া খাওয়ায় সুবিধা হয় না বলিয়াই খাদ্য বাম হাতে মুখে তুলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

উদ্ধবদাদা নিজে একজন অতি উত্তম শিকারী। কিন্তু বাবা তাঁহাকে বাঘ শিকার করিতে মানা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তাহা করিলে বাঘের উত্তেজিত হিংসাবৃত্তির দরুন কি বাড়ীতে কি আশ্রমে বাস বিপৎসঙ্কুল হইবে।

এখন ৫ই ভাদ্রের কথায় ফিরিয়া যাওয়া যা'ক্। ঐদিন রজনীদাদার মুখে শুনিতে পাই ৪ঠা তারিখ বিকালে রজনীদাদা, যোগেশদাদা, এবং উদ্ধবদাদা শ্রীশ্রীবাবার চরণপ্রান্তে বসিয়াছিলেন, ঐ সময়ে যোগেশদাদা বলেন, "এইবার হয়ত বিজ্ঞানমন্দিরের কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে, কেননা আমেরিকা হইতে আবশ্যকমত কাচ পাওয়া যাইবে এইরূপ আশা করা যাইতেছে। যদি যায় তাহা হইলে, উদ্ধবদা', আপনি প্রথমে বিজ্ঞান শিখিয়া লইয়া বাবার শরীরটা ঠিক করিবেন, তারপর বাবা আমাদের সকলের শরীর ঠিক করিবেন।" গম্ভীরস্বভাব উদ্ধবদাদা অবশ্য নীরব। বাবা বলিতে লাগিলেন, "তা' উদ্ধব পারে। দুর্গার (গুরুপুত্রের) প্রথম স্ত্রীর শরীর যখন খারাপ (ইনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া বায়ুপরিবর্তনার্থ ঝালদায় ছিলেন), তখন উদ্ধব আমাকে লিখে, বৌদিদির শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, কি হয় বলা যায় না। আপনি যদি অনুমতি করেন তা হ'লে বৌদির রোগটা আমি টানিয়া নেই।' আমি উদ্ধবকে লিখি, তোমার এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, পরের ভোগ টানিয়া নিলে অপকার হইবে না। যোগলব্ধ শক্তি এ ভাবে নষ্ট করিতে নাই।"

এটা দশ-বার বৎসর পূর্বের কথা। তখনই রাজা উদ্ধব সিংহ এতখানি উন্নত, তারপর এ কয় বৎসর ভিতরে ভিতরে আরও কত উন্নত হইয়াছেন। কিন্তু আকার প্রকারে কিছুই বুঝিবার জো নাই। 'অগাধ-জলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ গণ্ডুষ জলমাত্রেণ শফরী ফড়্ফড়ায়তে।' রজনীদাদার মুখে বাবার কথা শুনিয়া মনে মনে বলিয়াছিলাম, ধন্য উদ্ধবদাদা, আর শত ধন্য সেই গুরু যাঁহার প্রদত্ত ক্রিয়ার বলে ইহা সম্ভব হয়।

একদিন প্রকাশ ঘোষদাদার মুখে শুনিলাম—কিছুদিন পূর্বে বাবা আশ্রমে উপস্থিত সকলের কাছে বলিয়াছিলেন, "আজ ভোর চারিটায় আহ্নিক সারিয়া

পাঠের (বাবা সাধারণতঃ ঐ সময়ে চণ্ডীপাঠ করিতেন) উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ দেখি সম্মুখে মহামায়ার এক করাল মূর্তি। উপরে তাকাইয়া দেখি যেন ছাদ নাই, মায়ের মাথা আকাশে ঠেকিয়াছে, মায়ের দুই স্তন লম্বা মোটা দুই থলের মত ঝুলিতেছে। হাতে রক্তাক্ত খড়্গ, কিন্তু বর ও অভয়ও আছে। অসুরের মুণ্ড মুখে ফেলিয়া দিয়া যেন বিকট দন্তপাটিতে কড়মড় করিয়া ভাঙিয়া খাইতেছেন। পেছনের দিকে তাকাইয়া দেখি যেন এক বিশাল মাঠের* উপর দিয়া রক্তের বন্যা চলিয়াছে, তার মধ্যে স্থানে স্থানে মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া। কেবল রক্ত আর রক্ত, আর কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ দেখি মা যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, এবং সেই হাসির সঙ্গেই মায়ের মূর্তি অদৃশ্য হইল। তখন দেখি ঘরের ভিতরে আমি যেখানে যেভাবে ছিলাম ঠিক সেখানে সেই ভাবেই আছি।"

এই দৃশ্যে কি সূচিত হয় শুনিয়াছি সে বিষয়ে বাবা কিছুই বলেন নাই। সাত বৎসর পরে[১] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া জগতে যে ভীষণ রক্তবন্যা বহাইবে বাবার দর্শনে তাহাই সূচিত হইতেছিল কি? আর যদি কলিকাতায় ভাব্য রক্তবন্যা সূচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয়, যুদ্ধ উপলক্ষে বোমা পড়িয়া কলিকাতায় যে রক্তপাত হইয়াছিল তাহা নগণ্য—যদিও আতঙ্ক যথেষ্টই হইয়াছিল। সে দৃশ্য বোধ করি মা মহাকালী শ্রীশ্রীবাবাকে দেখান নাই। উহার পর অংশতঃ যুদ্ধেরই ফলে, ততোধিক রাজপুরুষগণের অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতা ইত্যাদির দরুন দুর্ভিক্ষ[২] উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালার সর্বত্র, বিশেষতঃ কলিকাতায়, যে লোকক্ষয় সাধন করে তাহা যে-কোনও দেশের যুদ্ধজনিত লোকক্ষয় হইতে ভীষণতর। তবে তাহাতে রক্তপাত হয় নাই, রক্তের অভাবে লোকে প্রাণ দিয়াছে। মায়ের প্রদর্শিত রক্তবন্যায় হয়ত তাহাও সূচিত হয় নাই। রক্তপাত—কলিকাতায় অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব রকমের রক্তপাত—হইয়াছে খ্রীঃ ১৯৪৬ সনের আগস্ট মাসের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও পরস্পরের উপর গুপ্ত আক্রমণে। চারিদিনের মধ্যে অন্যূন পাঁচ-হাজার লোক হত ও পনের হাজার লোক আহত হওয়া যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মা মহাকালী ইহাই বাবাকে দেখাইয়াছিলেন কি? মার হাতে কিন্তু বর ও অভয় ছিল, আর মুখে মৃদুস্মিতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদৃশ্য হইয়াছিলেন। তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, মা, এই রক্তবন্যার পরে স্বাধীনতা আসিবে তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলে কি? স্বাধীনতার সঙ্গে সুদিন ত ফিরিয়া আসিতেছে না, মা। অন্নবস্ত্রের ভীষণ কষ্ট, ব্যবসায়ীদের ভীষণ দুর্লোভ, দেশব্যাপী দারুণ অশান্তি, দুর্বৃত্তগণের দুর্বৃত্তি—এসব এখন কমিবে কি? ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয় হইবে কি? কত কত যুগ পূর্বে চণ্ড-মুণ্ড-রক্তবীজাদি

---

* বাবা "গড়ের মাঠের" নাম বলিয়াছিলেন এরূপও কেহ কেহ বলেন।

১. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

২. ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ভীষণপ্রকৃতি অনুচরগণ সহ শুম্ভ-নিশুম্ভের নিপাতের পর দেবতারা যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মা, সেই প্রার্থনা এখন সফল কর—

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে
নিত্যং যথাসুরবধাদ্ অধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাং প্রশমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

হে দেবি! শত্রুভয় হইতে নিত্য আমাদিগকে রক্ষা কর, যেমন এই মাত্র অসুরসঙ্ঘ বধ করিয়া করিলে। সমস্ত জগতের (উদ্রিক্ত) পাপরাশি শীঘ্র প্রশমিত কর, আর উৎপাতসমূহের পরিপাকজনিত মহা মহা উপসর্গগুলিকে শান্ত কর।

২৬শে ভাদ্র রবিবার খ্রীঃ ১।৯।৩২) প্রাতে গুরুদর্শনার্থে রূপনারায়ণ নন্দন লেনের আশ্রমে গেলাম; হাতে একটা হাঁড়িতে করিয়া কিছু মিষ্টি নিয়া গিয়াছিলাম। বাবা ভোগের সময় উহার কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে আসিয়া বলিলেন, 'মিষ্টি ভাল ছিল। বাড়ীর তৈরী কি?'

আমি। না বাবা, হাতীবাগানের (ঐ অঞ্চলেই তখন থাকিতাম) একটা নামজাদা মিঠাইয়ের দোকানের।

বাবা। বেশ মিষ্টি। আচ্ছা বল ত কোন জিনিস চিনি না মিশাইলেও মিষ্ট—স্বভাবতঃ মিষ্ট—চিরকাল মিষ্ট?

আমি। এমন কিছু ত কখনও আস্বাদ করি নাই। মধুও কালে নষ্ট হইয়া যায়। তবে পুস্তকে পড়িয়াছি ব্রহ্মাস্বাদ অতি মধুর, চিরমধুর।

বাবা। হাঁ। ভাষাও স্বভাবতঃ মিষ্ট।

আমি। কিন্তু, বাবা, ভাষা ত যথেষ্ট পরিমাণে তিক্তও হইতে পারে। ভাষা দিয়া লোককে বেশ কষ্ট দেওয়া যায় এবং লোকে দিয়াও থাকে।

বাবা। সেটা ভাষার অপব্যবহার। শুদ্ধভাষা স্বভাবতঃ মিষ্ট। ভাষা চারিপ্রকার—জগতের সকল জিনিসই চারিপ্রকার—অধম, মধ্যম, উত্তম, অত্যুত্তম; ভাষার যেটা অত্যুত্তম অবস্থা সেটা পরম রসস্বরূপ।

আমি। সেটাই কি পরা ভাষা?

বাবা। হাঁ।

আমি। সে ত ব্রহ্মই বলা চলে। পরা বাক্ই ত শব্দব্রহ্ম।

বাবা। ব্রহ্ম হইতে তার বিকাশ হয়, তাই ব্রহ্মও বটে, ব্রহ্ম নয়ও বটে; ষোলআনা স্বরূপ হইলে ভেদ হয় না। ভেদ মানেই কিছু বিশেষ।

তারপর ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। ভেদের দিকে একটু জোর দিয়া বলিলেন, যে অবস্থায় ভেদ নাই সে অবস্থায় কোনও কার্য নাই। অভেদে লোক প্রবল শক্তির মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে—সেটা যোগীর কাম্য নয়।

যোগী অভেদেও ভেদ চায় লীলাদর্শন জন্য। অভেদে ভেদরক্ষা করার সামর্থ্য এক যোগই দিতে পারে।

আমি। ভেদ আসে কোথা হইতে?

বাবা। স্পন্দন হইতে।

আমি। সে স্পন্দনই হয় কেন? জীবের ভুক্তি-মুক্তি সাধন জন্য তৎপ্রতি কৃপা হইতে হয় এইরূপ ত শুনিয়াছি।

বাবা। কৃপা ত আছেই। কর্মছাড়া কৃপা বুঝা যায় না।

আমি। কর্ম কার অধীন?

বাবা। কর্তার অধীন।

আমি। তা'হলে কর্তা ইচ্ছা করিলে কর্ম করিতে, না করিতে, অন্যথা করিতেও পারে। তাহা হইলে কর্ম অনিত্য বস্তু, আর কৃপা নিত্য বস্তু।

বাবা। অনিত্য বস্তু দিয়াই নিত্যবস্তু পাইতে হয়। বাস্তবিক জগতে অনিত্য কিছু নাই। সবই নিত্য। কর্ম কর। কর্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীবাবার দত্ত ক্রিয়াসম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল- এই অবসরে আমি সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম। বলিলাম, "রাত্রি চারিটায় প্রদীপ জ্বালিয়া ক্রিয়া করা যায় কি না?"*

বাবা। না; জপ করিও। ক্রিয়া সূর্যোদয় না হইলে ঠিক হয় না। সূর্যালোকের সঙ্গে উহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সন্ধ্যার কথা স্বতন্ত্র।

আমি। দেখিয়াছি পূর্বে জপ করিয়া শ্রান্ত হইলে ক্রিয়া বেশীক্ষণ করা যায় না—ভাল হয় না।

বাবা। তা' হ'লে সূর্যোদয়েই বসিও। ক্রিয়া বেশীক্ষণ করাই বাঞ্ছনীয়।

আমি। জপে ক্লান্ত হইয়া আসন ভাঙ্গিলে পুনরায় আসন করা পর্যন্ত জপ চালান যায় কি না?

বাবা। যায় বই কি। জপ পায়খানায় বসিয়াও চালান যায়।

আমি। আহ্নিকের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সমস্ত মন্ত্রই জপ করা যায় কি?

বাবা। বীজ জপ করাই উত্তম।

আমি। সংখ্যা রাখার প্রয়োজন আছে কি?

বাবা। প্রয়োজন নাই; তবে রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

কর্মসম্বন্ধে নলিনী রায়দাদার এক প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলিয়াছিলেন—দু' বেলাই ৮টা পর্যন্ত কর্মের প্রশস্ত সময়। আমাকে বলিয়াছিলেন-- ঐ সময়ে সুবিধা না হইলে অন্য সময়েও করা যায়, তবে সময়ে যাহা অল্পশ্রমে হয়, অসময়ে ততটুকু ফল পাইতে চতুর্গুণ শ্রম দরকার।

* ক্রিয়া জপ ইত্যাদি বিষয়ক কথাগুলি কেবল শ্রীশ্রীবাবার শিষ্যেরাই ঠিক ঠিক বুঝিবেন। এগুলি সাধারণ পাঠকের জন্য সবিস্তার বলা চলে না।

২রা আশ্বিন রবিবার শ্রীশ্রীবাবার মর্মরমূর্তি-প্রতিষ্ঠাসম্পর্কে শ্রীযুক্ত যোগেশদাদা বাবাকে বলেন, প্রতিষ্ঠার উৎসব ভাল ভাবে হওয়া আবশ্যক। যোগেশদাদার 'ভাল ভাবে'র অর্থ শাস্ত্রসম্মত প্রক্রিয়ানুসারে সমুচিত শুদ্ধভাবে ত বটেই, তদুপরি যথেষ্ট জাঁকজমক সহকারে। বাবা তদুত্তরে একটু উচ্চভাবেই যোগেশ-দাদাকে বলেন, "উৎসবের সমস্ত খরচ যদি তুমি নিজে দিতে পার তবেই উৎসব করিবে। এজন্য তুমি কাহারও নিকট হইতে একটি পয়সাও নিতে পারিবে না।"

পনের

১৭ই আশ্বিন, ১৩৩৯ (খ্রীঃ ৩।১০।৩২) তারিখে আমি ও অমূল্য আমার দ্বিতীয় পুত্রব্যতীত (সে কয়েক দিন পরে গিয়াছিল) আমাদের পরিবারস্থ অপর সকলকে নিয়া কাশী রওনা হই এবং পরদিন প্রাতে তথায় পৌঁছি। বাড়ী গোপীনাথই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এবার কাশীর বড় ঘটনা—শ্রীশ্রীবাবার মূর্তি প্রতিষ্ঠা। ছোটখাট একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তাহাতে ইতঃপূর্বেই মূর্তি বসান হইয়াছিল। ২৮শে আশ্বিন যথাবিধি প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ দিন ভোরে প্রভাতকীর্তন হয়। তারপর হয় গুরুর পাদপদ্মপূজা। বাবা পদযুগল একটি রৌপ্যনির্মিত তাম্রকুণ্ডাকৃতি আধারে রাখিয়া উপবেশন করেন, তৎপর বৈদিক হরমোহনদাদা যথারীতি তাহা পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজা করেন। সকল শিষ্য এবং অশিষ্যও বহু ব্যক্তি পাদোদক গ্রহণ করেন। তারপর মূর্তির পূজা, চণ্ডীপাঠ ও আটজন দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণকর্তৃক যজুর্বেদের অংশবিশেষ পাঠ হয়। তৎপর কুমারীভোজন হয়; প্রথমে ১২০টি কুমারীমাতা ভোজন করেন, পরে আরও কয়েকটি আসিয়াছিলেন। কুমারী ভিন্ন অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকুমার, ব্রাহ্মণ, বিধবা, সধবা ও কাঙ্গালী আরও বহু ব্যক্তি উদর পূর্ণ করিয়া খাইয়াছিলেন। কুমারীভোজনান্তে যথাসময়ে বাবার ভোগ হয়। তৎপর জন্মোৎসবের মত বাবার শ্রীচরণে শিষ্যশিষ্যাগণ পুষ্পাঞ্জলিদান ও প্রণাম করেন। সেদিন সকলেই ভক্তিতে গদগদ। শিষ্যাগণই প্রথমে অঞ্জলি দেন। তারপর মর্মরমূর্তিতেও অঞ্জলিদান ও প্রণাম করা হয়। তৎপর প্রথমে শিষ্যাগণ ও পরে শিষ্যগণ প্রসাদ পান। ইহার পর সঙ্গীত ও কথকতা হয়। দিনটা খুবই আনন্দে কাটিয়াছিল। বহু শিষ্যশিষ্যা বাহির হইতে গিয়াছিলেন, অনেকের সঙ্গে আলাপ হইল। জানকীদাদারা তিন ভাইও গিয়াছিলেন। বাবা বহু শিষ্যসমাগমে খুব প্রসন্নমনে ছিলেন বলিয়া কয়েকদিন নিজ খেয়ালবশেই বিজ্ঞান দ্বারা নানা জিনিস সৃষ্টি করিয়া শিষ্যদিগকে দেখান। একটি নূতন শিষ্য (কটকের ঈশ্বরদাস) কুমারীভোজন অঙ্গীকার করিয়া একটি বৃহদাকার স্ফটিক নির্মাণ করাইয়া নিয়াছিলেন। অন্য একদিন শ্রীযুক্ত গোপীনাথের নাতিনী ছবি (৬ বৎসরের শিশু)

বাড়ী হইতে একটি ছোট শিশি আনিয়া বলেন, 'গুরুদেব, আমাকে এক শিশি গন্ধ দিতে হবে।' বাবা হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সিল্কের একটা চাদরে শিশিটি ঢাকিয়া এক শিষ্যের হাতে দিয়া (ঠিক সন্দেশ প্রস্তুত করার প্রথায়) তক্তপোশে কয়েকটি ঘা দেন, পরে শিশি খুলিয়া দেখা গেল উহা আতরে ভরতি হইয়াছে। সন্দেশ ও আতর করাতে তক্তপোশে যে ঘা দেওয়া হয়, তাহাতে প্রকারের কোনও ভিন্নতা আমাদের বোধগম্য হয় নাই। বরং মনে হইয়াছিল—ঘা এক প্রকারেরই, জিনিসের ভিন্নতা হইয়াছে সংকল্পের ভিন্নতা হইতে। তবে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।

একদিন হ্লাদিনী শক্তির প্রসঙ্গ উঠিলে বাবা বলেন, হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হয় যখন প্রকৃতিপুরুষ যুক্ত থাকেন। ঐসময়েই সৃষ্টি হইতে থাকে। বস্তুতঃ সৃষ্টির উন্মুখতা—হ্লাদিনী শক্তির সহিত যোগ—লিঙ্গ ও যোনিপট্টের সংযোগ সর্বদাই আছে। এই বলিয়া বলিলেন, "দেখ এখানে কি আছে।" একটা মসলার কৌটার ডালার উপরে কতকটুকু এলাচির গুঁড়া ছিল। ঐটুকু হাতে নিয়া বাবা পেষণ করিতে লাগিলেন। পরে উহা একটা বটিকার আকারের হইলে গোপীনাথের হাতে দিয়া বলিলেন, "মুঠ বন্ধ করিয়া ধরিয়া থাক"। ঐ সময়ে সেই বটিকা হইতে অপূর্ব সুগন্ধ বাহির হইতেছিল। একটু পরে গোপীনাথ বাবার আদেশে মুঠ খুলিলে দেখা গেল একটি মাছির সৃষ্টি হইয়াছে; এবং কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে মাছিটা গোপীনাথের হাত হইতে উড়িয়া গেল। বাবা বলিলেন, "হ্লাদিনী শক্তির ঈষৎ আবেশে সৃষ্টি করিবার একটা ভাব মনে আসে। চারিদিকে মাছি উড়িতেছিল। খেয়ালবশে মাছির উপাদান আকর্ষণ করিয়া একটা মাছি সৃষ্টি করিলাম। হ্লাদিনীর সহিত নিত্যযুক্ত সৃষ্টিকর্তাও ঠিক এইরূপ খেয়ালবশেই অজস্র সৃষ্টি করিতেছেন।"

একদিন (২৫শে আশ্বিন) বাবা দুইখানি পুরাতন খাতা হইতে আমাকে দুইটি স্বরচিত কবিতা দেখাইতেছিলেন। একটি গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে, উহা নকল করিয়া রাখিবার অবসর পাই নাই। গুরুগীতায় উল্লিখিত ভাবের অনেক কথা কবিতাটিতে ছিল, এই মাত্র নোট করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় কবিতাটি এই :—

নাদাত্মক ধ্বনি যেই শ্রুতির নির্ণয় সেই,
ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর হয় যে গঠন।
ঐ স্বরে মূর্ছনা হয়— তিন গ্রাম তাকে কয়;
সূক্ষ্মতত্ত্ব ইহা কিন্তু না হয় বর্ণন॥
সর্বশুদ্ধ দ্বাবিংশতি পরিপাটি আছে শ্রুতি,
ষড়্‌জ মধ্যম যে পঞ্চম তিনে বাঁধা।
ঋষভাদি ধৈবত আর স্বর আছে কত;
উদারা মুদারা তারা লাগায় যে ধাঁধা॥

নবদ্বার হলে রোধ, তবে হয় শব্দবোধ ;
শব্দবোধে সব বোধ হইবে নিশ্চয়।
তারপর যাহা হবে বোধেতে নাহি থাকিবে,
বোধাবোধ সব নিয়ে শিবময় হয় ॥
অশিব না রবে ভবে, শিবময় সব হবে,
মহাশক্তি কি যে শক্তি বুঝিবে তখন।
থাকিবে না কাঁদা হাসা, কাটিবে বিষয় নেশা,
অজপা সহিত হবে আনন্দে মগন ॥
যে কালেতে সৃষ্টি করে সেই কাল পদে পড়ে,
রূপ গুণ নাই কিন্তু কার্য আছে তার।
সাম্যাবস্থা শক্তি হ'লে তাহাকেই কাল বলে,—
ভূতের কলন ক'রে লন সব ভাব ॥
সমস্ত দেবতা লয়— এ হয় মহাপ্রলয়,
অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব সব তত্ত্ব যায়।
আর যত তত্ত্ব আছে ছুটিছে তাহার কাছে,
সকলে লইছে গিয়ে তার পদাশ্রয় ॥

এই অপূর্ব বস্তুটির বিচার-বিশ্লেষণ বা আলোচনার আমি অধিকারী নহি। তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ইহা কেতাবী কথার নকল নয়, প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি।

একদিন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ প্রশ্ন করেন, যোগী যখন ক্রিয়াতে যুক্ত অবস্থায় থাকেন তখন তাঁহার দেহের কোনও পরিবর্তন হয় কি না ?

বাবা। কিছু পরিবর্তন হয়।

গোপী। তখন কেহ তাঁহার দেহের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে কি না ? যেমন : কেহ যদি একখণ্ড জ্বলন্ত টীকা তাহার দেহে লগ্ন করিয়া রাখে তাহা হইলে আগুন কার্য করে কি না ?

বাবা। অবশ্যই করে, তবে যোগীর সে বোধ থাকে না।

গোপী। যখন ব্যুত্থান হবে তখন জ্বালাবোধ হবে কি ?

বাবা। হবে না ; দেহ দগ্ধ হ'য়ে গেলেও ব্যুত্থানের সঙ্গে নূতন দেহ হবে।

গোপী। এরূপ ত শাস্ত্রে দেখা যায় হিংসাশূন্য হইলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে কোনও অনিষ্ট করে না।

বাবা। সে কথা জীবসম্বন্ধে খাটে। আগুন ত জীব নয়, সে তাই নিজের কাজ করিবে। তবে যে লোক যোগীর দেহে কষ্ট দেয় তার ঘোরতর অনিষ্ট হয়।

যোগী যদি সেরূপ সংকল্প করিয়া যুক্ত হয়, তাহা হইলে আগুনেও সে দেহের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না।

অন্য একদিন—

গোপীনাথ। আকাশবাণী ও স্বপ্নে আদেশের মধ্যে পার্থক্য কি?

বাবা। আকাশবাণী জাগ্রত অবস্থায় শুনা যায় তাহাতে ভ্রম হয় না। স্বপ্নের আদেশ গ্রহণের দোষে অনেক সময় মিথ্যা হয়। দৈববাণী সাধারণতঃ দেবতারাই করেন। কেহ কোনও সমস্যায় পড়িয়া দেবতাদের সাহায্য চাহিলে দৈববাণী লাভ করেন; অবশ্য তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। স্বপ্নে আদেশ অনেক সময় দুষ্ট প্রেত ইত্যাদিতেও দেয়। তাহা মিথ্যাও হয়, অকল্যাণেরও কারণ হয়।

এইরূপ আরও অনেক কথার পর—

বাবা। এক শ্রেণীর আকাশবাণী সর্বদাই হইতেছে। কান প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তাহা লোকে শুনিতে পায় না। প্রকৃতিপুরুষের সংঘর্ষ হইতে ঐ আকাশবাণী হয়।

মনে পড়ে বাবা এই স্থানে এইরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিপুরুষ-সংঘর্ষজনিত নাদ হইতেই শুদ্ধাত্মা সাধক স্বীয় প্রয়োজনানুরূপ আদেশ পান।

দীক্ষাসম্বন্ধে কেদার ভৌমিকদাদা একদিন প্রশ্ন করেন, "আমরা যে দীক্ষা পেয়েছি এটা ত বাবার কৃপাই বটে?"

আমাকে একদিন এইরূপ প্রসঙ্গে বাবা বলিয়াছিলেন, "কৃপা না হলে দীক্ষা পেলে কেন?" কেদার দাদাকেও অন্য একদিন বলিয়াছিলেন, "সবই কৃপার খেলা রে বাপু, কৃপা ছাড়া কিছু নাই, কিছু হয় না।" কিন্তু আজ বলিলেন, "ও আর কৃপা কি? তোমার জিনিসই আমি তোমাকে দিয়েছি। যা তোমার ভিতরেই ছিল সেটা আমি ফুটিয়ে দিয়েছি। গোপীনাথ, কি বল?"

গোপীনাথ। আপনি কথাটা অন্যরকম করিয়া বলিলেন। কৃপাই সত্য। তবে পাছে আমাদের কর্মে শিথিলতা আসে সেই জন্য আপনি কৃপা স্বীকার না করিয়া কেবল কর্মের উপর জোর দেন।

বাবা আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু বাবার অদ্যকার উক্তিটি—"তোমার জিনিসই আমি তোমাকে দিয়েছি; যা তোমার ভিতরেই ছিল সেটা আমি ফুটিয়ে দিয়েছি"—যে কিরূপ গভীর রহস্যপূর্ণ তাহা পরম পণ্ডিত গোপীনাথও বোধ করি সেদিন, অন্ততঃ সে সময়ে, সম্যক্ ধরিতে পারেন নাই। পরে অবশ্য তাঁহার মুখে অনেক কথাই শুনিয়াছি।

বিষয়টি কতকটা এইরূপ:—মানুষের সৎকর্মের ফল হইতেছে অভ্যুদয় অথবা নিঃশ্রেয়স্। অভ্যুদয়ের কথা এখন থাক্; নিঃশ্রেয়স্ (মোক্ষ)-সাধন কর্ম যতটুকু

করা হয় তাহা জন্মে জন্মে সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সঞ্চয় থাকে সাধকেরই গুহ্যাতিগুহ্য গুরুসত্তায়। জপসমর্পণের মন্ত্রে ইষ্টদেবতাকে বলা হইয়াছে গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা বা গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী। ইষ্টদেবতা ও গুরু একই, কাজেই মোক্ষসাধন কর্ম গুরুর কাছে সঞ্চিত থাকে ইহাও বলা যায়। কাহারও যদি পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধনসম্বন্ধে খবর না থাকে তবে তাহার পক্ষে সেটা থাকা না থাকা সমান। তা'ছাড়া ধন প্রয়োগ করিতে জানিলেই তাহা বাড়ে। মাটির নীচে প্রোথিত ধন বাড়ে না। আমার সঞ্চিত যে কর্ম আমার গুরুসত্তায় আমার অজ্ঞাতসারে আছে বা গুরুর নিকট সঞ্চিত আছে, গুরু দীক্ষাকালে তাহাই আমার হাতে দিয়া বলেন, এই তোমার ধন, ইহা তুমি খাটাইতে থাক, বাড়িবে। আমি তাহা খ'টাইয়া বেলার পর বেলা যে মুনাফা পাই তাহা পুনরায় গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা গুরুর কাছে সঞ্চিত করি। বাবা যে দীক্ষাদানকালে অন্ততঃ তিনজন্মের সাধনের খবর অনুসন্ধান করিতেন উহার অর্থই শিষ্যের সঞ্চিত কর্মের আবিষ্কার। ঠিক ঠিক জিনিসটি—খাঁটি ধন—শিষ্যের হাতে দিলে ত সে তাহা খাটাইলে বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ বা মুনাফা পাইবে? মেকী দিয়া কারবার চলে না। সদ্‌গুরু খাঁটি ধন দেন—উহারই নাম চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র। অন্যগুরু দেন তাহার নকল; ফলও সেইজন্য দুর্বল হয়। বাবা সেদিন বলিতে চাহিয়াছিলেন, শিষ্যেরই নিজের ধন তাহাকে খাটাইতে দিয়া গুরু এমন কি কাজ করেন? কৃপাবাদী আমরা বলি, নয় কেন? আমি ত অজ্ঞানতিমিরান্ধ; গুরু জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়া আমার চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন বলিয়া ত আমি আমার বস্তুটি চিনিয়াছি এবং তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেছি।

অন্য একদিন—

গোপীনাথ। ধ্যানকালে সমস্ত দেহের ধ্যান করা ভাল, কি কোনও বিশেষ অঙ্গের ধ্যান করা ভাল?

বাবা। পাদপদ্মের ধ্যান করা ভাল।

গোপীনাথ। কেন?

বাবা। পায়েই তাড়িত-শক্তি বেশী। পাদপদ্মধ্যানে অধিক তাড়িত সঞ্চারিত হয়।

তাড়িত-শক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বাবা আরও বলিলেন, মানুষের দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দিয়া তাড়িত-শক্তি বেশী চালিত হয়, সেই জন্য মাত্র ঐ আঙুলটি দিয়া কোনও কাজ (যথা দাঁত মাজা, কিছু দেখান ইত্যাদি) করিতে নাই। তাহাতে তাড়িতের অপচয় হয়।

কথায় কথায় সৎপ্রসঙ্গের কথা উঠিল।

বাবা। সৎপ্রসঙ্গ লইয়া থাকিলে লোকের সদবুদ্ধি বাড়ে। যেখানে সৎপ্রসঙ্গ

হয় সেখানে দেবতাদেরও আগমন হয়। এখানে যে সৎপ্রসঙ্গ হইতেছে তাহার ফলে একজন দেবতা আসিয়াছেন।

এই বলিয়া হস্ত সঞ্চালন করিয়া গোপীনাথ ও অন্যান্য সকলকে আঙুল শুঁকিতে দিলেন; বলিলেন, "এই তাঁহার গাত্রগন্ধ।" গন্ধটি বেশ মধুর। গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আসিয়াছেন?"

বাবা। লক্ষ্মী আসিয়াছেন।

গোপীনাথ। দেবতাদের গাত্রগন্ধ কি ভিন্ন ভিন্ন?

বাবা। হাঁ, এক একজনের এক এক রকম। গন্ধ দিয়া দেবতাদিগকে চেনা যায়। শ্রীকৃষ্ণের গায়ের গন্ধ সংগ্রহ করিয়া একবার তোমাদিগকে দেখাইয়াছিলাম।

গোপীনাথ। হাঁ। (ইহার বিবরণ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ পঞ্চম খণ্ডে আছে।)*

গোপী। জীবেরও গন্ধ আছে?

বাবা। আছে বই কি! তোমাদের এক একজনের গাত্রগন্ধ যদি আকর্ষণ করিয়া দেখাই, তবে হয়ত তোমাদের বমি হইবে।

বাবাও যখন সূক্ষ্ম শরীরে কোথাও যান তখন তথায় নানারূপ সুগন্ধ পাওয়া যায়, একথা পূর্বে লিখিয়াছি। আমার ভাই বৌমার দীক্ষার পরে আমাকে লিখিয়াছিল, একদিন তাঁহার বাসায় অকারণে অতি সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। তখন বাবা কলিকাতায়। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি দেখিতে গিয়াছিলেন।

অন্য একদিন বাবা প্রসঙ্গক্রমে বলেন, সুষুম্না নাড়ীর পথ খুলিয়া গেলে যোগী সর্বদা যুক্ত অবস্থায়ই থাকেন।

গোপীনাথ। আপনি যখন আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন বা বাহ্য বিষয়ে চিন্তা করেন তখনও যুক্ত অবস্থা বলা যায় কি? সুষুম্না পথ খোলা থাকে কি?

বাবা। অবশ্য থাকে। তোমাদের সঙ্গে যে কথাবার্তা ইত্যাদি হয় তাহাতে যুক্ত অবস্থার ব্যতিক্রম হয় না। এ সকল বাহিরের আবরণের ব্যাপার। যখন ক্রিয়ায় বসি তখন সকল আবরণ মুক্ত করিয়া লই।

* "শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ" ৩য় খণ্ডে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এইরূপ একটি উক্তি আছে—"দেবদবী ঋষিমুনিরা দয়া ক'রে যেস্থানে আসেন সেস্থানে তাঁদের কৃপাতেই তাঁদের গায়ের গন্ধ কেহ কেহ পান। ......কখনও ধূপ ধুনার গন্ধ, কখনও চন্দন গুগ্‌গুলের গন্ধ, কখনও পদ্মগন্ধ, কখনও অন্যপ্রকার সুগন্ধি ফুলের গন্ধ, মর্তমান কলার গন্ধ, কাঁঠালের গন্ধ. আবার ফকির সাহেবদের আগমনে গাঁজার বা লোবানের গন্ধ পাওয়া যায়। সে সময়ে তাঁদের চরণ উদ্দেশে ভক্তি করে প্রণাম করতে হয়, আর স্থির হয়ে বসে খুব নাম করতে হয়।......"

গোপী। তখন অন্তের দেখা নিষিদ্ধ কেন ?

বাবা। সব খুলিয়া লওয়া হয় কিনা ; উহাতে তাদের অনিষ্ট হইতে পারে।

গোপী। তখন আপনার দেহের কোনও পরিবর্তন হয় কি ?

বাবা। কিছু হয়। বর্ণটা সাদা হয়—আরও কিছু হয়।

বাবা আর বেশী কিছু বলিলেন না—যেন ইচ্ছা করিয়া একটু চাপিয়া গেলেন।

এই বিষয়ে যতীশ বসুদাদা যাহা লিখিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। খ্রী. ১৯২০ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি শ্রীশ্রীবাবা সহ পুরী আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। এক রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা যে প্রকোষ্ঠে থাকিতেন ও ক্রিয়াদি করিতেন তাহার সংলগ্ন হলঘরে তিনি (যতীশ) শুইয়াছিলেন। মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন—বাবার প্রকোষ্ঠ ও হলঘরের মধ্যে যেন কোনও প্রাচীর নাই, বাবা স্বীয় প্রকোষ্ঠে যোগাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার শরীর দুগ্ধবৎ শুভ্র ও বিশেষরূপে স্ফীত এবং নয়নযুগল, ললাট, নাসিকা সবই স্বাভাবিক হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ও সুগঠিত—অথচ তিনি ভিন্ন যে আর কেহ নহেন ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। যতীশ মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী প্রাচীর পুনরায় ব্যক্ত হইয়া পড়িল ("শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ"—৪র্থ খণ্ড)।

শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত গোপীনাথের সঙ্গে যে যুক্তাবস্থার কথা বলিতেছিলেন সে বিষয়ে সর্বসাধারণের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। যুক্তাবস্থা বা সমাধির সময় বাহ্য জগতের সহিত সকল ব্যবহার স্থগিত হয়—আপাত দৃষ্টিতে একটা সুপ্তি বা বাহ্যজ্ঞানহীন দশা উপস্থিত হয়—ইহাই সকলের ধারণা। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রও কতকটা এই ধারণার অনুকূল এইজন্য বলা যায় যে চিত্তবৃত্তিনিরোধকে তথায় যোগের চরম সীমা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উচ্চতম যোগীরা তাহা মনে করেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা চিত্তনিরোধকে প্রকৃত সমাধি বলিয়া স্বীকার করেন না। কৌতূহলী পাঠক শ্রীসন্তদাস বাবাজী লিখিত শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনীতে দেখিবেন শ্রীমৎ কাঠিয়া বাবা বলিতেছেন, লোকে সাধারণতঃ যাহাকে সমাধি বলে তাহা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এক আসনে ছয়মাস কাল স্থায়ী হইলেও জড় সমাধি ব্যতীত কিছু নহে। তাঁহার স্বমুখের ভাষা এইরূপ— "আরে এ জড় সমাধি নেই তো কেয়া ? জড়কা মাফিক তো রয়তাই হ্যায় পরমাত্মস্বরূপ হোনা তো আউর হ্যায়, ওয়ে এক বখ্‌ত হোনেসে কব্‌হি ছোড়তা নেহি...সদা এক অখণ্ড রয়তা।" শ্রীকাঠিয়া বাবা যাহাকে "পরমাত্মস্বরূপ হোনা" বলিলেন, উহাই উচ্চতম যোগীদের মতে প্রকৃত যোগ—পরমেশ্বরত্ব। ঐ যোগ

কখনও খণ্ড হয় না। বাহ্য জগতের সহিত সকল প্রকার ব্যবহার রক্ষাকালেও উহা থাকে। উহাই প্রকৃত সমাধি—চৈতন্য সমাধি।*

৬ই কার্তিক আমার শরীর অসুস্থ হয়। দুই-তিনদিন আশ্রমে যাইতে পারি নাই ; আমার ভাই গোপীনাথ সহ আশ্রমে যাইতেছিল। আমরা গোপীনাথের বড়দেও পল্লীর বাসার অতি নিকটে খুদাই চৌকিতে ছিলাম, গোপীনাথ ও আমরা প্রায় একসঙ্গেই আশ্রমে যাইতাম। তাহার মুখে শুনি ৬ই কার্তিক বাবার শরীর খুব অসুস্থ হয়। তিনদিন তিনি দোতলা হইতে নীচে নামেন নাই। একদিন তিনি প্রকাশ করেন পূর্ব রাত্রিতে উমা ভৈরবী মা আসিয়াছিলেন। উমা মা জ্ঞানগঞ্জের একজন অত্যুন্নতা যোগিনী এবং অত্যন্ত করুণাময়ী—এই কথা বাবা সর্বদা বলিতেন। জ্ঞানগঞ্জে যোগসিদ্ধা মাতৃগণের "ভৈরবী" আখ্যা যোগীদিগের "পরমহংস" অবস্থার তুল্যতাসূচক, একথা পূর্বে (পৃ. ৪২) বলিয়াছি। গোপীনাথের স্ত্রী কয়েকবার কঠিন পীড়ায় বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় বাবার সঙ্গে ইঁহাকে দেখিয়াছেন। সে যাহা হউক, উমা মা আসিয়া বলেন "তোমার যখন এত শিষ্য তখন তোমার শরীর ভাল থাকিবে কিরূপে ? একটা কাজ করিও, কাল প্রাতে প্রথম যে কুমারীকে দেখিবে তাহাকে একখানি বেনারসী শাড়ী ও একটি টাকা দিও।" তাহাই করা হয়। বাবার ঐ কথায় সকলেই অনুমান করেন যে, বাবা কোনও শিষ্যের ব্যারাম টানিয়া নিয়া নিজে ভোগ করিতেছিলেন। পরে একদিন বাবা স্বমুখেই আমার স্ত্রী, বৌমা প্রভৃতির কাছে প্রকাশ করেন যে, তাঁহার শিষ্য (এখন পরলোকগত) বিভাস দত্ত (কলিকাতা টাকশালের দেওয়ান বা Bullion-Keeper) রক্তের চাপবৃদ্ধিতে বড় কষ্ট পাইতে থাকিয়া তাঁহাকে পত্র লিখায় তাহারই অসুখটা তিনি টানিয়া নিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে দেখি বিভাস দত্ত ও তাঁহার ভ্রাতা যতীশ দত্ত (ইনিও আমাদের গুরুভাই) কাশীতে উপস্থিত। বিভাসদাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাবাকে পত্র লেখার পর হঠাৎ তাঁহার শরীর সুস্থ হওয়ায় তিনি বুঝিলেন এটা বাবারই কৃপা। তাই তিনি ছুটিয়া বাবাকে প্রণাম করিতে কাশী আসিয়াছেন।

বড় বড় রোগটানা ব্যাপার শ্রীশ্রীবাবার লীলায় বহুবার হইয়াছে। একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘটনা একদিন আমার সমক্ষেই হইয়াছিল। বিলাসীপাড়ার নৃপেন্দ্র চৌধুরীদাদা এক রবিবার প্রাতে ভয়ানক সর্দি নিয়া ভবানীপুর রূপনারায়ণ

* শ্রীসন্তদাস বাবাজী (পূর্বাশ্রমে অবস্থানকালে অর্থাৎ কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল তারাকিশোর চৌধুরী অবস্থায়) যখন তাঁহার ভাবী গুরু শ্রীকাঠিয়া বাবার আশ্রমে প্রথম আসেন তখন তিনিও প্রচলিত ধারণাবশে বাবাজীকে কথায় কথায় "সমাধিস্থ" হইয়া থাকিতে না দেখিয়া এবং নানারূপ লোকব্যবহারে লিপ্ত দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলেন। শ্রীকাঠিয়া বাবাজী যে তাঁহার সংস্কারানুরূপ যোগাবস্থার বহু উর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন এ বোধ তাঁহার পরে আসিয়াছিল।

নন্দন লেনের আশ্রমে বাবার কাছে আসেন। সে সময়ে তিনি প্রত্যহ আসিতেন। সেদিন বাবার কাছে বসিয়া বসিয়া তিনি বারবার হাঁচিতেছিলেন তাঁহার চোখ ছল-ছল করিতেছিল এবং তিনি বারবার রুমাল দিয়া নাক ও চো মুছিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবা হঠাৎ দুই-চারিবার হাঁচিলেন, চোখ-নাক দু'একবার মুছিলেন। তারপর নৃপেন্দ্র দাদাকে বলিলেন, "এখন কেমন আছ?" নৃপেন্দ্রদাদা বা আমরা কেহই ব্যাপারটা বুঝি নাই—বিশেষ লক্ষও করি নাই বাবার প্রশ্নে নৃপেন্দ্রদাদা বলিলেন, কই আমার ত সর্দির উৎপাতটা আর নাই বাবা খুব হাসিলেন। তখন সকলে বুঝিলাম, আর বাবাও স্বীকার করিলেন তিনি নৃপেন্দ্রদাদার সর্দিটা টানিয়া নিয়া নিজে অল্পক্ষণমাত্র ভুগিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

৯ই কার্তিক বাবার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হওয়াতে নীচে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন। ঐদিন অন্য কথার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা কি কলিকাতায় ফিরিয়াই বণ্ডুল চলিয়া যাইবেন?' (ঐরূপই প্রস্তাব ছিল।)

বাবা। সেই রকমই ত ইচ্ছা। তবে কিছু ঠিক নাই। আমার কিছু ঠিক আছে এ কথা আগে হইতে বলা চলে না।

আমরা দুই ভাই ও গোপীনাথ বাবার পদপ্রান্তে বসিয়া ছিলাম। গোপীনাথ বলিলেন, ভবিষ্যৎসম্বন্ধে যোগীরাও একেবারে ঠিক বলিতে পারেন না?

বাবা। যোগজ্যোতিষ অবলম্বন করিলে পারে। তা'ছাড়া আর যা ধরিয়া হিসাব করা হইবে তাহাতেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গোপী। এই রকম প্রভেদ কেন হয়?

বাবা। জগতে এক যে স্থির অনির্বচনীয় বস্তু আছে, যোগজ্যোতিষ তা হইতে ঘটনার সূত্র আহরণ করে। তা'ছাড়া আর সকল বস্তু, সকল শক্তি অস্থির। তাহা হইতে যাহা কিছু আনিবে তাহাতে অস্থিরতার—অনিশ্চয়ের বীজ অবশ্য থাকিবে।

গোপী। কিন্তু আপনি একবার বলিয়াছিলেন, যোগজ্যোতিষেও ভুল হয়

বাবা। ভুল যোগজ্যোতিষের নয়। যে গণনা করে তার সেই সত্যকে স্পর্শ করিবার মধ্যে কিছু ত্রুটি ঘটিলে ভুলের সম্ভাবনা থাকে।

এই বলিয়া বাবা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার কথাও সব সময়ে একরকম হয় না। এক সময়ে হয়ত একরূপ বলি, অন্য সময়ে আবার অন্যরূপ বলি।"

গোপী। কেন এমন হয়?

উত্তরে বাবা অনেক কথা বলিলেন। উহার মর্ম সংক্ষেপে এইরূপ:—তিনি যখন যাহা বলেন, তখন তাহাই সত্য। যে শুনিতেছে তখন সেটাই তাহা

গ্রহণীয়। জগতে ত কিছুই একরূপ নয়। বাবা যেটিকে যাহা বলিবেন সেটি তাহারই কাজ করিবে। যদি একটা গাছের পাতাকে বলেন এটা এক টুকরা সোনা, তবে তিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন যে, আমরা পাতা মনে করিলেও সেটা পাতা নয়—পাতার কোনও ক্রিয়া তাহা দ্বারা হয় না, সোনার সব ক্রিয়াই হয়। তিনি কতবার এক ফুলকে (যেমন জবাকে) অন্য ফুল (যেমন গোলাপ) বলিয়া তাহাকে সেই ফুলেই পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই পরিবর্তনশীল জগৎ লইয়া ব্যাপার করিতে গেলে দেশকালপাত্রভেদে সাধারণ কথা, উপদেশ ও তত্ত্বব্যাখ্যার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। সব তথ্য সকলের সমান উপযোগী নয়, সকল অবস্থায় একজনেরও তুল্যরূপ উপযোগী হয় না। তাহাতেই সব সময় বাবার কথার পূর্বাপর সামঞ্জস্য সকলে দেখে না। কিন্তু তিনি যখন যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই সে মনে রাখিয়া তদনুসারে কাজ করিয়া গেলে অবশ্য কল্যাণ হইবে।

শ্রীশ্রীবাবার উপদেশ ব্যক্তিবিশেষে কিরূপ ভিন্ন হইত তাহার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত গোপীনাথের মুখে শুনিয়াছি। একদিন রূপনারায়ণ নন্দন লেনের আশ্রমে বাবা, গোপীনাথ এবং আরও কয়েকটি শিষ্য বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শিষ্যদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'বাবা তীর্থে যাইব মনে করিয়াছি।'

বাবা। কোথায় কোথায় যাইবে?

শিষ্যটি কতকগুলি স্থানের নাম করিলেন।

বাবা। বেশ, খুব ভাল। তীর্থ ভাল স্থান—সেখানকার পরমাণু ভাল; যাহাতে উপকার হয়। কবে যাইবে?

শিষ্য। অমুক তারিখে।

বাবা। বেশ, ফিরিয়া আসিয়া পত্র দিও।

শিষ্যটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মিনিট কয়েক পরে অপর একটি শিষ্য বলিলেন, "বাবা, আমিও ত ঐ দাদার সঙ্গে তীর্থে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

বাবা। তীর্থে কেন?

শিষ্য। ভাবিতেছি, একবার কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসি। সঙ্গী পাওয়া গিয়াছে, এরূপ সুবিধা সবসময় হয় না।

বাবা। তীর্থে কি আছে বাপু? ঘরেই বা কি নাই? মিছামিছি কষ্ট স্বীকার ও অর্থব্যয়।

শিষ্য। তবে যাব না?

বাবা। আমি ত, বাপু, কোনও প্রয়োজন দেখি না। তোমার ইচ্ছা।

'তবে আর যাব না' বলিয়া এই ভদ্রলোকটি উঠিয়া গেলেন। তখন গোপীনা: বলিলেন, 'আপনি যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুইরকম কথা বলিলেন।'

বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন, "অমুকের (প্রথমকথিত শিষ্যটির) মন ব: বিক্ষিপ্ত, কর্ম কিছু হইতেছে না। একটু ঘুরিয়া আসিলে উপকার হইতে পারে আর অমুকের (দ্বিতীয় ব্যক্তির) ভিতরটা একটু গড়িয়া উঠিতেছে। এখন যদি ও তীর্থে ঘুরিতে যায়, তাহা হইলে যাহা হইতে'ছল তাহাতে বাধা পড়িবে,—ম: বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে; তাহাকে আবার ঠিক করিয়া কর্মে বসাইতে অনেক সম লাগিবে। তাই দুইজনকে দুইরকম কথা বলিতে হইল।"

যেদিনের কথা পূর্বে হইতেছিল সেইদিন প্রসঙ্গক্রমে কুম্ভকের কথা আসি: পড়াতে গোপীনাথ প্রশ্ন করেন, 'কুম্ভক কতপ্রকার?"

বাবা। চারিপ্রকার। নাসাকুম্ভক, মুখ দ্বারা কুম্ভক, গুহ্যদ্বার দিয়া কুম্ভক : ক্রিয়া দ্বারা কুম্ভক। ক্রিয়া দ্বারা যে কুম্ভক তাহা হয় নাভিদ্বার দিয়া, পরে উ: হইতে ক্রমে সমস্ত লোমকূপ দিয়াও হয়।

গোপী। এই কয়প্রকার কুম্ভকের মধ্যে ইতরবিশেষ কি?

বাবা। নাক, মুখ ও গুহ্যদ্বার দিয়া যে কুম্ভক তাহা হইলে আত্মবোধ থাকে না। কুম্ভক ঠিক ঠিক হইলেই দেহ মাটি ছাড়িয়া উপরে উঠিবে; কিন্তু নাক, মুখ, গুহ্যদ্বার দ্বারা কুম্ভককারী নিজে বুঝিতে পারে না যে তাহার দেহ উঠিয়াছে ন: উঠিতেছে। সে একটা ভাবে ডুবিয়া থাকে এবং তাহাতে নিজ ব্যক্তিত্বব' রাখিতে পারে না। ক্রিয়া দ্বারা কুম্ভকে যোগী সব জানেন, এমন কি ইচ্ছাম: দেহ চালনাও করিতে পারেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত থাকে, এমন কি লোকব্যবহারও তিনি সম্পন্ন করিতে পারেন। ক্রিয়াকুম্ভক দ্বারা দেহের আকর্ষ শক্তিও খুব বাড়ে, যাহা ইচ্ছা তাহা আকর্ষণ করিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ ধরিয়া রাখা যায়।

এই বলিয়া সম্মুখস্থ মসলার কৌটার ডালাটির উপর দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা চাপ দিয়া সেটি শূন্যে তুলিয়া চারিদিকে নানাভাবে হস্ত সঞ্চালন করিয়া দেখাইলেন উহা পড়িতেছে না। বলিলেন, কেহ টানিয়াও এটা আঙুল হইতে ছুটাইতে পারিবে না। বরং সে তাড়িত দ্বারা আহত হইবে। এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলিলেন এবং অবশেষে হাতটি একটা কায়দায় ঘুরাইয়া টিনের ডালাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। গোপীনাথ লক্ষ করিয়াছিল যে, ডালাটি তুলিবার সময় বাবা হাত যে কায়দায় ঘুরাইয়া তাহা ধরিয়াছিলেন, রাখিবার সময় তাহার বিপরীত কায়দায় হাত ঘুরাইয়াছিলেন। বাবা এইরূপ ব্যাপারে তর্জনীমাত্র দ্বারাই বস্তু ধরিতেন, উহার কারণ বোধ করি এই যে, ঐ অঙ্গুলিতেই তড়িৎ-শক্তি অধিক।

ঐদিন যথাসময়ে ক্রিয়ার উপযোগিকালসম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। সকল কার্যেরই সময় আছে। অসময়ে কোনও কাজই সুসম্পন্ন হয় না। চারিটি সন্ধিক্ষণ আছে;—সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, মধ্যাহ্ন ও মহানিশা। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে যে বস্তু আসে তাহা হইতে সূক্ষ্মতর ও স্থিরতর বস্তু পাওয়া যায় মহানিশায়—রাত্রি ১১টা হইতে ৩টার মধ্যে। সূর্যোদয়ের সাধনা রাত্রি ৪টায়—অন্ততঃ ৫টায় আরম্ভ করিতে হয়। সূর্যোদয়ের পর দুইঘণ্টা ঐ সন্ধিক্ষণটি থাকে। সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণ সূর্যাস্তের অর্ধঘণ্টা পূর্ব হইতে ২ ঘণ্টা পর পর্যন্ত থাকে। মধ্যাহ্নের সন্ধি সম্বন্ধে বাবা কিছু বলেন নাই। ঐ সন্ধিতে কর্তব্য কোনও ক্রিয়াও কাহাকেও দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জানকীদাদারা কাশীতে গিয়া দুই-তিনদিন আশ্রমেই ছিলেন। ঐ সময় মধ্যে বাবা উপস্থিত শিষ্যগণকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন। জানকীদাদা উহা নোট করিয়া আনিয়া স্বীয় ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন। আমি সেইখান হইতে পাইয়াছি। আমরা বাহিরে বাসা করিয়াছিলাম, সবসময়ে আশ্রমে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই বলিয়া এসব উপদেশ বাবার মুখ হইতে পাই নাই।

১। দুইবেলা যথাসময়ে আহ্নিক করিয়া যাইবে। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় হউক, সে জন্য বিশেষ ভাবিও না। দুইবেলা যথাসাধ্য ক্রিয়া করিবে। আর সব ভার আমার। আমার উপর নির্ভর করিতে শিখ, দৈব বা মানুষ কোনও শক্তি তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও।

২। দীন-দুঃখীকে সাধ্যমত কিছু কিছু দান করিও।

৩। তোমরা স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদিকে ভালবাস। আমাকেও তেমনই আপনার জন ভাবিয়া ভালবাসিও। আর আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাহি না। তোমাদের স্ত্রী-পুত্রেরা টাকা-পয়সা চায়; কেহ কি বলিতে পার—আমি কখনও কাহারও কাছে কিছু চাহিয়াছি?

৪। কোনও বিষয়ে ভাবনা করিও না, আমি আছি। তোমাদের অনেকের ইচ্ছা - হু হু করিয়া টাকা আসিতে থাক। মনে করিও তোমাদের কল্যাণের জন্য যা' যতখানি দেওয়া বা করা দরকার তাহা আমি দিতেছি ও করিতেছি।

৫। অসৎসঙ্গ করিও না। মন সর্বদা স্থির ও শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং মিতাহারী হইবে।

৬। তোমরা যাহা কর আমি সব জানি। আমাকে ফাঁকি দিয়া কিছু করিবার চেষ্টা করিও না।

ষোল

আমরা ১৩ই কার্তিক (১৩৩৯ সাল) কাশীধাম ত্যাগ করিয়া আসি। শ্রীশ্রীবাবাও তাহার অল্প পরেই ২৯শে কার্তিক কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১লা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার বিকালে বাবার পদপ্রান্তে অনেক শিষ্য সমবেত হন। কথায় কথায় নির্ভরের কথা উঠে। বাবা বলেন, "ক্রিয়া কর, ক্রিয়া কর, তাহাতেই নির্ভর আসিবে, সকল বুঝিতে পারিবে, আর বিচলিত হইবে না। ক্রিয়া করিলে ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করা যায়। তাহা ত অনবরতই মাথার উপর ঝরিতেছে, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ কি? স্ত্রীর পিছনে, অর্থের পিছনে, ভাল খাদ্যের পিছনে ছুটিতেছ, তখন তোমরা কর্তা; কেবল সাধন-ভজনের বেলায়, 'বাবা, কৃপা করুন'।"

জানকীদাদা। বাবা, কাম, ক্রোধ, লোভ দিয়া ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যে স্ত্রী অর্থ বা মাছমাংসের পিছনে ছুটি, এটা কি আমাদের দোষ? এগুলি আমাদিগকে যেমন আকর্ষণ করে, আহ্নিক তেমন আকর্ষণ করে না কেন?

বাবা। আকর্ষণ যাহাতে করে সেইজন্য ত বলি ক্রিয়া কর, ক্রিয়া কর। ক্রিয়া করিতে করিতে রসবোধ হইবে। রস পাইলে তাহাতে অনুরক্তি আসিবে। সে রসে মজিলে অন্য কিছুই আর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

৪ঠা অগ্রহায়ণ রবিবার বাবার ভোগের জন্য কয়েকটি ফল হাতে করিয়া ৯টার পরে আশ্রমে পৌঁছি। পরম স্নেহবান্ বাবা এই অধমের হাতে অতি সামান্য কয়েকটি ফল দেখিয়া তুষ্টি প্রকাশ করিলেন—যদিও তাঁহার ভোগের জন্য বহু বহু উৎকৃষ্টতর ফলের অভাব কখনই হইত না। বিধুদাদা কেদারদাদা প্রভৃতি ভক্তিমান্ ও সেবাপরায়ণ শিষ্যেরা সর্বদাই প্রতিঋতুর শ্রেষ্ঠ ফল বাজারে আসিতে আরম্ভ করিলেই বহুমূল্য দিয়া গুরুসেবার্থ কিনিয়া আনিতেন। সে যাহা হউক, এই দিন উপদেশরূপে বাবা বলেন, "মনে কখনও অহঙ্কার আসিতে দিবে না। অর্থে যাহাতে অহঙ্কার না জন্মে সে জন্য সতর্ক হইবে। অর্থ ক'দিন থাকে? গুশকরার নীলুবাবু অর্থশালী লোক ছিল; সর্বদা মোসাহেব-বেষ্টিত হইয়া থাকিত। একদিন আমি বলিলাম, 'এ সব আর কতদিন?' ছয়মাস-মধ্যেই তাহার সব গেল। আমিও বাপু অনেক টাকা রোজগার করেছি, খরচও করেছি। তাই বলে ভেব না যে, আমি তোমাদের কাছে কিছু চাই। ইহাও ভেব না যে, তোমরা না দিলে আমার চলবে না। আমার ঝুলি ঝাড়লেই হাজার টাকা বেরয়। তোমাদের কাছে আমি শুধু এই চাই তোমাদের সুমতি হোক, তোমরা সদ্বৃত্তি পোষণ কর।"

আবার বলিলেন, "আমার শরীর যে ভাল থাকে না সেটা কিসের জন্ম? তোমাদেরই জন্ম। নচেৎ আমার শরীরের আবার ভালমন্দ কি রে, বাপু?"

কে একজন পথ্যপ্রসঙ্গে ভাইটামিনের কথায় বলিলেন, আজকাল ডাক্তারেরা শাকসবজি কাঁচা খাওয়ার কথা বলে। বাবা স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা হইতে বলিলেন, 'এখন গরু-ঘোড়ার খাবার সব যাবে দেখছি।" অন্ত একদিন এক শিষ্য ডাক্তারের পরামর্শে কাঁচা টমাটো খাইতে খাইতে ভীষণ আমাশয়ের পীড়ায় কিরূপ বিপন্ন হয় তাহা বলিয়া আমাদিগকে খুব হাসাইয়াছিলেন। ফলমূল-সম্পর্কে একদিন বলিলেন, "শাঁকআলু ও নারিকেল স্নায়ুমণ্ডলের পক্ষে উপকারী।"

৭ই অগ্রহায়ণ (খ্রীঃ ২৩।১১।৩২) শ্রীশ্রীবাবা বর্ধমান এবং তথা হইতে ১৩ই অগ্রহায়ণ বণ্ডুলে যান। বণ্ডুলে তিনি এবার কিছু অধিক দিন ছিলেন। সঙ্গে গিয়াছিলেন রায়সাহেবদাদা, দুর্গাকান্তদাদা ও করালীদাদা। ঐ স্থান হইতে শ্রীশ্রীবাবা এই অধমকে এক পত্রে লিখেন, "আদেশ মত ঠিকভাবে কর্ম করিলেই নিশ্চয়ই আশাতীত ফল পাওয়া যাইবেই যাইবে।......সকলে ও নিজে একটি চিন্তা ছাড়া কোন চিন্তা করিবে না।" জানকীদাদাকে একপত্রে লিখেন, "ইচ্ছাশক্তির যে কত শক্তি তাহা সকলে জানে না। মানুষে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই হয়, যদি ইচ্ছার মত ইচ্ছা করে।"

পৌষের প্রথমভাগে বিভাস দত্ত ও যতীশ দত্তদাদাদের সঙ্গে শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়দাদা বণ্ডুলে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণদর্শনার্থ যান। ঐ সময়ে তিনি একদিন শরৎদাদাকে বলেন "রবিবারে রবিবারে জানকীর ওখানে তোমাদের আড্ডাটা ভাল হয় হে।" এই আড্ডায় আমরা প্রধানতঃ বাবার কথাই আলোচনা করিতাম। যদিও আমাদের ঐরূপ সম্মেলনের কথা বাবাকে কখনও বলা হয় নাই, তথাপি দেখা গেল তাঁহার তাহা অজ্ঞাত ছিল না।

বড়দিনের ছুটিতে জানকীদাদা, রজনীদাদা প্রভৃতি অনেকে বণ্ডুলে যান। কাশী হইতেও শ্রীযুক্ত গোপীনাথ, সতীশচন্দ্র দে ও তৎপুত্র শ্রীমান্ সুরেশ, গিরিধারীলাল ব্যাস, প্রিয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে এবং উড়িষ্যা হইতেও দুইজন আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কুমারীসেবার্থ কেদার ভৌমিকদাদা ১০ জোড়া সাতহাতী ও আটহাতী শাড়ী নিয়া যাইবার জন্ম আদিষ্ট হইয়াছিলেন। সেখানে ইতঃপূর্বে আরও কয়েকদিন কতকটি করিয়া কুমারীভোজন করান হইয়াছিল বলিয়া খবর পাইয়াছিলাম।

গোপীনাথ প্রভৃতি কাঁচা পথে এক ভারী লরিতে যান; পথে কয়েক বার গাড়ী উল্টাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহারা পৌঁছিলে বাবা তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "মোটর গাড়ীতে কেন আসিলে না? সমস্ত রাস্তা আমাকে তোমাদের পাহারা দিতে হইয়াছে।" আমি যে মাথাঘোরা (car-sickness)

ব্যারামের ভয়ে যাইতে পারি নাই সে কথা গোপীনাথ বাবাকে বলাতে বাবা বলেন, "না আসিয়া ভালই করিয়াছে, আসিলে আমাকেই বমি করিতে হইত।"

ইহারা ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম, একদিন কেদারদাদা ও যতীশ বসুদাদা কুমারীভোজন করাইতে স্বীকৃত হওয়াতে বাবা একটি টাকাকে রূপার প্লেটে পরিণত করিয়া উহাতে অপূর্ব হরগৌরী-মূর্তি দেখাইয়াছিলেন।

মাঘ মাসের প্রথমভাগে একদিন শেষরাত্রিতে করালীদাদা ও রায়সাহেবদাদা হঠাৎ বাবার কোনওরূপ উৎকট দৈহিক ক্লেশসূচক শব্দ শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া দেখেন বাবা অত্যন্ত অসুস্থ ; দেহের ভিতরে একটা যাতনা ও প্রবল শ্বাস-কষ্ট। তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে মালিশাদি করিলেন। অনেক বেলা পর্যন্ত এরূপ রোগ-যন্ত্রণা ছিল। এই সংবাদ বর্ধমানে পৌঁছিলে পূজনীয় গুরুপুত্র দুর্গাদাদা ডাক্তার দিয়া দেখানের উদ্দেশ্যে বণ্ডুল গিয়া বাবাকে বর্ধমানে নিয়া আসেন। বাবা কয়েকদিন বর্ধমানে এইজন্য থাকিবেন এই সংবাদ পাইয়া আমি ১৫ই মাঘ শনিবার তাঁহার দর্শনোদ্দেশ্যে বর্ধমানে যাই। ঐ দিন মুসলমানদিগের ঈদপর্ব উপলক্ষে আফিস বন্ধ 'ছল। স্টেশনে গিয়া আরও দুইটি গুরুভাইকে (বিজয় বসু ও অবনী দত্ত) সঙ্গী পাই। আশ্রমে পৌঁছিয়া বাবার শ্রীচরণপ্রান্তে প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজকাল বাবার শরীর কেমন ?" বাবা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখে কি মনে হয় ?"

আমি। চেহারাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ত দেখিতেছি না। শুনিয়াছি বণ্ডুলে একদিন বাবার শরীর খুবই অসুস্থ হইয়াছিল।

বাবা। হাঁ, খুব।

আমি। হঠাৎ এরূপ অসুখ কেন হইল ? Colic-এর (শূলবেদনার) মত হইয়াছিল শুনিয়াছি।

বাবা। না, colic নয়। ঐ শ্যামাগতির হার্টের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেটা টেনে নিতে হল। তাতে বোধ হল আমার বুকের ডালা (বাবা হস্তভঙ্গী দ্বারা দেখাইলেন) যেন কেহ হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিল। চোট্‌টা সামলাইয়া নিতে চারঘণ্টা সময় লেগেছিল।

দয়াল ঠাকুরের এই লীলার কথা শুনিয়া হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভক্তিতে ভরিয়া গেল। শ্যামাগতিদাদা কাছেও ছিলেন না ; তিনি লোধনা কোলিয়ারির (Colliery) ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। বাবা রাত্রিশেষে আহ্নিক করিতে করিতে টের পাইলেন শ্যামাগতিদাদার হার্টের কাজ বন্ধ হইতেছে—আর অমনি নিজের বুক পাতিয়া দিয়া সেই ব্যাধিটা নিলেন। ভাবিলাম, "বলিহারি গুরু! কত হাজার জন্মের পুণ্যের বলে এমন গুরুর পদাশ্রয় পাওয়া যায়! না—না ; তা'ও নয়। আমার পুণ্য-বল কোথায় ? থাকিলে আরও অনেক দিক দিয়া তাহা

প্রকাশ পাইত। এ পরম কৃপাময়ের পরম কৃপার খেলা!” শ্যামাগতিদাদা কর্মী শিষ্য জানিতাম। তাঁহাকে আরও কর্ম করিবার অবসর দিবার জন্যই জীবনের মেয়াদ বোধ করি বাড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৌমাকে নিয়ে এলে না কেন?” আমার স্ত্রী যাওয়ার অভিপ্রায় করিয়াও বাবার শরীর অসুস্থ মনে করিয়া এবং সাংসারিক ঝঞ্ঝাটও ছিল বলিয়া শেষে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। আমি আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া সেই কথা বলিলাম।

বাবা। তোমার মেয়েকে আনলে না কেন?

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম আমি খুব ভোরে বর্ধমান চলিয়া গিয়াছি শুনিয়া আমার মেয়ে অতসী এই বলিয়া বারবার আক্ষেপ করিতেছিল যে, আমি বর্ধমান যাইব সেকথা সে পূর্বে জানিলে নিশ্চয় আমার সঙ্গে যাইত। বাবা যখন মেয়েকে কেন আনি নাই এই প্রশ্ন আমাকে করেন, তখন আমি মেয়ের তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষার কথা কিছুই জানিতাম না। কিন্তু তাহার কাতরতা ইতিমধ্যেই যথাস্থানে আঘাত করিয়াছিল।

ঐদিন অন্য ট্রেনে দুইজন ওড়িয়া গুরুভ্রাতা এবং আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতা বর্ধমানে গিয়াছিলেন। আমরা চলিয়া আসিলেও তাঁহারা ছিলেন। পরদিন রবিবার যোগেশ বসু ও যতীশ বসুদাদা প্রভৃতি আরও কয়েকজন শিষ্য যান এবং ইঁহারা সকলে বাবার সঙ্গে বণ্ডুলও গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে ঐদিন আমাদের অনেক প্রসঙ্গই হইয়াছিল। তন্মধ্যে শিক্ষার্থ ছেলেদিগকে বিলাতে পাঠানোর কথা একটি। বাবা বলিলেন, বিলাতে গিয়া ছেলেরা গোমাংসাদি অখাদ্য খায়, অনেকে ভ্রষ্টচরিত্রও হয়, যারা চরিত্র ঠিক রাখিতে পারে তাদেরও অনেকেরই চালচলন এরূপ হয় যে, যত রোজগারই করুক, আত্মীয়, ভাইবোন এমন কি বাপ-মাকেও বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারে না। মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে বলিলেন, মেয়েরা আজকাল বিবাহের পূর্বে অনেক বড় হয়, তাহাদিগকে অবাধে সকলের সঙ্গে মিশিতে দেওয়া ঠিক নয়। ঐ দিন বাবা বিলাত-ফেরতদিগের মধ্যে কাশীর ডাক্তার শোভারাম দাদার (ও তাঁহার স্ত্রীরও) খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শিষ্যদের মধ্যে অনেকেরই অনেক প্রশংসা তিনি করিতেন। হয়ত উত্তম শিষ্যেরা ঐ সব প্রশংসার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। কিন্তু বাবা মাদৃশ অধমেরও কত প্রশংসাই অন্যের কাছে (আমার অসাক্ষাতে এবং আমার সাক্ষাতেও মৃদুস্বরে) করিয়াছেন! কাজেই বুঝা যায় অনেক স্থলে প্রশংসার অধিক অংশই হইতে স্নেহময়ের নিজের গুণে। আমাদের ভিতরের কালিমা কি তিনি দেখিতেন না? তথায় ছোট বড় কত দোষ গজ্‌গজ্‌ করিতেছে তাহা কি জানিতেন না? তিনি ত

স্পষ্ট অনেক সময় বলিতেন, "জানি বলে জানি। তোমাদের যে দোষ তোমরাও জান না, তাও জানি। তোমাদের মধ্যে যেটুকু ভাল সেইটুকু ধ'রে ওঠাতে চেষ্টা করি।"

১৯শে মাঘ তারিখে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। স্টেশনে গিয়াছিলাম—তাঁহার যাওয়া-আসার সময় প্রায় প্রতিবারই স্টেশনে যাইতাম। তাঁহার করুণাময় হাস্যযুক্ত সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণে মনে হইত যেন ভিতরের সকল পাঁক ধুইয়া গেল। সে যাহা হউক, এবার লক্ষ করিলাম করালীদাদা ফিরেন নাই। কুঞ্জদাদা বলিলেন, "করালী ভাগিয়াছে"; আশ্রমের হিসাবপত্র রাখাতে তাহার রুচিও নাই, আর সে বলে সে তাহা কোনও কালে করে নাই বলিয়া পারেও না। তা' ছাড়া তাহার আশা ছিল এবং বাবাও ভরসা দিয়াছিলেন যে, তাহাকে সূর্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কয়েকমাস বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে দেখিল যে, সে আশা কম। তাই বাবা যখন বর্ধমানে আসেন, সেই অনুপস্থিতির সুযোগে সে বণ্ডুল হইতেই সরিয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া দুঃখ হইল। "গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা।" এত বড় একটা বিদ্যালাভ করিবেন, তার জন্য মাত্র কয়েক মাসের গুরুশুশ্রূষাই করালীদাদা যথেষ্ট মনে করিলেন!

২০শে মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার শয্যার উপরে একখানি খাতাতে কতকগুলি গান লিখিত দেখিতে পাই। ঐগুলি সবই বাবার রচিত; পুরাতন খাতা হইতে ও বাবার স্মৃতি হইতে কেহ লিখিয়াছেন। এই গানগুলি (মোট ৪৩টি) কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়। উহার মধ্যে বাবার দশ-এগার বৎসর বয়সের রচনাও আছে। পরে আমি বাবা হই'ত তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি গান পাই। সে বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

২৯শে মাঘ বাবা কথায় কথায় পরপিণ্ড প্রত্যাশার নিন্দা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এককালে ব্রাহ্মণদের এমন তেজ ছিল যে, দেবতারাও তাঁহাদিগের ভয় করিতেন। অভাবজনিত অশান্তিতে এবং পরপিণ্ড প্রত্যাশার পাপে সে তেজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্বে তাঁহারা নিজের জন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, অম্লানবদনে দারিদ্র্য ভোগ করিতেন, অন্য সকলের ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিতে সহায়তা করিতেন। এখন নিজেরা ঐশ্বর্যভোগের জন্য লালায়িত। তেজ থাকিবে কি করিয়া?

৩রা ফাল্গুন বাবা কাশী চলিয়া যান। ১০ই ফাল্গুন শিবরাত্রি উদ্‌যাপন করিয়া ১৮ই তারিখে পুনরায় কলিকাতায় আসেন। ২৯শে ফাল্গুন যোগেশ বসুদাদার গৃহে জন্মোৎসব হয়। ঐ দিন আমার সেজ ছেলের ছুটি ছিল না। তদ্ব্যতীত আমার সকল ছেলে, মেয়ে অতসী, এবং আমার স্ত্রী—আমরা সকলে

বাবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হই। অতসী বাবার জন্য স্বহস্তে চন্দন ঘষিয়া তদ্দ্বারা গুলি প্রস্তুত করিয়া ও তাহা শুকাইয়া সুন্দর একটি মালা তৈয়ার করিয়া নিয়াছিল। মালাটি বাবা স্বহস্তে গলায় ধারণ করিয়া অতসীকে ও আমাদিগকে পরম কৃতার্থ করিয়াছিলেন। উপস্থিত মহিলাগণ সকলেই মালাটি দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় বিপুল আয়োজনে কুমারীভোজন ব্রাহ্মণভোজনাদি সবই যোগেশ দাদার ব্যবস্থায় নিখুঁত ভাবে যথাসময়ে বিনা কোলাহলে এবং সুশৃঙ্খলা সহকারে সম্পন্ন হইয়াছিল।

৭ই চৈত্র (খ্রীঃ ২১।৩।৩৩) বাবার হঠাৎ রক্তের চাপবৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে খুব শ্বাস কষ্ট হয়। তজ্জন্য তাঁহাকে অম্লজান গ্যাস (oxygen) দিতে হইয়াছিল। ভোগ কয়েকদিন ছিল। সকল শিষ্যই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়াছিল। বাবা বলেন, "ভয়ের কারণ নাই, মরিব না। মরণ আমার আয়ত্ত, আমি মরণের আয়ত্ত নই।" কয়েক দিন পরে প্রকাশ পায়—বাবাই প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাঁহার অতি পুরাতন শিষ্য এবং বয়সেও প্রায় তাঁহার সমান (বোধ হয় কিছু বড়ই) ডাক্তার প্রতাপ-নারায়ণ সিংহের রক্তের চাপে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া তিনি তাহা টানিয়া নেওয়া আবশ্যক মনে করেন। পরে কাশীর গিরিধারীলাল ব্যাসদাদা কর্নেল ডেনহাম হোয়াইট নামক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারকে আনিয়া বাবাকে দেখান। তিনি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সামান্য একটু ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ব্যতীত কোনও দোষ দেখেন নাই। তদনুসারেই প্রেস্‌ক্রিপশন দেন। পরে আরও কয়েকদিন তিনি আসিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রথম দিনে বাবার অনন্যসাধারণত্ব কিছু বুঝেন নাই, দ্বিতীয় দিনে বাবা কি খান, কতক্ষণ ঘুমান ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাহা টের পান। বাবার অলৌকিক শক্তির বিষয়েও তিনি গিরীধারীদাদা, যোগেশদাদা হইতে কিছু শুনিয়াছিলেন। গিরিধারীদাদার অনুরোধে বাবা ডাক্তারের রুমালে তাঁহারই ফরমায়েশ মত গোলাপের গন্ধ (চশমার কাচের সাহায্যেই) করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে আরও কয়েকবার কর্নেল ডেনহাম বাবাকে দেখেন। প্রথম দিন সাহেব পুরা ভিজিটই নেন। দ্বিতীয় দিন "holy man" (সাধু পুরুষ) বলিয়া ভিজিট নিতে চান নাই, কিন্তু গিরিধারীদাদার সনির্বন্ধ অনুরোধে পুরা ভিজিটই নেন। পরে সাহেব অর্ধেক ভিজিট (ষোল টাকা) নিতেন।

কর্নেল ডেনহামের উপদেশ মত বাবার অন্ত্রে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা হয়। চিকিৎসক ছিলেন আমেরিকাপ্রত্যাগত মানিক মুখার্জি নামক ডাক্তার। কুপার ষ্ট্রীটে তাঁহারই বাড়ীতে গিয়া বাবা বৈদ্যুতিক চার্জ লইয়া আসিতেন। এই চিকিৎসার রকমটা কি আমি জানিতে চাহিলে যোগেশদাদা বাবার মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাঁহার সমক্ষে আমাকে তাহারই বিবরণ দিতে গিয়া বলেন,

"বৈদ্যুতিক যন্ত্রটি মাত্র ১৫ মিনিট লাগাইয়া রাখা নিয়ম, কিন্তু বাবার দেহে আধ ঘণ্টা লাগাইয়া রাখা হয়। ডাক্তার পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন, 'কষ্ট হচ্ছে কি? কষ্ট হচ্ছে কি?' উনি মেঘ থেকে হাত দিয়ে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করেন, ওঁর আর electric battery-তে কি কষ্ট হবে?" বাবা এপর্যন্ত আমাদের কথোপকথন নীরবে শুনিতেছিলেন, কিন্তু যোগেশদাদার শেষ কথাটি শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বিদ্যুৎ আকর্ষণ—সেটা অন্য শক্তির কাজ। আর এ চিকিৎসা হইতেছে স্থূল দেহে। স্থূল দেহে চিকিৎসার যে ক্রিয়া তা' হবেই। আমার যে লাগে নাই তার কারণ বোধ করি আমার অন্ত্রের বোধশক্তি (ডাক্তারের কথিত কারণে) কমে গিয়েছে। তাই একটু বেশী সময় যন্ত্রের ক্রিয়া সহ্য করতে পারি।" মহাপুরুষ কোনও বিষয়েই মিথ্যা-কৃতিত্ব নিতেন না, বরণ সত্য-কৃতিত্বই অনেক সময়ে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন।

প্রসঙ্গপ্রাপ্ত বলিয়া মেঘ হইতে বিদ্যুৎ আকর্ষণের সম্বন্ধ সংক্ষেপে এখানে বলা যায় যে, যোগেশদাদার পুত্র যতীশদাদা লিখিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবা যখন ভবানীপুর আশ্রমে, তখন একদিন বেলা ২টা-৩টার সময় খুব মেঘ ডাকিতেছিল ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। এমন সময় বাবা উঠিয়া গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তটি ৪।৫ বার সঞ্চালন করিয়া অল্প পরে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "আর মেঘ ডাকিবে না, বিদ্যুৎও চম্‌কাইবে না।" তাহাই হইল। কেবল বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীশ্রীবাবা হস্তপ্রসারণ করিয়া দেখাইলেন হাতের কব্জি হইতে কনুই পর্যন্ত আধ ইঞ্চি মোটা হরিদ্রাবর্ণের একটি রেখা পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যাপার আরও ঘটিয়াছে।

কিছুদিন পর হইলেও আর একটি ঘটনা এই স্থানেই উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হইবে। এটির বিবরণ আমি শুনিয়াছিলাম ঘটনার কয়েকদিন পরে যোগেশ বসুদাদারই মুখে। গুরুভাই ডাক্তার ফণিভূষণ মজুমদার নিজ চরিত্রগুণেই বাবার অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। তিনিও বাবার উনপঞ্চাশী দলের অন্যতম। তিনি একটি বিলাতী ঔষধ-ব্যবসায়ী কোম্পানির আফিসে দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন; এবং বাবার দেহরক্ষার অল্পকাল পরে পরলোকগমন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, একদিন তাঁহার খেয়াল হইল বাটী যাইবেন, হয়ত বিশেষ কোনও প্রয়োজনও ছিল। বাবা তখন কলিকাতায়। ফণীদাদা বাটী রওনা হইবার পূর্বে বাবাকে সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহার বাটী ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত কেশবপুর গ্রামে। যতদূর মনে পড়ে তারকেশ্বর স্টেশন হইতে হাঁটিয়া কয়েক মাইল যাইতে হয় এইরূপ শুনিয়াছিলাম। তিনি যখন সেই স্টেশনে পৌঁছিলেন তখন আকাশে ঝড়-জলের প্রবল আয়োজন হইতেছিল। একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণ (বোধ হয় স্বয়ং বাবাই নির্মাণদেহে) আসিয়া গায়ে পড়িয়া তাঁহাকে উপদেশ

দিলেন, "এখন মাঠের মধ্য দিয়া যাইবেন না। বরং দু'একঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যান।" ফণীদাদা সে উপদেশ গ্রাহ্য করা উচিত মনে করিলেন না, বলিলেন, 'কি আর হবে?' এবং একটি মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া দিয়া রওনা হইলেন। সঙ্গে আরও একটি লোক ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাত আরম্ভ হইল। একটা বজ্র তাঁহাদের কাছেই পড়িয়াছিল, ফলে ভারবাহী লোকটি অজ্ঞান হইয়া ধরাশায়ী হইল। ফণীদাদা বিপদ্ দেখিয়া সঙ্গের অপর লোকটির সাহায্যে বহুকষ্টে ধরাধরি করিয়া মূর্ছাপ্রাপ্ত ভারবাহীটিকে অদূরবর্তী এক গ্রামে নিয়া গেলেন এবং তথায় কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর সে জ্ঞান লাভ করিল। তার পর ঝড়-বৃষ্টির উপশম হইলে তিনি বাড়ী পৌঁছিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া তিনি যোগেশদাদার গৃহে তাঁহার এবং আরও দুই একটি গুরুভ্রাতার সমক্ষে বাবাকে বলিতে থাকেন, 'বাবা, অমুক দিন বাড়ী যাইতেছিলাম, তারকেশ্বর হইতে রওনা হওয়ার পর মাঠে একটা মজা হয়।

বাবা। হাঁ রে, বাপু, তুমি ত বল্ছ মজা; মজাটা যে কি রকমের তাহা জেনেছি আমি। এই দেখ।

বাবা দেখাইলেন তাঁহার উরুতে একটি দীর্ঘ অগ্নিদাহের চিহ্নবৎ চিহ্ন। দেখিয়াই ফণীদাদা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া পূর্বোক্ত ঘটনা যোগেশদাদা প্রভৃতির নিকট সাশ্রুনেত্রে বর্ণনা করেন। বাবা আর কিছুই বলেন নাই।

এই ভক্তিমান্ শিষ্যটির সহিত লীলাময় গুরুর আরও একটি লীলার কথা এখানেই বলিয়া যাই; ইহাও পরের ঘটনা, কিন্তু যথাস্থানে বলিবার সুযোগ না-ও ঘটিতে পারে। ফণীদাদার পত্নী রন্ধনে সুনিপুণা ছিলেন। ফণীদাদা জাতিতে কায়স্থ; তাই তাঁহার মনে প্রায়ই আক্ষেপ হইত—বাবাকে নিজ বাসায় আনিয়া দিদির পক্ক নানাব্যঞ্জন দিয়া ভোগ দিতে পারেন না একদিন মনের এই ক্ষোভ বোধ করি অধিক তীব্র হইয়াছিল। সেইদিন রাত্রিতে দাদা স্বপ্নে দেখিলেন যেন বাবা তাঁহার বাসায় পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি পরমানন্দে তাঁহার সেবার নানা আয়োজন করিতেছেন, ফণীদিদি পরম উৎসাহে নানাবিধ সুরস ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছেন। যথাসময়ে বাবা ভোগে বসিলেন এবং দিদির রন্ধনের প্রশংসা করিতে করিতে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। ইহার পরেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের আনন্দ তখনও মনে খেলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নকে যে সত্যে পরিণত করা সম্ভব নহে, তাহা ভাবিয়া আক্ষেপও আছে। পরদিন যখন গুরুদর্শনে গেলেন তখন তিনি প্রণাম করিয়া পানপ্রসাদ লইয়া বসিবামাত্র বাবা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন, "কাল ত খুব খাওয়াটাই খাইয়ে দিলি রে বেটা; ভরপুর খাওয়া!" বাবার কথা শুনিয়া ফণীদাদা তাঁহার দিকে তাকাইয়া অজস্র

অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বাবা সেই অশ্রুতে গলিয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার আবার অন্নদোষ কি রে, বাপূ? তবু একটা অবস্থা নিয়ে আছি ত? তাই সমাজের দিকে তাকাইয়া চলি। এতে দুঃখ করিবার কি আছে?"

এখন প্রক্রান্ত বিষয়ে ফিরিয়া যাওয়া যাক্। বাবার এবারে রোগ-ভোগ ও আরোগ্যে বিলম্ব দেখিয়া সকল শিষ্যই মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। কেহ কেহ যেন প্রতাপনারায়ণ দাদার প্রতিও একটু বিরূপ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি কলিকাতায় থাকিয়াও শ্রীশ্রীবাবাকে নিজ ব্যারামের তীব্রতাসম্বন্ধে কোনও খবর দেন নাই, দৃশ্যতঃ কোনও প্রার্থনা জানান নাই। দুর্গাকান্ত রায়দাদা বাবাকে একদিন বলেন, "প্রতাপনারায়ণদাদা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার মরণের বয়স হইয়াছে, মিছামিছি তাঁহার ব্যারাম টানিয়া নিয়া কেন আপনি ভুগিতেছেন?" তদুত্তরে বাবা বলেন, "প্রতাপনারায়ণ আমার অতি পুরাতন শিষ্য। তার অসুখ টান্‌ব না? তোমাদের মার শেষ ব্যারামের সময় সে মাহাতা থেকে রোজ ঘোড়ায় বণ্ডুলে এসে তাকে দেখে যেত।" বাবা নিজের কৃপাকে প্রত্যুপকারের আবরণ দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তার পরেও প্রতাপদাদাকে শিষ্যদের চক্ষে নির্দোষ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "শুধু প্রতাপনারায়ণের ব্যারাম টানিয়াই আমার এ অবস্থা হয় নাই। আমার নিজেরও রক্তের চাপবৃদ্ধি ব্যারাম আছে।" তাঁহার ঐ কথা অবশ্য পূর্বোক্ত শিষ্যগণ মনে মনে, মানিয়া নিতে পারেন নাই। কেননা তাঁহার রক্তের চাপ সম্বন্ধে কোনও দোষ ইতঃপূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে নাই। তিনি চিরদিন অতি স্বল্পাহারী, আর স্বাস্থ্যবিধি কখনই লঙ্ঘন করিতেন না। অবশ্য যোগক্রিয়ায় রাত্রির প্রায় সমস্তটা কাটাইয়া দিতেন, বিশ্রাম স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে খুব কম ছিল। কিন্তু তজ্জন্য স্থূলদেহের কোনও ক্লেশ হয় ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না।

ঐ দিনের অসুখসম্বন্ধে অন্য সময় বাবা বলেন, "বেলা ৩টা পর্যন্ত ভাল ছিলাম। ঐ সময়ে আহ্নিকের ঘরে ঢুকিয়া দেখি কালো কালো পরমাণুতে ঘর ভরতি। খাতা খুলিয়া দেখিলাম প্রতাপনারায়ণের বড় বিপদ্ উপস্থিত। তখন কি আর করি, ভোগটা টানিয়া নিলাম।"

গোপীনাথ ইতিমধ্যে বাবার অসুখের সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিলেন। বাবার অসাক্ষাতে তিনি, দুর্গাকান্তদাদা ও আমি বাবার ঐ কথার আলোচনা করিতেছিলাম। দুর্গাকান্তদাদা বলিলেন, "বাবা খেয়ালী লোক। খেয়াল হইল ত একজনের অসুখ টানিয়া নিলেন, হইল না ত অন্যের জন্য সেরূপ কিছু করিলেন না।"

গোপী। আমরা প্রকৃত হেতু বুঝি না—তাই বলি খেয়াল। বাবার কি

স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে ? ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহা merged (লীন) হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হয়ত তাঁহাকে দিয়া আরও কিছু কর্ম করাইয়া নিবার জন্য বাবা প্রতাপনারায়ণদাদার ভোগ নিয়াছেন।

বাবা এদিকে রোগে ভুগিতেছেন তবু বিভূতি যেন তাঁহার শরীর হইতে শিউলি ফুলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে! সমস্ত বর্ণনার স্থানাভাব। একদিনের কথা বলি। পানপ্রসাদ দিয়া তৎসঙ্গে এলাচির গুঁড়া দেওয়া এবং যে জরদা খায় তাহাকে তদুপরি জরদা দেওয়া শ্রীশ্রীবাবার অভ্যাস ছিল। একদিন পান দিতে দিতে এলাচির গুঁড়া ফুরাইয়া যায়। অতুল বসুদাদা এলাচির গুঁড়ার শূন্য কৌটাটি ভরিয়া আনিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে সুরেশ মুখোপাধ্যায় দাদার বাড়ী হইতে ছোট একটি কৌটায় বাবার জন্য জরদা আসিল। বাবা জরদা-সেবী শিষ্যদিগকে তাহা হইতে জরদা দিলেন। আর কৌটাটি বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া তাহা হইতেই আমাদের হাতে এলাচির গুঁড়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে জরদার লেশমাত্রও নাই। থাকিলে আমার বমি হইত—কেননা তামাক কোনও আকারেই আমি ঈষদ্‌মাত্রায়ও সহ্য করিতে পারি না।

ইহা ছাড়া ঐ কয়দিনে কোনও কোনও শিষ্যের (যথা ইন্দু চক্রবর্তীদাদার) বাড়ীতে সূক্ষ্ম দেহে গিয়া গন্ধ দ্বারা সকলকে নিজের উপস্থিতি বুঝাইয়া দিয়া আসিতেছিলেন। ঐ কথা শুনিয়া যোগেশদাদা বাবার সমক্ষেই বলেন, "ডাক্তার বলে, পূর্ণ বিশ্রামের দরকার ; কিন্তু সূক্ষ্ম দেহে অন্যত্র যাওয়া-আসার বিরাম নাই। বিশ্রাম কি এতে হয় ?"

বাবা। আমি কি করি না করি তা'ত তোমাদের দেখবার প্রয়োজন নেই। অসুস্থ এই স্থূল দেহটার যা' প্রয়োজন তা' তা'কে দিতেই হবে। তোমরা সেই রকম সেবা করে যাও। সূক্ষ্মদেহে কি করা হচ্ছে না হচ্ছে তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি ?

অসুস্থতার মধ্যে তত্ত্বকথাও গোপীনাথের সঙ্গে চলিত। একদিন বাবা বলেন, "লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে মন্ত্রচৈতন্য হয়। মন্ত্রচৈতন্যের সূচনায় জ্যোতিঃদর্শন হইতে থাকে। প্রথমতঃ মৌমাছির চাকের মতন (সচ্ছিদ্র ?) জ্যোতিঃ দেখা যায়।* তারপর নানাপ্রকারের জ্যোতিঃ দেখা দেয়। কাহারও কাহারও এই অবস্থায়ই ইষ্টদেবতা দর্শন হয়। কিন্তু এটি অপক্ক অবস্থা বলিয়া এই সময়ের দর্শন খুব উৎকৃষ্ট বা স্থায়ী হয় না। ইহার পরের অবস্থায় চিত্তে খুব একটা সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। তারপর ঐ সুখের ঘন, ঘনতর অবস্থা আসিতে থাকে, এবং মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও শান্তির উদয় হয়। এই যে অবস্থাগুলি ইহা কথায় ঠিক ঠিক ব্যক্ত

---

* লক্ষ জপ করিলেই যে লক্ষ জপ পূর্ণ হয় এরূপ মনে করা ভুল। একা গুরুই জানেন কখন কত জপ পূর্ণ হয়।

করা যায় না—করিতে গেলে সত্যমিথ্যার খিচুড়ি হয়। বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপরেই সিদ্ধি নির্ভর করে।” এই পর্যন্ত বলিয়া এই বিষয়ে একটি গল্প বলেন।—

এক বালক ছিল, তাহার শৈশবেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। মরণকালে পিতা তাহাকে একটি বীজমন্ত্র দিয়া সর্বদা তাহা জপ করিতে এবং বাড়ীর ভৃত্য পূর্ণের উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করিতে বলিয়া যান। মন্ত্রজপ করিতে করিতে বালকের নানা অবস্থা আসিতে লাগিল। কখনও বাঘ দেখিত, কখনও সাপ দেখিত. কখনও অন্য কোনও ভয়ের বস্তু দেখিত, এবং দেখিয়াই “পূর্ণদা” বলিয়া ডাকিত। অমনি ভয়াবহ সকল মূর্তি অন্তর্হিত হইত। এই কারণে পূর্ণদা'র উপরে তাহার খুব প্রবল বিশ্বাস জন্মিল। একদিন পূর্ণ তাহাকে বলিল, “দেখ একটা কাজ করতে হবে; রাত্রিতে শ্মশানে গিয়া তোমাকে সাধন করতে হবে। পারবে ত ?”

বালক বলিল, “খুব পারব।”

পূর্ণ। আমি যেমন যেমন বলি ঠিক তাই করবে। শ্মশানে আমি শুইয়া থাকিব। তুমি চারিদিকে চারিটি খোঁটা পুঁতিয়া তার সঙ্গে আমার হাত-পা বাঁধিবে। তারপর আমার বুকে ছুরি দিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিয়া আমার উপর তুমি বসিবে এবং জপ করিতে থাকিবে। কাছে মুড়ি, ছোলাভাজা ও মদ ইত্যাদি আগেই রাখিয়া দিব। যদি আমার মরা মুখ হাঁ করে, তবে সেই মুখে কিছু মদ ও ভাজা ইত্যাদি দিবে এবং জপ করিতে থাকিবে। অনেক দেবতা ভূত প্রেত ইত্যাদি দেখিবে, কাহারও কথার উত্তর দিও না, ভয় করিও না, কেবল জপ চালাইয়া যাইবে। যখন দেখিবে আমি উঠিয়া বসিতেছি তখন জপ ছাড়িও। পারবে ত ?

বালক। পারব।

তারপর সে ঠিক তাহাই করিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু আসিলেন, কিন্তু তাহার জপ বন্ধ করাইতে পারিলেন না। ভূত প্রেত আসিল, অনেক রকম পরীক্ষা হইয়া গেল। বালক ‘পূর্ণদা’র উপদেশ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ধরিয়া রহিল। সর্বশেষ ‘পূর্ণদা’ বাঁচিয়া উঠিয়া তাহাকে পূর্ণ সিদ্ধি দিল।

বাবা বলিতে লাগিলেন, “বিশ্বাসের দৃঢ়তা না হলে সিদ্ধি হয় না। দৃঢ়তা হ'লে বালকেরও সিদ্ধি হয়।”

অন্যদিন বহু শিষ্যের সমক্ষে (তন্মধ্যে জানকী দাদারা, নৃপেন্দ্র চৌধুরীদাদা, বিশ্বেশ্বর দত্তদাদা ছিলেন, আমিও ছিলাম) সমস্ত সকাল ধরিয়া উপদেশ দিতেছিলেন। বিকালেও অন্য শিষ্যদের সমক্ষে ঐগুলির পুনরাবৃত্তি করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এইসকল উপদেশের প্রয়োজন আমাদের খুবই আছে বা ছিল।

উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে অনেক উদাহরণও দিয়াছিলেন। উদাহরণগুলি বাদে উপদেশগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—

"সর্বদা সত্য আশ্রয় করিয়া থাকিবে। মিথ্যা বলিলে ও মিথ্যা আচরণ করিলে তাহার ফলও ভোগ করিতে হয়। পরকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আমাকেও কখনও কখনও মিথ্যা বলিতে এবং তজ্জন্য ভোগও নিতে হইয়াছে। কিন্তু আমি যে ধাক্কা সহ্য করিতে পারি, তোমরা তাহা পার না। তোমাদের অনিষ্ট বেশী হয়। আজকাল সত্যের বড় অনাদর হইতেছে। যাহারা সত্য লইয়া থাকে লোকে তাহাদিগকে বুদ্ধিহীন ভাবে।

"পরের অর্থে লোভ করিবে না। ঋণ করিবে না, ঋণ রাখিবে না। এরূপ করিলে কখনও কষ্ট পাইবে না।

"সর্বদা পরের উপকার করিবে। কিন্তু ত্যাগস্বীকার ছাড়া পরোপকার হয় না। পরোপকারে ইহলোকে পরলোকে মহাযশ হয়। পরোপকারে যেমন উপকার হয় পরশ্রীকাতরতায় তেমনই অনিষ্ট হয়। ওটা একটা মহাপাপ।

"সংসর্গের একটা ফল আছেই। উহাতে এক মনের সহিত অন্য মনের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। ভাল সংঘর্ষে ভাল উপাদান লাভ হয়।

পরচর্চা, পরদোষানুসন্ধান মহাপাপ। পরের কানকথা শুনাও পাপ। এরূপ স্থলে যত্নপূর্বক সত্যনির্ণয় করিয়া কাজ করিবে।

"সাধন-ভজন বিষয়ে লেগে থাকা চাই। লেগে না থাকলে কিছু হয় না। শুধু বচনে কিছু হয় না, কর্ম করা দরকার।

"কর্ম অনরবত দরকার। সকলকেই ইহা করিতে হয়। মানুষ বল, দেবতা বল কর্মব্যতিরেকে কাহারও উন্নতি হয় না।"

আমি। বাবা, শুনিয়াছি কর্মের অধিকার মানুষেরই। পৃথিবীই কর্মভূমি, আর সব লোক ভোগভূমি।

বাবা। তা' কেন? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও কর্ম করিতে হয়। তাঁহাদেরও কর্মে অধিকার আছে। কর্ম করিতে হয় না এক মহাশক্তির।

আমি। কর্ম ত করিতেই হইবে। আমরা—আমি—কর্মনামে যাহা করিতেছি তাহাতে কিছু হইতেছে কি?

বাবা। অবশ্য হইতেছে, হইতেই হইবে। আগুনকে যা বলিয়াই ধর, সে হাত পোড়াইবেই।

আমি। তা'ত বটেই, তবে সব কাজের এক একটা পদ্ধতি আছে ত? হয়ত আমাদের আসনাদিই ঠিক হইতেছে না।

বাবা। না-ই বা হইল। শিশু "মা" বলিতে পারে না, ওঁয়া ওঁয়া করিয়া কাঁদে। তাতে কি মা কাছে আসে না?

আমি। মনের স্বাভাবিক গতি প্রবৃত্তিমুখী, তাকে নিবৃত্তিমুখী করা বড়ই কষ্টকর।

বাবা। চেষ্টা কর। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে দেবত্ব ইন্দ্রত্ব যাহা চাওয়া যায় তাহাই লোকে পাইতে পারে।

আমি। শুধু কি নিজের চেষ্টায় হয়?

বাবা। শুধু নিজের চেষ্টা কেন? গুরু কি করিতে আছেন?

মনে মনে বলিলাম, জয় গুরু! জয় গুরু!

৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ, ১৩৪০ আশ্রমে যথারীতি কুমারীভোজন হয়। ৩০শে চৈত্র প্রত্যেক কুমারীর হাতে জলপূর্ণ কাঁসার এক একটি "আপখোরা" ও এক একটি পাকা আম দেওয়া হয়। সেবায় ছাতু দধি ইত্যাদি ও আম দেওয়া হইয়াছিল। ১লা বৈশাখ প্রধানতঃ ফল দ্বারাই কুমারীসেবা হয়, সঙ্গে মিষ্টি ছিল।

৩রা বৈশাখ দেখা গেল রক্তের চাপ ১৮০তে নামিয়াছে (উঠিয়াছিল ২২০তে)। পেটে খুব বায়ু সঞ্চিত হইতেছিল—সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসায় এ বিষয়ে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছিল না। তথাপি বাঙ্গালী ডাক্তার ডাকা যোগেশদাদা-প্রভৃতির মনঃপূত ছিল না। ৭ই বৈশাখ রক্তের চাপ পুনরায় ২১০এ উঠিয়া গেল। এই সময়ে বাবা আশ্রম হইতে যোগেশদাদার বাড়ীতে আসিয়া তথায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। ১০ই বৈশাখ ডাঃ ফণী মজুমদারদাদা আবার একটা নড়বড়ে দাঁত তুলিয়া ফেলেন। এই বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম 'কেহ কেহ (যথা ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন) নাকি বলেন, পুরাতন ভৃত্যকে কি তাড়াইতে হয়? দাঁত মানুষের পরম উপকারী ভৃত্য। সহসা তাহা তুলিয়া ফেলিতে নাই।'

বাবা। দাঁত তুলিয়া গঙ্গায় দিলে ত পুরাতন ভৃত্যের সদ্গতিই হইল। (অসুস্থতায় রসময়ের রসিকতার কোনও বিপর্যয় হয় নাই।)

তারপর বলিতে লাগিলেন, ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার দাঁত সব ভাল ছিল। উহার পর দুইটা দাঁত জোর করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। শিষ্যদেরই কল্যাণের জন্য এই প্রকারে গুরুর দেহ হইতে রক্তমোক্ষণের প্রয়োজন হইয়াছিল। উহার বিবরণ 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপ্রসঙ্গে' মুদ্রিত হইয়াছে। তারপর হইতেই সব দাঁতগুলি একে একে নষ্ট হইতেছে।

আমি। শিষ্যদের জন্যই ত এই বিড়ম্বনা বাবাকে সহ্য করিতে হইতেছে।

বাবা। তাতে আর কি হইতেছে? তুমি কি তোমার ছেলেদের জন্য কষ্ট কর না? আর সেটা কি কষ্ট মনে কর?

আমি। বাবা বারবার ইহা করিতেছেন, অথচ আমরা ইহা অতি সহজেই ভুলিয়া যাই। ফলে সকলে অকৃতজ্ঞতা পাপে মজিতেছি।

বাবা। বাপের কাছে আবার ছেলের কৃতজ্ঞতা কি রে, বাপু?

২০শে বৈশাখ ১৩৪০ (খ্রী. ৩।৫।৩০) তারিখে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথের পুত্র জিতেনের (মাখন বাবাজীবনের) বিবাহ হয়। ২১শে তারিখে গোপীনাথ ও কাশী হইতে আগত কয়েকজন বরযাত্রীসহ আমি বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই। ঐ দিন বাবাকে এত প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম যে, বহুদিন সেরূপ দেখি নাই। বাবা স্বদেহস্থ একটি স্ফটিক, আমাদের চোখেরই উপর, একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগে চাপ দিয়া বাহির করেন এবং কয়েক মিনিট পর ঐ স্থান দিয়াই সেটিকে ভিতরে প্রবেশ করান। তাঁহার দেহে যে বহুসংখ্যক স্ফটিক আছে তাহা গোপীনাথের সঙ্কলিত পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, এবার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। ঐদিন গোপীনাথ যোগেশদাদার গৃহে বাবার ভোগ দিয়া কলিকাতার বহু গুরু-ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণপূর্বক প্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। গোপীনাথের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বাবা আমাকে সকলের কাছে কর্মকর্তা, ঘটক, আসল বরকর্তা ইত্যাদি সস্নেহকৌতুকপূর্ণ আখ্যা দিয়া পুনঃ পুনঃ সংবর্ধিত ও অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।

৩১শে বৈশাখ সাহেব ডাক্তার ছাড়িয়া কোনও বাঙ্গালী ডাক্তারের মত গ্রহণ সমুচিত বিবেচিত হয়। ঐদিন স্যর্ নীলরতন সরকার বাবাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন, রক্তের চাপ যাহা আছে তাহাতে ভয়ের কিছুই নাই; বরং উহা কমাইতে গেলে খারাপ হইবে। তাঁহার মতে বাবার লিভারের (যকৃতের) অবস্থাটা ভাল নয়। উহা এ বয়সে সম্পূর্ণ ভাল হইবারও নয়। তবে কষ্টকর উপসর্গগুলি দমন করিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক।

ঐদিন শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়দাদা বাবার আরোগ্যার্থে নারায়ণকে ১০৮টি তুলসীপত্র দিয়া স্নানজল আনিয়া বাবাকে দেন। বাবার জন্য তিনি ঐরূপ দেবসেবা, হোম, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি ইহার পরেও বহুবার করিয়াছেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (খ্রী: ৩।৬।১৯৩৩) বাবা প্রাতে দশহরা উপলক্ষে অনেকটি শিষ্যসহ গঙ্গাস্নান করেন। আমি নানা কারণে সঙ্গী হইতে পারি নাই, কিন্তু একটু বেলা হইলে আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলাম। ঐদিন কয়েকটি কুমারী-ভোজন করান হইয়াছিল। বাবা আমাকে বলিলেন, "ঐখানে (বারান্দায়) প্রসাদ আছে, নেও গিয়ে; বেশী করে নিও।" আমি স্বহস্তে যাহা নিয়াছিলাম তদুপরি বাবার আদেশে শ্রীযুক্ত গিরধারীলাল ব্যাসদাদা গিয়া আরও কতকখানি প্রসাদ দেন। কিছুক্ষণ পরে জানকীদাদারা তিন ভাই আসিলে বাবা তাহাদিগকেও প্রসাদ নিতে আদেশ দিয়া জানকীদাদাকে বলিলেন, "আম নিও"। জানকীদাদা পুরীতে পুরুষোত্তমকে আম্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া আম খাইতেন না। তবে

প্রসাদে দোষ নাই বলিয়া প্রসাদী আম নামমাত্র নিতেন। স্নেহময় বাবা সেইজন্য আমের দিনে সর্বদাই জানকীদাদাকে আম-প্রসাদ নিতে আদেশ দিতেন, এবং কৌতুক করিয়া বলিতেন, "যা' দেবতাকে দিয়েছ, সেটা ত তাঁর প্রসাদ হয়েছে; সুতরাং বেশী বেশী ক'রে খাওয়া উচিত।" তিনি দুই একবার স্বহস্তেও জানকীদাদাকে আম দিয়াছেন। এমনই স্নেহকোমল ছিল তাঁহার হৃদয়, এবং শিষ্যদের সহিত ব্যবহার।

ইহার পর শ্রীযুক্ত তারক বন্দ্যোপাধ্যায়দাদা (এঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টর) আসিয়া কথায় কথায় কুমারীভোজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "বাবা, কুমারীভোজনের মাহাত্ম্য ত কিছুই বুঝি না। তবে প্রসাদ খাই। মনে হয় এই মেয়েগুলিকে খাওয়াইয়া কি লাভ?"

বাবা বলিলেন, "ভক্তি বিশ্বাস থাক আর নাই থাক, প্রসাদ যে গ্রহণ কর উহাতেই উপকার হইবে। শালা বলিয়াই আগুনে হাত দেও কি বাবা বলিয়াই হাত দেও, আগুন তার স্বধর্মে তোমার হাত পোড়াইবেই। বর্ধমানে শ্রীপতি নামে এক ডাক্তার ছিল, সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত। একবার আসিয়া বলিল, 'এই এলাম আপনার এক মহামায়াকে দেখে।' সে তখন আশ্রমের কাছে একটি কুমারীর নানাপ্রকার চর্মরোগের চিকিৎসা করিতেছিল। একটা চর্মরোগাক্রান্তা কুমারীও বাবার চক্ষে মহামায়া তুল্য—এইটি ছিল তাহার পরিহাসের বিষয়। মহামায়ার এমন খেলা, ঠিক সেই কুমারীটিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, 'ব্যারাম হয়েছে ত কি হয়েছে? পরশ পাথর নিজে পাথর তবু তা' লোহাতে ঠেকালে লোহা সোনা হয়।' মেয়েটির মুখে ঐরূপ কতকটা অস্বাভাবিক রকমের পাকা কথা শুনিয়া শ্রীপতি ডাক্তার তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, 'চুপ কর্, তোকে জ্যাঠামো করতে হবে না।' সেই দিনেই ডাক্তারের বাড়ী ফিরিবার পর একটু জ্বরভাব হইল। সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্নানাহার করিল। ক্রমে জ্বর বৃদ্ধি হইল, গলা দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, শেষটায় চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল, এবং সেইখানেই সে মারা গেল" অন্য একদিন বাবাকে এই ঘটনাই বর্ণন করিবার কালে বলিতে শুনিয়াছি, ধমক খাইয়া কুমারীটিই ডাক্তারকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন, 'তোমার বড্ড আস্পর্ধা হ'য়েছে, গলায় রক্ত উঠে তুমি মরবে।' সে যাহা হউক উপসংহারে বাবা বলিলেন, "(কুমারীকে) যে যে ভাবে দেখে সে সেইরূপ ফল পায়।"

কুমারীপূজার মাহাত্ম্য তন্ত্রশাস্ত্রের নানা স্থানেই আছে। এক হইতে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত বয়সের কুমারীদিগের ভিন্ন ভিন্ন নামও দেওয়া আছে। যে দিনের কথা বলিতেছি উহার দুই দিন পূর্বে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪০) মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাইয়া খাতায় টুকিয়া রাখিয়াছিলাম;

কিন্তু কোথা হইতে উহা উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা উক্ত প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হয় নাই। উহাতে দেবী সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল—

কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া।
কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী॥

এই সময়ে একদিন আমার ভাদ্রবধূ (বাবার শিষ্যা) ঢাকাতে স্বপ্নে দেখেন, বাবা যেন তাহাকে বলিতেছেন, "আমি আর বেশীদিন থাকিব না।" এই দুঃস্বপ্নদর্শনের ফলে চিন্তান্বিত হইয়া আমার ভ্রাতা, বধূমাতা সহ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাবাকে দেখিতে কলিকাতায় আসে। সে বাবার জন্য কাঠের একটা সুন্দর পুস্তকাসন তৈয়ার করাইয়া তাহাতে একটি রূপার প্লেটে "শ্রীগুরবে নমঃ" এই কথাটি খোদাই করিয়া আনিয়াছিল। বাবা জিনিসটি দেখিয়া খুব প্রীত হন এবং নিজের আহ্নিকের স্থানে রাখিয়া দেন।

একদিন বাবা কথাপ্রসঙ্গে দিনক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করা সম্বন্ধে বলেন, "বিজ্ঞানমতে এই চারিটি দিনে যাত্রা করা নিষিদ্ধ।—শুক্লা প্রতিপদ্‌ ত্র্যহস্পর্শ, সংক্রান্তি ও মাস পহেলা।" পূর্ণিমা অমাবস্যায় যাত্রাবিষয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন ঐ দুই দিনে যাত্রার নিষেধ তত গুরুতর নয়।

অন্য একদিন আমার ভ্রাতার নিকট তাঁহার জ্ঞানগঞ্জের প্রথম সহযাত্রী হরিপদ-সম্বন্ধে বলেন, বিবাহ ও সংসার করা সম্বন্ধে গুরুর আদেশ অবহেলা করার ফলে তিনি (হরিপদ) সাধন-ভজন দ্বারা যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, সমস্তই হারান। বাবা বলেন, হরিপদ এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন যে, গঙ্গায় ডুব দিয়া কয়েক ঘণ্টা জলের নীচে আসন করিয়া বসিয়া যোগক্রিয়া করিতে পারিতেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক অলৌকিক শক্তি তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। সে সকলই ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। অথচ শেষে বাধ্য হইয়া সংসারও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল, তিনি নয়টি কন্যার জনক হন। শেষ জীবনে তিনি খুব অর্থকষ্ট পাইয়াছিলেন। বাবা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। তিনি বাঁচিয়া আছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলেন, তাঁহার লোকান্তর হইয়াছে; পরজন্মে তাঁহার যোগসংস্কার সমস্তই থাকিবে এবং তিনি অত্যুন্নত যোগী হইবেন।

এই ব্যক্তিটি সম্বন্ধে সময়ান্তরে শুনিয়াছি যে, শ্রীশ্রীবাবার গুশকরা অবস্থানকালে তিনি একবার তথায় আসিলে কেদার মোদক-প্রভৃতি বাবার কয়েকটি শিষ্য (যাঁহারা বাবার মুখে পূর্বে তাঁহার নানাশক্তির কথা শুনিয়াছিলেন) একদিন তাঁহার সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে যাইবার সময় তাঁহাকে কিছু শক্তিপ্রদর্শন করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁহাতে তিনি বলেন, "বল, কি দেখিতে চাও?"

কেদার মোদক। এই নদীতে কতকগুলি পদ্মফুল ফুটাইয়া দেখান।

তিনি। এ আর বেশী কি ? আচ্ছা, তোমরা সকলে ডুব দিয়া যতটুকু কাল পার জলের নীচেই থাক।

সকলে তাহাই করিলেন এবং পরে জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখিলেন নদীতে বহু পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এটা কোনও রকমের hypnotic vision বা স্নায়ুর উপর ক্রিয়াজনিত সাময়িক ভ্রান্তিদর্শন নয়, কেননা দর্শকগণ তাঁহাদের দৃষ্ট কতকগুলি পদ্মফুল নদী হইতে তুলিয়া আনেন এবং বাবাকে তাহা দেখান।

এই ঘটনাটির বিবরণ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কেদার মোদকের স্বমুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। দক্ষিণা রায়চৌধুরীদাদাও বাবার মুখ হইতে উক্ত মহাপুরুষটির নানাশক্তির বিবরণ শুনিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না। বাবা নাকি বলিতেন, "হরিপদ আমার চেয়ে উন্নতই হইয়াছিল। অদৃষ্টদোষে তাহার শক্তিগুলি বৃথা হয়।" আমি ইঁহাকে দেখি নাই, ইঁহার নিবাস কোথায় ছিল এবং সন্ন্যাসে কি নাম হইয়াছিল বোধ করি সব শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও লিখিয়া রাখা হয় নাই; এখন ভুলিয়া গিয়াছি। গোপীনাথ ও দক্ষিণাদাদা প্রভৃতিও উহা এখন আর মনে করিতে পারেন না।

৬ই আষাঢ় (খ্রীঃ ২০।৬।৩৩) শ্রীশ্রীবাবা পুরী যাত্রা করেন। তথা হইতে শিষ্য ঈশ্বরদাসের অনুরোধে তিনি সঙ্গের সকল শিষ্যসহ কটক গিয়াছিলেন। ইঁহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম, ঈশ্বরদাদা কটকে বাবার জন্য একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়া তথায় পদার্পণ জন্য বাবাকে নিয়া যান। তিনি বাবার যে সেবা এবং গুরু-ভ্রাতাদের যে আদর-আপ্যায়ন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। ইঁহার স্বর্গীয় পিতা অনন্ত দাস ছিলেন বাবার প্রথম ওড়িয়া শিষ্য। তিনিও বাবাতে গভীর ভক্তিমান্ ছিলেন। বাবা পুরীতে ফিরিয়া আসিলে আমি পুরী গিয়া তাঁহার পুণ্যসঙ্গে পুনর্যাত্রা উৎসব দর্শন করি। সেদিন মনে মনে বাবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম, "হে কৃপাময় গুরো, আপনার কৃপাবলে এই দেহরথে রথী বামনের (অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের) দর্শনলাভ এ জন্মে ঘটিবে কি ?" সেই প্রশ্ন এখনও চলিতেছে; কিন্তু দয়াময়ের দয়া হইতেছে কই ?

এবার পুরীতে নলডাঙার কুমারের সঙ্গে একটি জার্মেনি-ফেরত ডাক্তার বাবার কাছে আসিয়া সূর্যবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি পূর্বেই অন্যের মুখে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি কর্কযুক্ত খালি শিশি আনিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার হাতের মধ্যেই সেই শিশিতে আতর প্রস্তুত করিয়া দেন। এই সময়ে পুরীতে একটি বাঙালী ডাক্তার সিভিল সার্জেনের পদে ছিলেন। তিনি প্রায়ই বাবার নিকট আসিতেন, এমন কি বাবা পুরী হইতে চলিয়া আসিবার দিন স্টেশনেও একটি কুমারী কন্যাসহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ কুমারীটির আবদারে বাবা স্টেশনেই তাহার আনীত একটা শিশিতে কিছু

আতর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। আমি বাবার সঙ্গেই (২১শে আষাঢ় তারিখে) পুরী হইতে প্রত্যাবর্তন করি।

২৫শে আষাঢ় বাবার শ্রীচরণদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম বাবা তৎপূর্বে কোনও একদিন সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা একটি বৃহদাকার হীরক প্রস্তুত করিয়াছেন। অতবড় হীরক আমি তৎপূর্বে বা পরে কখনও দেখি নাই। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র ছিল। বুঝিয়াছিলাম উহা বাহুতে ধারণের যোগ্য করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইতে উহা হইয়াছে? বাবা বলিলেন, তুলা হইতে।

আমি। কত সময় লাগিয়াছিল?

বাবা। পনের মিনিট হইবে।

এই দিন বাবা তুলা হইতে প্রস্তুত একটি বৃহৎ মুক্তা—"গজমুক্তা"—আমাদিগকে দেখান। সেটির গড়ন অতি অপূর্ব। সুশুভ্র কিন্তু ভিতরে একটু ঘোলাটে। বাবা বলিলেন, "কুমারী খাওয়াও ত যে রঙ বলিবে সেই রঙই হইবে।" এই বলিয়া হাতে একটু তুলার মধ্যে উহা রাখিয়া দোলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে যেন মনে হইল একটু সবুজ সবুজ (greenish) রঙ হইয়াছে। আমরা কেহ কুমারী খাওয়াইতে উৎসাহ দেখাইলাম না বলিয়া বাবা হাতে দোলাইতে দোলাইতেই উহার বর্ণ পূর্ববৎ শুভ্র করিয়া উহা একটি কৌটার ভিতরে রাখিয়া দিলেন।

ঐদিন বিকালে আমার স্ত্রীও বাবাকে প্রণাম করিতে যান। ইতিমধ্যে তাহার শরীরটা খুব খারাপ হইয়াছিল। বাবা তাহাকে ডাক্তারী ঔষধ খাইতে ও পূজার সময় কাশী যাইতে বলিলেন। তাহার সঙ্গিনী, আমাদেরই প্রতিবেশিনী, একটি ভদ্রমহিলা বলিলেন, "কবিরাজী ঔষধও ত খুব ভাল বলিয়া সকলে বলে।"

বাবা। হাঁ খুবই ভাল, অমন ঔষধ কি হয়? তবে ওর গাছ-গাছড়া সব চিনিয়া কে আনে? আজকালকার কবিরাজেরা বাজার হইতে জিনিস কিনিয়া আনে, নিজেরা চিনে না; তাই খাঁটি ঔষধ তৈয়ার হয় না।

———